পৃথিবীর ইতিহাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, পি-এইচ্‌-ডি
লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্‌, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ··· ভাদ্র, ১৩৩০
দ্বিতীয় সংস্করণ···মাঘ, ১৩৪৭
তৃতীয় সংস্করণ···চৈত্র, ১৩৪৯
চতুর্থ সংস্করণ··· কার্ত্তিক, ১৩৫২
পঞ্চম সংস্করণ··· বৈশাখ, ১৩৫৮
ষষ্ঠ সংস্করণ··· বৈশাখ, ১৩৬৭

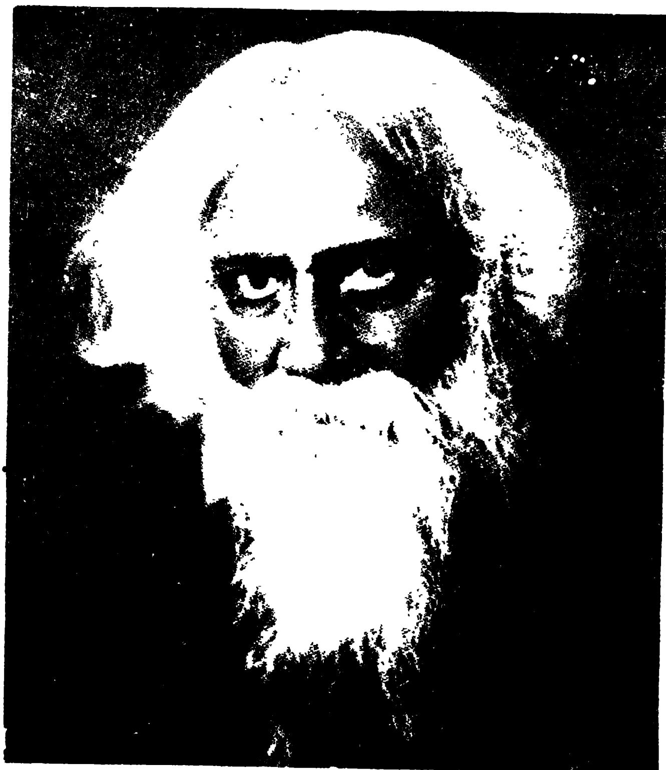
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্, কলিকাতা
হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি

রবীন্দ্রনাথের

শ্রীচরণে



পৃথিবীর গৌরব — রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

শিশুর মনে কৌতূহলের অবধি নাই। তাই বয়স্ক আত্মীয়েরা প্রায়ই তাহাদের অজস্র প্রশ্নে বিব্রত হইয়া থাকেন। শিশুর সমস্ত প্রশ্ন হয় ত সঙ্গত নহে, কিন্তু আজ যে প্রশ্ন অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে, কাল বিজ্ঞানের কৃপায় তাহার সঙ্গতি প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেকালের প্রহ্লাদ ক দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন, একালের প্রহ্লাদেরা কৃষ্ণঠাকুরের খোঁজ না রাখিলেও তাহাদের প্রশ্নও ক দিয়াই আরম্ভ; 'কি, কে, কেন, কোথায়, কবে'র উপদ্রব যে-অভিভাবককে সহিতে না হইয়াছে তাঁহার কপাল নিতান্তই মন্দ। শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলের খোরাক বন্ধ করিয়া যিনি তাহার মনের একাদশীর ব্যবস্থা করেন তিনি যে পিতা হইয়াও শত্রু, মাতা হইয়াও বৈরী তাহা বেশী করিয়া না বলিলেও চলে। কিন্তু কোকিল-শাবকের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইবার সাধ্য যেমন তাহার আপন জননীর হয় না, তাহাকে জন্মের পূর্ব্বেই ধাত্রীর নীড়ে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়,—তেমনই মানব-শিশুর বিশ্বগ্রাসী মনের ক্ষুধা একাকী মিটাইবার শক্তিও খুব অল্প পিতা-মাতারই আছে। যাঁহাদের আছে তাঁহারা ভাগ্যবান, যাঁহাদের নাই তাঁহাদের কপালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কে জানে কোন্ ভবিষ্যৎ মিল, কোন্ ভাবী এডিসন, কোন্ শিশু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুখের পানে চাহিয়া আছেন—তাঁহার নব-উন্মেষিত জিজ্ঞাসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। যেমন করিয়াই হউক তাহাদের মনের রসদ জোগাইতেই হইবে। কেবল শিশুর নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য নহে, দেশের মঙ্গলের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য। কোনও জাতিই প্রতিভার এক কণাও অবহেলায় অপচয় হইতে দিতে পারে না। যে জাতি দেয় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, উন্নতি অসম্ভব। সেইজন্য প্রত্যেক উন্নতিশীল সভ্য দেশে শিশুশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে; শিশুর কৌতূহল মিটাইবার জন্য, তাহার মনের সুপ্ত জিজ্ঞাসা-বৃত্তিকে জাগ্রত ও জীবন্ত করিবার জন্য নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। বাঙ্গালা দেশেও এই প্রকার উদ্যম চলিতেছে। গজেন্দ্রবাবুর ইতিহাস সে উদ্যমেরই সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি আমাদের ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের জন্য সহজ ভাষায়, অল্প কথায়, সুন্দর করিয়া বিশ্বের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। পৃথিবীর উৎপত্তি হইতে

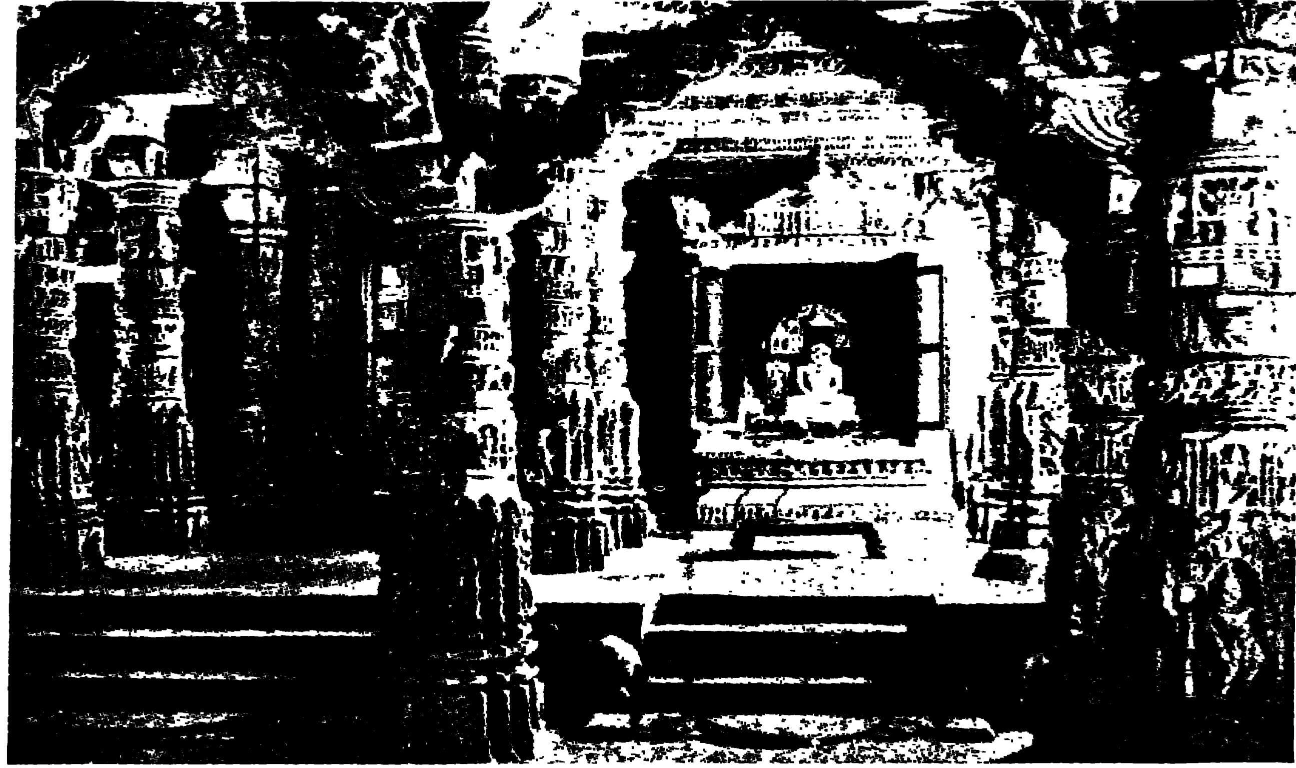
আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কোন যুগ তাঁহার বই হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রাচীন, আধুনিক, সকল দেশের কথাই তিনি বলিয়াছেন। ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। এক দেশের নিকট অন্য দেশ ঋণী, এক জাতির নিকট অন্য জাতি কত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তবে ত মানুষের সভ্যতা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই ত কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের গণিত ও আয়ুর্ব্বেদ আরব পণ্ডিতদিগের মারফতে পশ্চিমের বিদ্যামন্দিরে প্রচারিত হইয়াছিল; চীন ও জাপানের বিদ্যার্থীরা ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসিত। আজ আমরা পশ্চিমের পণ্ডিতদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি। জাপান আজ অনেক বিষয়ে আমাদের গুরু। পরস্পরের এই যে ঋণ, এই যে জ্ঞানের আদান-প্রদান, ভাবের বিনিময়, প্রকৃত ইতিহাস কি ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? পারে না; এই জন্যই এক দেশের কথা ভাল করিয়া জানিতে হইলে, বুঝিতে হইলে অন্য দেশের খবর লওয়াও দরকার হয়। মানুষ এক দিনে সভ্য হয় নাই। একদিন মানুষও অরণ্যে পর্ব্বতে পশুর মত জীবন যাপন করিত। আদিম মানুষ কি করিয়া আহার সংগ্রহ করিত, কোথায় বাস করিত, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এ-সকল প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। মানুষের জীবনের সেই প্রথম ঊষাকালে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল, কি রকমে গাছের ছায়ায় আদিম মানুষ বিশ্রাম করিত, কি রকমের জানোয়ারের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাকে বাঁচিতে হইয়াছে, ইহা জানিতে হইলে, ইতিহাসে যে যুগের কথা লেখে না, সেই যুগের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। গজেন্দ্রবাবুও তাহাই করিয়াছেন।

আশা করি বাঙ্গালার বালক-বালিকারা এই বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবে এবং তাহাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

ইতি—

নয়া দিল্লী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

২৫-৭-৪০



হিন্দু-স্থাপত্যের একটি নিদর্শন — আবু পর্ব্বতের মন্দির

পৃথিবীর ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর জন্ম

পৃথিবীর জীবন-কাহিনী আলোচনা করার আগে একবার তার জ্ঞাতিগোত্রদের দিকে চাওয়া যাক্। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রথম বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্ব বলতে এই পৃথিবীটাই সব। এর ওপরে একটা স্বর্গ আছে আর এর নীচে আছে একটা নরক কিংবা পাতাল বা ঐ জাতীয় একটা কিছু। তার পর যত দিন যেতে লাগল ততই মানুষ বুঝতে পারলে যে, আকাশে ঐ যে অন্ধকারের মধ্যে তারাগুলো ঝিক্-ঝিক্ করে, ওগুলো নিতান্ত স্বর্গের নীচের দিকে বসানো হীরে-মুক্তো নয়—ওগুলো আর কিছু, এবং ওদের সঙ্গে এই পৃথিবীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গ্রহ-নক্ষত্র কথাটা প্রাচ্যেই জন্ম নিল এবং পাশ্চাত্ত্যের লোকেরাও অনেক পরে মেনে নিল যে ঐ সব গ্রহ-নক্ষত্রদের সঙ্গে মানুষের জীবনের এমন একটা যোগাযোগ আছে যা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু তখনও, মানে পৃথিবীর বয়স হিসাবে এই সেদিন পর্য্যন্ত, মানুষের ধারণা ছিল যে তবুও এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে দামী ব্যাপার এই পৃথিবীটাই, এবং এই নরলোকেরই প্রয়োজনে আর যা কিছু সব ভগবান বাধ্য হয়েছেন সৃষ্টি করতে!

কিন্তু ক্রমশ মানুষের চোখ খুলল। সাধারণ চোখ বেশী দূর পৌঁছায় না বলে কলের চোখ সৃষ্টি করে মানুষ সুদূর আকাশে দৃষ্টি মেল্‌ল; তারপর একটু একটু করে বুঝতে পারলে যে, 'অনন্ত' বলতে আমরা যতটা বড় জিনিস ধারণা করতে পারি মনে মনে,

তার চেয়ে অনেক, অনেক বড় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, আর তার মধ্যে সব চেয়ে না হ'লেও, খুবই অকিঞ্চিৎকর এই পৃথিবীটা। খুব ছোট ছোট যে তারা আমরা আকাশে দেখতে পাই, একটা ছোট হীরের আংটির পাথরের চেয়েও ছোট বলে যাদের মনে হয়, তেমনি এক একটি নক্ষত্রের পেটের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মত কোটি-কোটি পৃথিবী অনায়াসে তলিয়ে গিয়েও যথেষ্ট স্থান বাকি থাকে! আর এই রকম নক্ষত্র যে আকাশের গায়ে কত আছে তা মানুষ আজও হিসাব করতে পারেনি। আমাদের অঙ্কশাস্ত্রে গণনা করার যে শেষ অঙ্ক নির্দ্ধারিত আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী।

এই সব বিপুল নক্ষত্র কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, মহাশূন্যে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাদের পরস্পরে প্রায়ই ঠোকাঠুকি লাগে না কেন? তার একমাত্র সহজ কারণ হচ্ছে এই যে, এই সব নক্ষত্রদের মধ্যে এমন বিপুল শূন্যতার ব্যবধান আছে, একটা আর একটা থেকে এত বেশী দূরে আছে যে কখনও এদের পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবার সম্ভাবনা নেই। কোটি কোটি যোজনের ব্যবধান এই সব তারাদের মধ্যে, যদিও খালি চোখে আমরা দেখছি যে এরা প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে আছে। এরা আমাদের থেকেই কি কম দূরে আছে? এক একটা তারা এত দূরে আছে যে তাদের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে বহু লক্ষ বৎসর সময় লাগে; অর্থাৎ আজ যদি তাদের দীপ্তি নিবে গিয়ে তারা কৃষ্ণবর্ণ হিমশীতল পদার্থে পরিণত হয় ত আমরা সে ঘটনাটা জানতে পারব বহু লক্ষ বৎসর পরে!

আবার এই সব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে যে এক একটি বিশ্ব, এই রকম বিশ্বই কি কম আছে এই ব্রহ্মাণ্ড বা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে! একটা নক্ষত্র থেকে আর একটা নক্ষত্রের মধ্যে বিপুল ব্যবধান দেখেই আমরা অবাক্ হই—একটা বিশ্ব থেকে আর একটা বিশ্বের

মধ্যে যে দূরত্ব, মাইলের হিসেবে তা বুঝতে গেলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করবে, ধারণাই হয়ত করতে পারব না। এর শেষ নেই—অর্থাৎ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এ সত্যই অনন্ত।

আমাদের সূর্য্যও এমনি একটি বিশ্বের মধ্যে একটি নক্ষত্র। খুব বড় দরের নক্ষত্র নয়, মাঝারি গোছের। কিন্তু সূর্য্যের চার পাশে যেমন আমাদের পৃথিবীর মত অনেক গ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অধিকাংশ নক্ষত্রেরই সে সৌভাগ্য নেই। এই দিক দিয়ে অনেক বড় নক্ষত্রের চেয়েই সূর্য্য বেশী ভাগ্যবান। এর কারণটাও মোটামুটি যা বোঝা যায় তা এই: আগেই আমরা বলেছি যে, আকাশের মধ্যে এত বেশী জায়গা পড়ে আছে যে দুই নক্ষত্রে ঠোকাঠুকি লাগার কিংবা কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু বহু কোটি বৎসরের মধ্যে এমন ঘটনাও ঘটে। সূর্য্যেরও সেই ব্যাপার একবার হয়েছিল; আর-একটি নক্ষত্র বোধ হয় তার কাছাকাছি এসে পড়েছিল। তার ফলে এক তুমুল কাণ্ড হ'ল সূর্য্যের মধ্যে। সূর্য্য একটা জ্বলন্ত বহ্নিপিণ্ড, তবে সেই বহ্নির সঙ্গে তরল পদার্থও কিছু আছে; চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে যেমন জোয়ারের টান আসে, তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে, সেই অজ্ঞাত নক্ষত্র কাছাকাছি আসার ফলে সূর্য্যের তরল বহ্নি-সমুদ্রেও তেমনি জোয়ার এল।

কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ আর সূর্য্যের চেয়েও হয়ত অনেকগুণ বড় এমন একটা নক্ষত্রের আকর্ষণ ত এক নয়। সুতরাং সূর্য্যের মধ্যকার তরল পদার্থে যে ঢেউ উঠল তাও সহজ ব্যাপার হ'ল না। সে তরঙ্গ বিরাট পর্ব্বতসমান হয়ে উঠল এবং ক্রমশ উচু হ'তে হ'তে তার মাথা এত ভারী হয়ে উঠলো যে তা থেকে কতকগুলি টুকরো বিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশের বুকে এসে পড়ল। সমুদ্রের ধারে গেলে এ দৃশ্য আমাদের প্রায়ই চোখে পড়ে: বড় ঢেউগুলো ভাঙ্গবার

মুখে বড় বড় জলের বিন্দু ছিটকে ওঠে এবং তার আকাশের আকর্ষণের চেয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বড় বলে পরে আবার সাগরের বুকে এসেই তারা আছড়ে পড়ে।

সূর্য্যের তরঙ্গ থেকেও যে সব তরল বহ্নি-কণা আকাশের বুকে ছিটকে পড়ল, তারা অন্য কোনও নক্ষত্রের আকর্ষণে দূরে যেতে পারলে না, কারণ যে নক্ষত্রটি সূর্য্যের কাছে আসায় তাদের জন্ম হয়েছিল সে-ও তখন পিছু হটতে শুরু করেছে। কিন্তু স্থির থাকবারও উপায় ছিল না বলে, তারা তাদের জনক সূর্য্যেরই চার পাশে ঘুরতে শুরু করল। নক্ষত্র আর একটু কাছে এলে দুই নক্ষত্রে হয়ত ঠোকাঠুকি বেধে এক প্রলয়-ব্যাপারের সৃষ্টি হ'ত কিন্তু সে সব কিছু ঘটবার আগেই আগন্তুকটির মতি গেল বদ্‌লে, সে আবার মহাশূন্যে পাড়ি দিলে।

ঐ যে বহ্নি-কণা, এরাই হ'ল গ্রহ। সূর্য্যের তুলনায় তারা তরঙ্গবিন্দু হ'লেও ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা এই পৃথিবীটা থেকেই বোঝা যায়। অথচ পৃথিবী আমাদের বিশেষ সৌরমণ্ডলের মধ্যে অনেকের চেয়েই ছোট। কিন্তু বড় বা ছোট অন্য গ্রহ আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। এই বিশেষ সামান্য গ্রহটির কথা জানতেই মস্ত বড় পুঁথির দরকার। আমাদের পৃথিবীর কাছেই আর একটি স্থূল-পিণ্ড আছে যার সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা, সে হ'ল চন্দ্র। এটিও সূর্য্য থেকেই ঠিক্‌রে পড়া ক্ষুদ্রতম বিন্দু কিংবা এ পৃথিবীর তরল বহ্নিস্রোত থেকে জন্মের সময়ে কোনমতে ঠিক্‌রে পড়েছে তা জানা নেই, তবে ওর মধ্যের তাপ বহুকাল নিবে গিয়েছে এটা আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। মরেও কিন্তু বেচারার শান্তি নেই, পৃথিবী আর সূর্য্য দুইয়ের আকর্ষণের মাঝে পড়ে বেচারাকে দিনরাত পৃথিবীরই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

সময়ের জন্ম

জন্মের পর থেকেই গ্রহরা সূর্য্যের চার পাশে ঘুরতে আরম্ভ করলে একথা আগেই বলেছি, কিন্তু সে ঘোরার মধ্যে আর একটু বিশেষত্ব আছে। গ্রহদের পরস্পরের প্রতিও টান কম নয় বলে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অতি শোচনীয়। তারাও অনবরত নিজেদের চার পাশে ঘুরছে আবার সূর্য্যকেও তাদের প্রদক্ষিণ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ মহাশূন্যে কতকগুলি বলের মত পদার্থ নিজেদের চার পাশে ঘুরপাক খেতে খেতে তীরবেগে ছুটে চলেছে। পৃথিবীও সে শাস্তি থেকে রেহাই পায় নি, তাকেও সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত এই কোটি কোটি বৎসর ধরে অনবরত এই ভাবে ছুটতে হচ্ছে। আমাদের এই যে দিনরাতের ব্যবস্থা, সে-ও ঐ ঘোরার জন্যই। পৃথিবীর আকার প্রায় গোলই, যেটুকু এদিক-ওদিক আছে সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই গোলাকার পদার্থটি জন্মের সময় সূর্য্যের মতই জ্বলন্ত ছিল, কিন্তু আজ তার ওপরের আগুন একেবারে নিবে গেছে; আজ সে যেটুকু আলো এবং তাপ পায় তা সূর্য্যের দৌলতেই। গোলাকার পদার্থটি নিজের চার পাশে ঘুর-পাক খাচ্ছে বলে, যখন যে পাশটা সূর্য্যের দিকে থাকে সেই পাশটায় সূর্য্যের প্রচণ্ড বহ্নিদাহের আলো ও তাপ এসে লাগে, সেইটেকেই আমরা বলি দিন আর অন্য পাশটার অন্ধকারকে আখ্যা দিয়েছি রাত্রি। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে ঘুরছে বলে আমাদের মনে হয় সূর্য্য পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে সারাদিন ধরে। পৃথিবীর যে কোন একটি স্থানে দাঁড়িয়ে সূর্য্যের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পর থেকে আবার দেখা হওয়া পর্য্যন্ত এই যে সময়টুকু অর্থাৎ পৃথিবীর নিজ বৃত্তে একবার সম্পূর্ণ পাক খাবার সময়টাকে আমরা বলি এক দিন এবং সূর্য্যের চার পাশে একবার

প্রদক্ষিণ করার সমস্ত সময়টুকুকে বলা হয় এক বৎসর। মিনিট ঘণ্টা, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি সময়কে আমরা অনেক ভাগে ভাগ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু সে যা কিছু হিসাব তা এসেছে ঐ সূর্য্য-প্রদক্ষিণের ব্যাপার থেকেই। কারণ মূলে ঐ বৎসর এবং দিন।

এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান জল-হাওয়ার যোগও কম নয়। মানুষ যেমন খানিকটা ঘুরপাক খাবার পর মাথা ঘুরে ডাইনে-বাঁয়ে টল্‌তে থাকে, পৃথিবীও তেমনি একটু হেলে আছে। ফলে হয় কি, সূর্য্যের সব চেয়ে নিকটতম বিন্দু কখনও পৃথিবীতে এক জায়গায় থাকে না। চলতে চলতে যখন যে স্থানটা সূর্য্যের কাছে এসে পড়ে তখন সেই জায়গাটাতেই গরম বেশী হয়, অন্য জায়গায় পড়ে শীত। কিন্তু এর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সূর্য্য উত্তর দিকে খানিকটা যেতে যেতেই পৃথিবী পড়ে অন্যদিকে হেলে, তখন আবার দক্ষিণে গরম বেড়ে ওঠে অর্থাৎ সেইখান থেকেই সূর্য্য সবচেয়ে কাছে পড়ে। এই যে উত্তর দক্ষিণে সূর্য্যরশ্মির গতি সীমানা, এর কাছাকাছি জায়গাটাকে বলি আমরা নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডল, এর মধ্যে থাকাই সবচেয়ে আরামদায়ক। শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তন হ'লেও মোটের ওপর হাওয়াটা বেশ থাকে। এর বাইরে যে স্থানটা, সেটাকে বলা হয় হিমমণ্ডল; সেখানকার লোক কখনই সূর্য্যদেবকে কাছে পায় না বলে তাদের বার মাসই কঠোর শীত ও বরফের মধ্যে বাস করতে হয়; আবার সূর্য্য-গতির যে মাঝামাঝি স্থানটা, গ্রীষ্মমণ্ডল যার নাম, সেটাও ভারি বদ্ জায়গা, বার মাসই সেখানে গরম। সূর্য্যদেব সেইখানেই বেশী সময় থাকেন কিনা!

জল, মাটী ও জীবন

পৃথিবীর জন্মের পর বহু বৎসর কেটে গেছে। সে যে কত বৎসর তা ঠিক করে নির্ণয় করা কঠিন, তবে যতদূর হিসাব-নিকাশ

করে দেখা যায় তাতে অনুমান হয় ২০০০,০০০,০০০ বৎসরের কম নয়। হয়ত আরও অনেক বেশী, এত বেশী যে কোনও অঙ্ক দিয়ে তা বোঝানো কঠিন, বোঝা আরও কঠিন। কিন্তু তাই বলে মানুষের বয়স এত বেশী নয়, মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্মেছে অনেক পরে, মানুষ হ'ল পৃথিবীর শেষ বয়সের সন্তান। শুধু মানুষ কেন, কোনও রকম প্রাণী বা জীব এই মাটীর বুকে জন্মাতে বহু দিন, বহু বৎসর সময় লেগেছে। তার কারণ পৃথিবীর প্রথম বয়সের অসহ তেজ!

পৃথিবীকে আজ আমরা যা দেখছি তা এই কোটি কোটি বৎসরের পরিবর্ত্তনের ফল। জন্মের প্রথমে তা ছিল সূর্য্যের মতই তরল বহ্নিময় পদার্থের একটা পিণ্ড। সে আগুন নিবতে বহুদিন সময় লাগল। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে জ্বলতে জ্বলতে আগুন যখন নিবল তখন, গরম দুধে যেমন সর পড়ে, তেমনি পৃথিবীর তরলবহ্নির ওপরেও কঠিন পাথরের সর পড়ল। এবং সেই তরল পদার্থের রসভাগটুকু যা বাষ্প হয়ে এতদিন ধরে পৃথিবীর চারপাশে আকাশের গায়ে জমা হয়ে ছিল, পৃথিবী ঠাণ্ডা এবং কঠিন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর উত্তপ্ত বুকে নেমে এল। সে জলও খুব সম্ভব উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত জলের মতই গরম ছিল, ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আগুন নিবে যাবার সময় কি জানি কী কারণে দুধের সর পড়ার মতই পাথরের সরও উচুনীচু হয়ে গিয়েছিল তবে তা দুধের সরের মত নিয়মিত অসমতল নয়, নিতান্ত খাপছাড়া বে-হিসাবী উচুনীচু। সেই অসমতল পাষাণের মধ্যে উচ্চস্থান-গুলোকেই আজ আমরা পাহাড় বলে থাকি। বিপুল পৃথিবীর ব্যাপার ত, তাই তার মধ্যে হিমালয়ের মত উচু পাহাড় এবং অতল সমুদ্রের মত নীচু গর্ত্তও সম্ভব হয়েছে। এই যে উচু পাহাড়ের সৃষ্টি হ'ল এর সঙ্গে জীবসৃষ্টির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সেই কথাই বলব।

বৃষ্টি যখন পড়তে শুরু হ'ল, তখন তা পাহাড়ের ওপরও পড়ল। জলের অধোগতির বেগটা একেই বেশী, তার ওপর অত উঁচু থেকে নামার জন্য পাহাড়ের ওপর যে বৃষ্টির জলটা পড়ল, নীচে নামবার সময় তা ভীষণ বেগে চারিদিকের পাথর ক্ষইয়ে রেণু রেণু ক'রে সেই প্রস্তররেণু সুদ্ধ নেমে এল। কিন্তু নীচে আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন তার গতিবেগ কমে গেল তখন সেই সূক্ষ্ম পাথরের গুঁড়োগুলো জলধারার পথের ধারে ধারে জম্‌তে লাগল, অর্থাৎ ধারে ধারে পলি পড়তে লাগল। ক্রমাগত পলি পড়ে পড়ে সেই যে সমতল মৃত্তিকার সৃষ্টি হ'ল, তারই বুকে একটু একটু করে দেখা দিল প্রাণের লক্ষণ।

পলিপড়া আজও বন্ধ হয় নি, তবে তার সঞ্চয় কিছু কমেছে। কারণ প্রথম যে বাষ্প জমেছিল তার পরিমাণ বিপুল এবং সেই হিসাবেই প্রথম যুগে বৃষ্টি যে কত বেশী পড়েছে তা সহজে অনুমেয়। কিন্তু সেই বৃষ্টির জল এখন পাঁচটি মহাসাগরে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে, সূর্য্যের আলোর তাপে তার মধ্যে খুব সামান্য অংশই বাষ্প বা মেঘের আকারে আকাশে ওঠে। আবার তার মধ্যেও সব বৃষ্টি ত আর পাহাড়ে পড়ে না, সমতল ভূমিতে অনেকখানি নেমে আসে। যে জলটা পাহাড়ে পড়ে সেইটাই নদীরূপে মাটির কোলে গড়িয়ে আসে আর তার সঙ্গেই নিয়ে আসে যা কিছু সামান্য পলি।

প্রথম জল পড়ার দিন থেকে প্রথম জীবনের বিকাশের মধ্যেও এত দিন কেটেছে যে তার সংখ্যা শুন্‌লে চম্‌কে উঠতে হয়; তার কারণ সেই বৃষ্টি-ধারার প্রথম আবির্ভাবের সময় পৃথিবীকে কাটাতে হয়েছে দিনরাত একটা ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে। সে সময়ে আমরা কেউ উপস্থিত থাক্‌লে দেখতুম চীনসাগরের টাইফুনের চেয়ে সহস্রগুণে ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে; আর বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টির যে কী ভীষণতা, তা মানুষ আজকের অতিবড় দুর্য্যোগের দিনেও কল্পনা করতে পারবে না। গরম আগুনের মত

বাতাস ঘণ্টায় সহস্র মাইল বেগে চারিদিকে পাগলের মত দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, তারই বেগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরগুলো ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ছে। সমস্ত পৃথিবীময় যেন কোটি দৈত্যের তাণ্ডব! এর মধ্যে কোনও জীবিত প্রাণীর বেঁচে থাকা কি সম্ভব?

তাই পৃথিবী শান্ত হয়ে যখন জননী মৃত্তিকা দেখা দিলেন, তখন অতি ভয়ে ভয়ে প্রথম জীব দেখা দিল ধরণীর বুকে—সামান্য কীট-রূপে। বহুদিন ধরে মাটী চাপা পড়ে নোনাজলের স্পর্শে বা অন্যান্য কারণে যে সব জিনিস ফসিল বা প্রস্তরীভূত পদার্থে পরিণত হয়েছে, মাটী খুঁড়ে কিংবা পাহাড়ের ওপর থেকে সেই সব ফসিল টেনে বার করে তারই মধ্য থেকে আমরা আদি পৃথিবীর রূপটা ঠাওর করবার চেষ্টা করি। সেই উদ্দেশ্যে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা সর্ব্বপ্রথম যুগের যে সব প্রস্তরীভূত অস্থির দেখা পেয়েছি, তা হ'ল ছোট ছোট সামুদ্রিক পোকা মাত্র! সেই সময়কার সবচেয়ে বড় যে অস্থি চোখে পড়ে তা হ'ল হাত পাঁচ-ছয় লম্বা বিছের। এ ছাড়া তখনকার মাটির উপর কোন প্রাণী, কিংবা মাছ, এমন কি এক গুচ্ছ তৃণলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

তবে এই যে পাহাড়ের ওপর থেকে কিংবা মাটি খুঁড়ে ফসিল খুঁজে খুঁজে কোটি কোটি বৎসর আগেকার ইতিবৃত্ত রচনা করা, এর মধ্যে একটা মস্ত বড় ফাঁকিও আছে। অস্থিহীন, কিংবা প্রস্তরীভূত হয় না কিছুতেই এমন কোনও প্রাণী কি বস্তু যদি তখন পৃথিবীর বুকে থেকেই থাকে তাকে ত আর আমরা ঐ হিসেবের মধ্যে টেনে আন্‌তে পারব না, সে রকম প্রাণী থাকা একেবারে অসম্ভবও নয় তাও আমরা জানি, সুতরাং নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। তবে এখনও পর্য্যন্ত যতটা ভেবে-চিন্তে বৈজ্ঞানিকেরা আন্দাজ করেছেন, তাই নিয়েই আমাদের খুশী থাকতে হবে, উপায় কি।

তা ছাড়া এই সব প্রস্তরীভূত অস্থি থেকে জীবনের সঞ্চার কেন

হ'ল এবং কি-করে, তাও ঠিক বোঝবার কোন উপায় নেই। বৈজ্ঞানিকদের কাছে খুব সম্ভব তা বিস্ময়কর চিররহস্য হয়েই থাক্‌বে। নানা রকমের জীব পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছে নানা সময়ে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই জীবের আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু তারও কোন পরিষ্কার কারণ আমরা জানতে পারিনি। তবে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রাণীদের জীবন-যুদ্ধের প্রয়োজনমত তাদের আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে তাদের জীবনধারণ ও আত্মরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তাই তারা পেয়েছে। প্রথম যুগের সমুদ্রের সাংঘাতিক উত্তাল অবস্থার মধ্যে যে প্রাণী জন্মাল, তার দেহের বাইরে চাই প্রতিমুহূর্ত্তের প্রবল আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য কঠিন আবরণ। সেই জন্যই প্রথম যুগের যে সামুদ্রিক প্রাণীর উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে ঝিনুক বা কড়ি জাতীয় জীবই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

এই সব ছোট প্রাণী ও কাঁকড়া বিছে জাতীয় জীবেরা বহুদিন ধরে জলের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রইল। বহুদিন, মানে বহু সহস্র বৎসর। তারপর একটু একটু করে দাঁত, চোখ, এবং অস্থি বিশিষ্ট এক জীব জলের মধ্যে দেখা দিল। তারাই হ'ল প্রথম যুগের মাছ; এইসব মাছের চিহ্ন আমরা যে স্তরের পর্ব্বত-গাত্রে খুঁজে পাই তা থেকে হিসেব করে দেখেছি যে, ঐ মৎস্যজাতীয় জীবগুলি যখন ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করেছিল, সে সময়টা এখন থেকে অন্তত ৫০০,০০০,০০০ বৎসর আগে। সে রকমের মাছ এখন আর দেখা যায় না; কতকটা হাঙ্গরের মত, তবে অত বড় নয়, বড়জোর হাত দুই, এই ছিল তাদের পরিমাপ। দুই-একটা ওর চেয়ে বড় মাছের অস্থিও পাওয়া গেছে, সে খুব কম।

কয়লার পূর্ব্বজন্ম

পৃথিবীর ওপরের তরল আগুন ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন স্তর পড়ল বটে, কিন্তু তাতে করে তখনই বর্ত্তমান যুগের মত নিয়মিত শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর লীলা বা সহনীয় আবহাওয়া পাওয়া গেল একথা ভাবলে ঠিক হবে না। ভূতত্ত্ববিদেরা নানারকমের গবেষণা করে জেনেছেন যে, পৃথিবীতে এক এক সময়ে বিচিত্র প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় একাদিক্রমে বহুদিন ধরে দুঃসহ শীত কিংবা দুঃসহ তাপ সহ্য করতে হয়েছে। কেন হয়েছে তা পরিষ্কার জানা যায়নি, হয়ত সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধিই তার কারণ, কিংবা অন্য কিছু!—কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গোলমালও সহজে মেটেনি। প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয়ে কোথাও নতুন পাহাড় জেগেছে, কোথাও বা উঁচু পাহাড় বসে গিয়ে গভীর সমুদ্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। এই কারণেই মাটির বুকে গাছপালা বা স্থলচর প্রাণী দেখা দিতে বহু বিলম্ব ঘটেছিল। কোন্‌টা যে আগে দেখা দিয়েছিল তা জানা নেই, খুব সম্ভব বৃক্ষলতাই পৃথিবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, তবে প্রাণীরাও যে গাছপালার জন্মের খুব বেশী পরে জন্মায়নি এটাও ঠিক।

কিন্তু প্রথম যে সব বৃক্ষলতা জন্মাল তারা বেশীদিন বাঁচেনি। জলা বা পাঁকের মধ্যেই প্রথম যুগের গাছপালা জন্মেছিল, কিছুদিন পরে গাছপালা সুদ্ধই ঐ সব জলা-জমি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেল। পাঁক আর গাছ দুই-ই বহু সহস্র বৎসর ধরে মাটির নীচে থেকে সূর্য্যের তেজ আহরণ করে ক্রমশ কয়লায় রূপান্তরিত হল। আজ যে কয়লা আমরা উনুনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে ভাত-ডাল রেঁধে খাচ্ছি, তা সেই সময়কারই সেই বস্তু, মাটী খুঁড়ে আমরা বার করেছি। খনির মধ্যে যখন কয়লার স্তর সহজ অবস্থায়

দেখা যায়, তখন অনেক সময়ে সাধারণ লোকেও গাছের স্তর বা শিকড় প্রভৃতির অবস্থান বুঝতে পারে।

এই জলাভূমির মধ্যেই প্রথম কয়েক রকমের স্থলচর জীব দেখা যায়। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল উভচর অর্থাৎ জলে এবং ডাঙ্গায় দু-জায়গাতেই থাকতে পারত, আর প্রত্যেকটিই ডিম পাড়ত। এইসব জীব বেশীর ভাগই ছিল পতঙ্গ-জাতীয়—শতপদ (বিছুট), কেন্নুই বা ঐ শ্রেণীর বিছে জাতীয় জীব। কিন্তু এদের সকলকারই দেহে অস্থি-র চিহ্ন পাওয়া গেছে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমকার যে জীবদের আমরা দেখেছি, তাদের কারুরই মেরুদণ্ড ছিল না, কিন্তু এইবার অস্থি বা মেরুদণ্ড বিশিষ্ট অথচ ডিম্ব প্রসবকারী জীব দেখা দিল। এদের মধ্যে কোন কোনটা খুব বড়ও ছিল, বিরাটাকার ডানা সুদ্ধ পতঙ্গের চিহ্নও এ সময়ে পাওয়া গেছে।

এই যে স্থলচর জীব, এরা কিন্তু তখনও ঐ জলের ধারে ধারে পাঁকের মধ্যেই বিচরণ করত। সুতরাং পাহাড়ের ওপর বা অপেক্ষাকৃত সমতলক্ষেত্রেও তখন গাছ কিংবা প্রাণী কিছুরই চিহ্ন ছিল না। পৃথিবীর বুকে জীবনের সীমানা তখনও ছিল ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ !

সরীসৃপ ও অতিকায় জন্তু

কয়লার যুগের সামান্য প্রাণলক্ষণ দেখা দেবার কিছুদিন পরেই ধরিত্রীর বুকে আবার নেমে এল দুঃসহ, কঠিন একটা হিমশৈত্য। সেই শুষ্ক শৈত্যের মধ্যে গাছপালা ও প্রাণী দুই-ই মরে গেল এবং ধীরে ধীরে, বহুদিন পরে তার ওপর ধূলো ও বালি চাপা পড়ে ক্রমে ক্রমে কয়লার রূপ ধারণ করলে। বহু সহস্র বৎসর পরে আবার

যেন একটু একটু করে পৃথিবীর অবস্থান পরিবর্ত্তিত হয়ে গরম আবহাওয়া দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে মাটীর ওপরেও প্রাণসঞ্চার হ'ল। এবার কিন্তু সোজাসুজি স্থলচর জীবের অস্তিত্ব পাওয়া গেল, অর্থাৎ যারা জল থেকে বহুদূরেও বিচরণ করতে পারে। এই সব জীবদের অধিকাংশই ছিল সরীসৃপ শ্রেণীর, —কুমীর, কচ্ছপ, গিরগিটি জাতীয়। এরাও ডিম পাড়ত বটে, কিন্তু কয়লার যুগের পতঙ্গদের মত এদের ডিম পাড়তে জলের মধ্যে যেতে হ'ত না কিংবা জীবনধারণের জন্য জলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতেও হ'ত না। এই সময় অল্প অল্প করে গাছ-পালাও দেখা দিয়েছিল এবং ঐ সব গাছ-পালার পাতা ও ফল-মূল খেয়েই তখনকার ঐ সরীসৃপরা জীবনধারণ করত।

সরীসৃপ আমাদের সময়েও কিছু কিছু আছে বটে, যেমন সাপ, কচ্ছপ, গিরগিটি, কুমীর ইত্যাদি, কিন্তু এখন তা সংখ্যা ও পরিমাণ হয়েতেই অনেক ছোট। তার কারণ বোধ হয় যথেষ্ট উষ্ণতার অভাব। আমরা এখন দেখি শীতকালে এই সব সরীসৃপের অত্যাচার একেবারে কমে যায়, আবার বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। কিন্তু তখনকার যে সব চিহ্ন পাহাড়ের মধ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যে, সরীসৃপদের জাতি ও সংখ্যা ছিল তখন অজস্র এবং তাদের আকারও এত বৃহৎ যে কল্পনা করা যায় না। খুব সম্ভব তখন কোন অজ্ঞাত কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া সব সময়েই গরম থাক্‌ত।

সাধারণ কুমীর, গিরগিটি সাপ ছাড়াও তখন নানা রকমের সরীসৃপ ধরণীর বুকে বিচরণ করত। এদের এক একটির আকার ছিল মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একশ' ফুট বা প্রায় সত্তর হাত লম্বা; সেই পরিমাণে আবার উঁচুও ছিল। তাহলে হিসেব মত জন্তুটা কতবড় দাঁড়ায় মনে মনে ভেবে দেখলে মাথা ঝিম্ ঝিম করতে

থাকে! ডাইনোসরস বলা হয় যাদের, তাদের ছবি দেখলেই আমাদেব আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যায়।

এদের মধ্যে একরকম সরীসৃপ আবার ছিল, তাদের সামনের দিকের পা-দুটো ছিল কতকটা ডানার মত, যাদের টেরোড্যাক্‌টিল বলা হয় এখন। এবা লাফালাফি করে বেড়াত, অল্পস্বল্প উড়তেও পাবত। টেরোড্যাক্‌টিলই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম পক্ষী-জাতীয় জীব।

স্থলে বা আকাশেব মত এই সময় জলেও বৃহদাকাব সবীসৃপেব অভাব ছিল না। প্লেসিওস্‌র, ইক্‌থিওস্‌ব প্রভৃতি আধুনিক তিমির মত অতিকায় কতকগুলি জীব জলে রাজত্ব করত। এই সময়ে সামুদ্রিক অন্য যে সব প্রাণীব চিহ্ন পাই, তা নিতান্তই ঝিনুকের মত খোলায় ঢাকা নগণ্য জীব—তাদের কথা আমবা স্বচ্ছন্দে ভুলে যেতে পাবি। কিন্তু এই যে অতিকায জীবগুলি, এবা জলে স্থলে যখন বিচরণ কবত, তখন কোন মানুষ গিয়ে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলে তাব না জানি কি দুরবস্থাই হ'ত।

সবীসৃপের যুগ চলেছিল প্রায় আট কোটি বৎসব ধবে। ডাইনোসব টেবোড্যাক্‌টিলেব দল পৃথিবীব উপব অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব কবাব পব প্রকৃতিব অমোঘ বিধানে আবার পৃথিবীব ওপর কিছুকালেব মত মবণ-শৈত্য নেমে এল। প্রথম প্রথম সবীসৃপের দল সে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ কবাব জন্য চেষ্টা করেছিল; এই সময়কার একরকম ছোট ছোট সবীসৃপ আমরা দেখতে পাই যাদেব শীত নিবারণেব জন্য পালখ ও অল্প ডানা দেখা দিয়েছিল যদিও তাদেব ঠিক পুবোদস্তুব পাখী বলা যায় না। এ ছাড়া স্থলচব জীবদের দেহেও শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষাব জন্য কিছু কিছু লোম বোধহয় জন্মেছিল। কিন্তু হায়, তবুও তাবা নিজেদের জীবনের অস্তিত্ব বেশী দিন রাখতে পারলে না, একদিন আবার সমস্ত প্রাণের লক্ষণ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল।



এক শ্রেণীর ডাইনোসরের অস্থি



১৫০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের একটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান যুগের সূচনা

এর পর কিছুদিন ধরে পৃথিবীর প্রাণের ইতিহাস একেবারে নীরব। বহুলক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীর বুকে যারা আনন্দে বিচরণ করে গেল, তারা এই শীতল দুঃখদিনের উপযোগী কোন সঞ্চয়ই করতে পারেনি। সুতরাং আবার সহস্র সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবী জীব-লক্ষণ-হীন মরুভূমির মত পড়ে রইল। তারপর যে প্রাণের চিহ্ন পণ্ডিতেরা আবার আবিষ্কার করলেন, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু পরিবর্ত্তন হ'লেও জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণই আছে, সুতরাং সেটাকে আমরা বর্ত্তমান যুগেরই সূচনা বলে ধরে নিতে পারি। বাহ্যিক রূপান্তর ঘটেছে, জীবনের প্রয়োজনে জীবের দেহে পরিবর্ত্তন এসেছে, কিন্তু তাকে এখনও আগের মত আর এ রকম নিষ্করুণ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়নি।

এই বর্ত্তমান যুগের সূচনা হয় একটা প্রাকৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। যতদূর অনুমান হয় দীর্ঘদিনব্যাপী আগ্নেয়গিরির উৎপাতে ঐ সময়ে পৃথিবীর বাহ্যিক রূপের একটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের উচ্চ পাহাড়গুলির জন্মও এই সময়। এক কথায় সেই সময় পৃথিবীটা নতুন করে ভেঙে-চুরে টোল খেয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সরীসৃপদের যুগে কিংবা কয়লার যুগে পৃথিবীর পাহাড় বা সমুদ্রের যে অবস্থা ছিল, তার আর কোন চিহ্ন রইল না, নতুন পাহাড় এবং নতুন সমুদ্র জন্ম নিল। এখন আমরা পৃথিবীর যে চেহারা দেখতে পাচ্ছি তা ঐ নবদেহেরই বয়সবৃদ্ধির চেহারা। নদীর পলিতে পলিতে নতুন দেশ গড়ে উঠেছে, দু-একটা জায়গার চড়াগুলো অল্প-স্বল্প হয়ত সাগরের গর্ভে ডুবেছে, কিন্তু মোটামুটি পাহাড়গুলোর বিশেষ স্থানপরিবর্ত্তন হয়নি।

এই নতুন ব্যবস্থার ফলে শীত কেটে গিয়ে পৃথিবীর বুকে আবার গরম হাওয়া বইল। মাটীতে দেখা দিল তৃণলতা এবং নতুন ধরণের প্রাণী। এই প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ ঘাস বা শিকড়-বাকড় খেয়েই থাকত, কেউ কেউ মাংসভুক্‌ও ছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই সময়কার অতিকায় প্রাণীদের দেখলে হয়ত মনে হ'ত যে এরা সেই সরীসৃপদের, ডাইনোসরদেরই বংশধর—তারাই বুঝি আবার নবজন্ম লাভ করলে। কিন্তু, যতদূর পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, তা নয়। সরীসৃপরা ডিম প্রসব করেই সরে পড়ত, নবজাতকের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাক্‌ত না। অর্থাৎ কারুর সঙ্গে কারুরই আত্মার যোগ থাকত না। কিন্তু নবযুগের এই স্তন্যপায়ী অতিকায় প্রাণীদের মধ্যে সামান্য রকমের সামাজিক ব্যবস্থা দেখা দিল। সন্তানেরা পিতামাতা উভয়কে না হোক্‌, অন্তত মাতাকে চিনত। ফলে একই গোত্রের প্রাণীরা দলবদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করত, স্বজাতির সাহায্য ও সাহচর্য্য চাইত।

আরও একটা বিশেষ তফাৎ এদের মধ্যে যা দেখা দিল, তা হচ্ছে মস্তিষ্কের। সরীসৃপযুগের জীবদের ও-বালাই ছিল না বললেই হয়, কিন্তু এদের মধ্যে ঐ বস্তুটি একটু একটু করে দেখা গেল এবং ক্রমশ সেইটিরই বৃদ্ধি হয়ে 'অধিকতর মস্তিষ্ক বিশিষ্ট' নতুন ধরণের সব জীব দেখা গেল। এদের শ্রেণী বা জাতি বড় কম ছিল না; এখন আর তাদের মধ্যে কোন জীবই নেই বটে, তবে তাদের কারুর কারুর সঙ্গে বর্ত্তমানকালের হাতী, ঘোড়া, বাঘ, জলহস্তী বা গণ্ডারের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। তারাই ছিল পৃথিবীর সন্তান। এখন যেখানে মানুষ লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মত শহর গড়ে তুলেছে, কল্পনা করো সেইখানেই তখন এখনকার বাঘেদের চেয়ে অনেকগুণ বড়, তলোয়ারের মত দাঁত-ওয়ালা অসংখ্য বাঘ ঘুরে বেড়াত।

আবার তুষার-যুগ

পৃথিবীর এই বসন্তকালও একদিন শেষ হ'ল। প্রথম বারের মত আবার পৃথিবীর বুকে নেমে এল তুষারের আবরণ; বৃষ্টি নেই, উষ্ণতা নেই,—শুধু কঠিন প্রাণঘাতী শৈত্য। তার ফলে এই নবযুগের প্রাণীদের অনেককেই বিদায় নিতে হ'ল, শুধু দুই-একটি লোমশ জীব কোনমতে সেই শীতের মধ্যেও প্রাণ ধারণ করে রইল। এবারে ঠাণ্ডাটা পড়ল পৃথিবীর উত্তর দিকেই বেশী, বর্ত্তমান ইউরোপ ও উত্তর এশিয়া সমস্ত বরফে ঢাকা পড়ে গেল, আর এই যে জীবগুলি রইল তারা কোনমতে উত্তরের দক্ষিণ পৃথিবীতে সামান্য ঘাস-পাতা খেয়ে বেঁচে রইল।

অনেক দিন, অনেক সহস্র বৎসর ধরে চলল পৃথিবীর এই শীতকাল, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় চতুর্থ তুষার-যুগ, আর তারই মধ্যে ভগবানের বিচিত্র বিধানে বুদ্ধিবৃত্তিতে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর দুই জীব, নর আর বানর ধীরে ধীরে দেখা দিল।

অবশ্য বানরেরা ঠিক যে কতদিন আগে পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে তা ঠিক করে বলা শক্ত, কারণ আমাদের ইতিহাসের দৌড় ত ভূতত্ত্ববিদ্‌দের পাহাড় থেকে খুঁজে বার করা হাড়ের 'ফসিল' পর্য্যন্ত। বানর-জাতীয় জীবেরা সাধারণত গাছে গাছে বা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। সমুদ্রের জলে না ডুবলে কিংবা চট করে পলির মধ্যে ডুবে না গেলে অস্থি ফসিল্ হয় না, সুতরাং বানরদের ঐ শ্রেণীর প্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া শক্ত। তবে পণ্ডিতেরা অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছেন যে চল্লিশ লক্ষ বৎসর আগেও বানরজাতীয় জীব ছিল পৃথিবীতে। অবশ্য তাদের মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্ক নামক পদার্থটি ছিল না বললেই হয়।

কিন্তু এই শেষ তুষার-যুগের বানররা আগেকার চেয়ে ঢের উন্নত

২

শ্রেণীর জীব ছিল। এদেরই একটা শ্রেণী, বনমানুষ বা 'এপ্' যাদের বলা চলে, তাদের অনেক কিছুই মানুষের মত ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই অর্দ্ধনর প্রাণীরাই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ, প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের ফলে ক্রমশ মানুষে পরিণত হয়েছে। এই বনমানুষরা ঠিক কি রকম ছিল অর্থাৎ তাদের চালচলন কি রকম ছিল কিংবা ঠিক কবে তারা প্রথম মাটীতে জন্মগ্রহণ করেছিল তা কিছুই জানা নেই বটে কিন্তু পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার ভূ-স্তর থেকে পাথরের অস্ত্র-জাতীয় যে সব বস্তু পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় যে ঐ সময়ে অন্তত এমন 'মানুষের মত' জীব পৃথিবীতে বিচরণ করত যারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য কিংবা অন্য কাজের জন্য পাথর থেকে ঐ সব বিশেষ বস্তুগুলি তৈরী করেছিল, যদিচ যারা ঐগুলি তৈরী করেছিল তাদের কোনও অস্থি সে সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায় না! একমাত্র জাভার একটি গ্রামে ঐ সময়কার পর্ব্বত-স্তর থেকে বনমানুষের একটা খুলি ও কয়েকটা হাড় এমন পাওয়া গেছে যাতে করে বোঝা যায় যে তার মস্তিষ্ক-কোষ অন্য বনমানুষদের চেয়ে বড় ছিল এবং সে প্রায় মানুষের মতই সোজা হয়ে হাঁটতে পারত!

এই অস্ত্রগুলি হ'ল বৈজ্ঞানিকদের কাছে সব চেয়ে বিস্ময়। কারণ যত দিন যেতে লাগল ঐ সব অস্ত্রের চেহারা বদ্‌লাতে লাগল, অথচ মানুষের কাছাকাছি যায় এমন জীবের অস্তিত্ব আমরা পাচ্ছি ঢের পরে। প্রথমকার অস্ত্রগুলি ছিল পাথরই—কতকটা কাজ-চলার উপযোগী করে নেওয়া; কিন্তু ক্রমশ যে সব জিনিস পাওয়া গেল তা যে রীতিমত পরিশ্রম করে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরী করা তাতে কোনও সন্দেহ রইল না, আর সেগুলি মানুষের ব্যবহার্য্য অস্ত্রের তুলনায় অনেক বড়ও; কিন্তু যারা এসব তৈরী করলে, ব্যবহার করলে, তারা কোথায়, তারা কী?

প্রথম যে সময়ে মানুষের মত জীবের দেখা পাওয়া গেল তা মাত্র

আড়াই লক্ষ বৎসর আগেকার কথা। হিডেল্‌বার্গ নামক একটি স্থানে একটা চোয়াল কুড়িয়ে পাওয়া গেল, যার সঙ্গে মানুষের চোয়ালের অনেকটা সাদৃশ্য আছে! সাধারণ মানুষের চোয়ালের চেয়ে অনেক বড়, থুৎনি-হীন, পরিসর-হীন ব্যাপার একটা, কিন্তু তবুও মানুষের মত। তার গঠন দেখে আমাদের কল্পনা যতদূর যায় তাতে আমরা মনে মনে দেখতে পাই কতকটা মানুষের মত বিরাটকায় একটা জীব, সর্ব্বাঙ্গ লোমে ভরা এবং বাক্‌-শক্তিহীন!

এই একটি মাত্র অস্থি! অথচ ঐ সময়কারই, খুবসম্ভব ঐ শ্রেণীর জীবদেরই প্রস্তুত অস্ত্র পড়ে রয়েছে রাশি রাশি! এই কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌রা শুধু হাত কামড়ান্‌ আর কিছুই করতে পারেন না।

কিন্তু তাঁদের সমস্যার এইখানেই শেষ নয়। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের যে জায়গাটাকে আমরা সাসেক্স বলি সেইখানে প্রায় দেড় লক্ষ বৎসরের একটা অবক্ষেপের মধ্যে থেকে কতকগুলো এমন হাড় পাওয়া গেছে যা ভূতত্ত্ববিদ্‌দের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। সাধারণ বনমানুষের চেয়ে অনেক বড়, মানুষের মাথার সঙ্গে সাদৃশ্য-যুক্ত এক খুলি আর তার সঙ্গে কতকগুলো হাড় একত্র পড়ে ছিল। ঐ হাড়ের মধ্যে একটা হাতীর দাঁত পাওয়া গেছে, তার ঠিক মাঝখানে একটি ফুটো। সে ফুটো স্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় তা কেউ হাতে করে করেছে। কে করলে এ ফুটো? মানুষের মত বসে বসে হাড়ে গর্ত্ত করেছে অথচ মানুষ নয়—সে কী রকম প্রাণী, কে বলবে!

কিন্তু ঐ একটি, আর কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায়নি। অথচ বৈজ্ঞানিকরা ভূস্তর পরীক্ষা করতে করতে যত বর্ত্তমান কালের দিকে এগিয়েছেন, তত তাঁরা দেখতে পেয়েছেন নিপুণ হাতের তৈরী নানা রকম যন্ত্রপাতি, ছুরী, বাটালী, তুরপুন, কুড়ুল—এই সব। সাধারণ বানর বা বনমানুষের কাজ এ সব নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু

পণ্ডিতেরা বলছেন, যতই যন্ত্র পাও আর যাই করো তবু আমরা বলব সে সময়ে আর যাই হোক মানুষ ছিল না। বানরের চেয়ে বুদ্ধিমান্ অন্য কোন জীব, যার সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্ককোষের সামান্য মাত্র সাদৃশ্য আছে—কিন্তু মানুষ নয়।

রহস্যময় বিচিত্র অতীত নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু পরিহাসের হাসি হাসে, কোন জবাব পাওয়া যায় না এ কথার!

অর্দ্ধনর

এখন থেকে পঞ্চাশ কি বাট হাজার বছর আগে চতুর্থ তুষার-যুগের অন্তিমকালে বর্ত্তমান ইউরোপে আমরা এমন সব শিলীভূত অস্থি বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি পেয়েছি যাতে করে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের মনে হয়েছে তা মানুষেরই কিংবা আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা বল্‌ছেন যে, না, সেও ঠিক মানুষ নয়, মনুষ্যেতর অর্দ্ধনর কোন প্রাণী। ঠিক এদেরই পরবর্ত্তীপুরুষ যে বর্ত্তমান কালের মানব তাও নয়—মানুষের পূর্ব্বপুরুষ অন্য কোন ধরণের লোক ছিল।

যাই হোক্—সে বিবাদ পণ্ডিতেরা করুন, আমরা এখন দেখি এই অর্দ্ধনরেরা ছিল কেমন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে এরা আগুন জ্বালাবার কৌশল জানত, শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহার মধ্যে বাস করত, বল্কল ও পশুচর্ম্ম পরত, মানুষের মত কাজে-কর্ম্মে ডানহাতই বেশী ব্যবহার করত এবং নিজেদের প্রয়োজন মত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিত। এদের কপাল ছিল খুব ছোট, আর চোয়াল ছিল প্রকাণ্ড। গলা তাদের ছিল না বললেই হয়, ফলে আমাদের মত তারা ইচ্ছামত

ঘাড় ঘোরাতে পারত না। খুব সম্ভব তারা সোজা হয়ে হাঁটতেও পারত না, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বেঁকে চল্‌ত।

এদের মস্তিষ্ককোষ বড় ছিল বটে কিন্তু তার গঠন ঠিক মানুষের মত নয়। তাতে মনে হয় এদের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের থেকে অন্য রকমেরই ছিল। দাঁতের গঠন ছিল অত্যন্ত বিচিত্র, তা থেকে অনুমান করা যায় যে এরা মাছমাংসের থেকে ফলমূলই বেশী খেত। বহু সহস্র বৎসর ধরে এরা কন্দ বা শাক-সব্‌জী খেয়েই জীবনধারণ করেছে, তবে এদের বাস-গুহাতে কোন কোন জন্তুর অস্থিও পাওয়া গেছে তাতে করে বোধ হয় যে শেষের দিকে কিছু কিছু মাংস খেতে শুরু করেছিল।

তখনও পৃথিবীর অর্দ্ধেক স্থান কঠিন তুষারে আচ্ছন্ন, শীতের প্রকোপ খুব বেশী চলেছে। তখন পৃথিবীর গঠন ঠিক এখনকার মত ছিল না। এখন যেখানে আমরা বাস করছি সেই বাঙ্গালাদেশ বা কাশী-এলাহাবাদের কোন চিহ্ন ছিল না, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তখনও সমুদ্রের ব্যবধান রচিত হয় নি। এই দুটি কথা থেকেই বোঝা যাবে যে পৃথিবীর বাহ্যরূপ তখন থেকে কত পরিবর্ত্তিত হয়েছে। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধ তখন ছিল বৃক্ষলতা-বিরল মরুভূমির মত—দক্ষিণার্দ্ধে যদিও তখন কিছু কিছু উষ্ণতার সঙ্গে গাছপালা দেখা দিয়েছে, তবুও তখন তার অধিকাংশই বিগত মৃত্যু-হিম শীতের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, অধিকাংশ স্থান তখনও অনুর্ব্বর।

এরই মধ্যে ঐ অর্দ্ধনর জীবেরা বহুদিন কাটিয়েছে। তাদের সঙ্গী ছিল লোমশ অতিকায় হস্তী, বড় বড় লোমওয়ালা গণ্ডার, বন্যমৃগ আর লোমযুক্ত বলীবর্দ্দ। কি রকম দেখতে ছিল ঐ 'খানিকটা-মানুষ'গুলি তা আজ ঠিক করে বলা কঠিন। তবে তাদের চোয়ালের গড়ন দেখলে মনে হয় যে তারা কথা কইতে পারত না।

এই মানুষ এবং সত্যিকারের মানুষ অর্থাৎ আমাদের যথার্থ পূর্ব্বপুরুষ এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থার কথা এখনও পর্য্যন্ত কিছু ভাল করে জানা যায়নি। কি ভাবে মানুষের প্রথম জন্ম হ'ল এবং ঠিক কোথায় তাদের প্রথম দেখা গেল তার ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত; কখনও জানা যাবে কি না ঠিক নেই। তবে সম্প্রতি, খুব সম্প্রতি আফ্রিকার রোডেসিয়া অঞ্চলে একটা অস্থি কুড়িয়ে পাওয়া গেছে যার গঠন উত্তরার্দ্ধের অধিবাসী অর্দ্ধনরের থেকে কিছু স্বতন্ত্র। এর মস্তিষ্ক ছিল আমাদেরই মত, মানুষেরই মত এ সোজা হয়ে চলতে পারত এবং এর দাঁতের গঠন সম্পূর্ণ মানুষের দাঁতের মতই। তবে কপাল বা চোয়াল দেখে মনে হয় যে মুখের চেহারা সেই বন-মানুষের মতই ছিল।

তা হোক—তবু এরা বনমানুষ ছিল না, এমন কি ঐ অর্দ্ধনর জীবের থেকেও অনেক উন্নত শ্রেণীর জীব ছিল। কিন্তু ঠিক যে কবে এদের পৃথিবীতে প্রথম দেখা গিয়েছিল এবং কতদিন ধরে এরা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে তা এখনও ভাল করে নির্ণীত হয় নি। এদের অধিকাংশ ইতিহাস এখনও রহস্যের আবরণে ঢাকা আছে।

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ

যথার্থ মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায় যে সময়ে, সেটা বহুদিনের কথা নয়, পৃথিবীর বয়স এবং তার এক একটা যুগের বয়সের তুলনায় মাত্র কালকের কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। এদের প্রথম-উদ্ভব-সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা করেও কোন মীমাংসায় পৌঁছনো যায়নি। ডারউইন প্রভৃতি একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের মত হচ্ছে যে বনমানুষেরই একটা সম্প্রদায়, ইংরেজীতে যাকে বলে Species, ক্রমশ উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মানুষের বর্ত্তমান অবস্থায়

এসে পৌঁচেছে। কিন্তু সে কথা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, এমন কি কোন কোন দেশে এ-মতের কথা ছাত্রদের শোনানো পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

প্রায় সব দেশেরই ধর্মমত বলে যে, ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এখানে বাস করবার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেন। ক্রীশ্চানরা বলে যে, ভগবান সমস্ত সৃষ্টি করবার পর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানুষ তৈরী করেন এবং আদি নর-নারী আদম ও ঈভ্‌কে সৃষ্টি করে প্রথমে স্বর্গের উদ্যানে রেখে দেন। পরে ঈভের এক অপরাধের জন্য দুজনেই স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই দুঃখময় পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হয় এবং তাদেরই সন্তানসন্ততি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীময় এই এতগুলি মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যান্য দেশের প্রচলিত বিশ্বাসও কতকটা এই ধারা বেয়েই চলে। হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে আদি পিতামহ ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টির মানসে নিজের ইচ্ছা থেকে মনুকে সৃষ্টি করেন, সেই মনুর সন্তানসন্ততিই বর্ত্তমান মানুষ। মনুর ছেলে বলেই তার নাম মানব। বোধহয় প্রথম-সৃষ্টি-রহস্য কারুরই জানা নেই বলে ভগবানের ইচ্ছা বা সৃষ্টি বলে মেনে নিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর না মেনেই বা উপায় কি? তবে হিন্দুধর্ম্মের যে দশাবতার কল্পনা তার সঙ্গে জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতদের মত অনেকটা মেলে। দশাবতারের প্রথম অবতার মৎস্য, অর্থাৎ জলচর বা সমুদ্রচর প্রাণী। তারপরে কূর্ম্ম বা সরীসৃপ, তারপরে অতিকায় বরাহ, তারপর নৃসিংহ বা অর্দ্ধনর জীব, যার মুখটা পশুর মত কিন্তু দেহটা মানুষের মত, বামন, বামনের পর কুঠারধারী যুদ্ধপ্রিয় পরশুরাম ইত্যাদি। হিন্দুরা জীবকে ভগবানেরই অংশ-বিশেষ বলে মনে করে, সুতরাং এক এক যুগে বিশেষ বিশেষ জীবের আবির্ভাবকে ভগবানের এক এক বিশেষ অবতার বলে মনে করা বিচিত্রও নয়।

সে যাই হোক্—প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত মতকেই আঁকড়ে ধরে ছিল বহুকাল। এই সেদিন পর্য্যন্ত ক্যাথলিক রাজত্বে অন্যরকম গবেষণাসিদ্ধ মত বিশেষ দণ্ডার্হ বলে গণ্য হ'ত। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এমন দৃঢ়স্বরে নিজেদের মত ঘোষণা করছেন, যাতে করে ধর্ম্মমতের উক্তির গুরুত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

অবশ্য, আমরা আগেই যা বলেছি, ঠিক কোথা থেকে, কবে এবং কি করে বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্বপুরুষদের অভ্যুদয় হ'ল সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান একেবারে নীরব। কারণ এ বিষয়ে গবেষণা এখনও শেষ হয়নি, এখনও বহু পথ বাকী। ইউরোপে আদিমানবের যে চিহ্ন পাওয়া গেছে তা ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছরের মাত্র পুরানো! সেই সব চিহ্নের বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধে উচ্চতর স্থানেই প্রথম মানবের বিকাশ হয়। পরে উত্তরার্দ্ধের তুষার যেমন একটু একটু করে সরে যেতে লাগল, তরুলতা এবং সেই তরুলতাভুক্ অন্যান্য জন্তুরা যেমন একটু একটু করে সেখানে দেখা দিতে লাগল, মানুষও অমনি নিজের খাদ্যের সন্ধানে ধীরে ধীরে তাদের পিছু পিছু সেখানে উপস্থিত হ'ল। এরা যখন ইউরোপে বা উত্তর এশিয়ায় উপস্থিত হ'ল তখনও সেখানে অন্যনর জীবেরা বাস করছে; তাদের সঙ্গে আদি মানবের যুদ্ধ বাধল এবং সেই যুদ্ধে তাদের বার বার পরাজয় ঘটল। ক্রমশ তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আদি মানবের হাতে তাদের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটল।

কিন্তু এ-ত হল শুধু ইউরোপের কথা, তাদের আগের ইতিহাস কি?

তাদের আগের ইতিহাস কিছু জানা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা ইউরোপে যেমন গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েছেন তেমন এশিয়া কি আফ্রিকায় পাননি। এশিয়া বা আফ্রিকার গিরিকন্দরে হয়ত

আদি মানবের আদিম ইতিহাস এখনও নানারূপে ছড়ানো রয়েছে, সে সবে যদি কোনদিন বৈজ্ঞানিকদের চোখ পড়ে ত সে ইতিবৃত্ত মানুষের জ্ঞানগোচর হবে, না-হয় ত চিরকাল নানারূপ অনুমানের উপর নির্ভর করেই কাটাতে হবে। হয়ত বা সমস্ত চিহ্ন আজ সাগরের গর্ভেই চলে গেছে, তার বাকিগুলো প্রবালে ঢাকা পড়ে আছে। সে ত কম দিনের কথা নয়, তারপর পৃথিবীর রূপ অনেক বদলেছে যে।

কবির ভাষায়

> "এ সব গেছে কত সাগরে
> কত সাগরে শুকাল বারি
> কত নদী গেছে পথ ভুলিয়া
> গলি গেছে কত গিরি।"

এশিয়া বা আফ্রিকার অনুসন্ধান এখনও বাকি থাকলেও আমেরিকায় বিস্তর খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে অর্দ্ধনর বা আদিমানবের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। সেখানে সব চেয়ে পুরানো দিনের যে চিহ্ন পাওয়া গেছে তা মানবের মধ্যযুগের কথা। তাতে করে বোঝা যায় যে, মানবের যা কিছু বিকাশ তা ঘটেছে পৃথিবীর এই দিকেই, মানুষ তাই বহুদিন পরে বেরিংএর আধুনালুপ্ত পথ বেয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল। সেখানকার ইতিহাস শুরু হয়েছে এই সেদিন।

আদি মানবের জীবনযাত্রা

দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষ করে স্পেনের গিরিগুহায়, যে সব চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে তাই থেকেই আমরা আদি মানবের জীবনযাত্রার বিবরণ অনুমান করে নিতে পারি। বিশেষ করে স্পেনের কথা

উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য এই যে এখনও পর্য্যন্ত যেখানে যা কিছু পাওয়া গেছে তার মধ্যে স্পেনেই পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী। ক্রো-ম্যাগনন্ ও গ্রিমাল্ডী এই দুটি স্থানে পর্ব্বতগুহার মধ্যে রাশীকৃত হাড়, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গেছে। যদিও এই দুটি আড্ডার মানব-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের ছিল তবুও তারা মূলত মানুষই বা মানুষের পূর্ব্বপুরুষ।

আদি মানবের বাহ্য-আকৃতি হয়ত ঠিক এখনকার মানুষের মত ছিল না, কিন্তু তাদের দেহের মূল গঠন, মস্তিষ্ককোষের আকার ও সংস্থান, দাঁতের গঠন সবই মানুষের মত। এরা কথা কইতে পারত, সামাজিক ভাবে দল বেঁধে থাকত এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি শিকার করে খেত। যে দুটি পর্ব্বত-গুহার কথা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে ক্রো-ম্যাগননে যে সব মানুষের অস্থি পাওয়া গেছে তারা খুব লম্বা-চওড়া ছিল, তাদের মাথার খুলি এবং হাড়ের দৈর্ঘ্য দেখে মনে হয় যে তারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ লোক ছিল। গ্রিমাল্ডীর পর্ব্বতগুহার আদিম অধিবাসীরা কিন্তু যে এদের থেকে একটু নিকৃষ্ট ধরণের মানুষ ছিল তাতে আর সন্দেহ নাই। এখন মধ্য-আফ্রিকার জঙ্গলে যে-সব অসভ্য অধিবাসীদের দেখা যায় তাদের সঙ্গে ঐ আদিম মানব সম্প্রদায়ের দৈহিক গঠনের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এরা যদিও অর্দ্ধনর অধিবাসীদের গুহাগুলি দখল করেছিল তবুও বেশীর ভাগ এরা খোলা জায়গাতেই থাকত। সামান্য পশুচর্ম্মের আবরণ—এই ছিল এদের পরিচ্ছদ। রঙীন ঝিনুক গেঁথে হার তৈরী করে এরা গলায় পরত, হাড় বা পাথর খোদাই করে মূর্ত্তি তৈরী করত, আরও ছোটখাট কত যে যন্ত্রপাতি এরা তৈরী করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এরা আঁকতেও পারত ভাল; যদিও তাকে খুব সূক্ষ্ম শিল্পকলা বলা যায় না, তবু তার মধ্যে বাহাদুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। নিজেদের অন্ধকার গুহার দেওয়ালে, খুব সম্ভব চর্ব্বির

প্রদীপ জ্বেলে তারা নিপুণ হস্তে নানা জীবজন্তুর ছবি এঁকে রেখে গিয়েছিল। সেই ছবি দেখে আমরা তখনকার দিনের জন্তু-জানোয়ারদের যেমন চিনতে পারি, তেমনি তারা যে অনেকগুলি রঙের ব্যবহার জানত সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হই। এবং তাদের রঙের প্রচুর ব্যবহার দেখে মনে হয় তারা নিজেদের দেহে রঙ করত।

এরা শিকার করত বর্শা দিয়ে কিংবা সোজাসুজি পাথর ছুঁড়ে। গৃহপালিত পশু বিশেষ ছিল না, খুব সম্ভব দুধের ব্যবহার এরা জানত না। মাটির মূর্তি তারা ঢের তৈরী করেছে বটে কিন্তু মাটির বাসন বা অন্য কোন রান্নার সরঞ্জাম ছিল না, তাই দেখে মনে হয় সে ও বালাই বোধ হয় এদের ছিলই না। মাংস খাবার দরকার হ'লে কাঁচা কিংবা পুড়িয়ে খেত। আর একটি কথা শুনলে অনেকেই খুব খুশী হবেন, এরা ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে জানত। চাষ-বাসের খবর এদের জানা ছিল না, তবে যত দিন যেতে লাগল, পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ এবং জীবনযাত্রার প্রণালীরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হ'ল।

প্রস্তর-যুগের মানুষ

আদি মানবরা ইউরোপের গিরিকন্দর এবং বনানীর মধ্যে বসবাস শুরু করার বহু শতাব্দী পরে সেখানকার রঙ্গমঞ্চে আর এক নতুন দল প্রবেশ করলে। সে সময়টা, হিসেব মত এখন থেকে বার তের হাজার বৎসর আগে। এরা কোথা থেকে এসেছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাস এখনো নীরব। তবে এরা যে আদিমানব অধিবাসীদের চেয়ে ঢের উন্নত ছিল একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। স্পেনের যে পর্ব্বত-গুহায় এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে তারই

দেওয়ালে বা প্রস্তর-গাত্রে এরা নিজেদের চমৎকার ছবি এঁকে রেখে গেছে। তাতে করে এবং অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে আমরা তাদের সম্বন্ধে মোটামুটি যা জানতে পারি তা এই:—তারা তীর ধনুকের ব্যবহার জানত, পালখের তৈরী টুপী পরত, খুব ভাল আঁকতে পারত। লেখার পদ্ধতি ঠিক না জানলেও চিহ্নের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করার কৌশল প্রথম তারাই ব্যবহার করে—অর্থাৎ লিখন-প্রণালীর গোড়া পত্তন করে।

এই লোকগুলিকে আমরা নাম দিয়েছি প্যালিওলিথিক বা প্রস্তর যুগের মানুষ, তার কারণ এরা বেশীর ভাগ পাথরের তৈরী জিনিসই ব্যবহার করত। ক্রমে এই পাথরের জিনিসই এরা খুব ভাল করে তৈরী করতে শিখল। প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে সেগুলি শিল্প-বস্তু হয়ে উঠল। এই যুগেরই শেষ ভাগে খুব সম্ভব আমেরিকার দিকে প্রথম মানুষ ছড়িয়ে পড়ে।

বর্ত্তমান তাসমানিয়া অঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্বেও এই প্রস্তর-যুগের মানুষ দেখা গিয়েছিল। অন্যান্য মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে বুদ্ধি-বৃত্তির বা জীবনধারণের প্রণালীর কিন্তু উন্নতি বা পরিবর্ত্তন ঘটেনি—বরং যেন কিছু অবনতিই হয়েছিল। তারা তখনও পর্য্যন্ত কাঁচা মাছ ও শিকার করা কাঁচা মাংস খেয়ে থাকত, আর কোনমতে গর্ত্ত প্রভৃতিতে মাথা গুঁজে থাকত। তারাও মানুষ, আমাদের আদিম পূর্ব্বপুরুষের বংশধর, এই হিসাবে তারা আমাদের আত্মীয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে আজকেকার মানুষের আর কোন দিক দিয়েই কোন মিল নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি ও পশুপালনের সূত্রপাত

মানুষ ঠিক কি করে কৃষিকর্ম্ম প্রথম শিখলে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, যদিও এ নিয়ে বহু গবেষণা বহুদিন ধরেই চলছে। তবে মোটামুটি যা দূর বলা চলে, প্রস্তর-যুগের মানুষেরা যখন সবে ইউরোপে প্রবেশ করছে, সেই সময়ে, আফ্রিকা, ইরাণ ভারতবর্ষ প্রভৃতি এশিয়ার কোন কোন জায়গায় মানুষ মনুষ্য-সভ্যতার এই প্রধান জিনিস দুটি ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিল- একটি হ'ল কৃষিকর্ম্ম, আর একটি পশুপালন। এ ছাড়াও তারা কোন কোন দরকারী জিনিস নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে তৈরী করতে শিখছিল, যেমন মাটির বাসন, বল্কলের পরিচ্ছদ, ঝুড়ি বা ঐ জাতীয় জিনিস—এই সব।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কি ভাবে বর্তমান পরিণতির দিকে এগিয়ে এসেছে, হাজার হাজার বছর ধরে কেমন করে তারা অল্প অল্প করে জ্ঞানের দিকে এগিয়েছে, এ তথ্য আমাদের কল্পনারও অতীত। নানা কুসংস্কার ছিল হয়ত তাদের, নানা বিভীষিকা ছিল, ছিল অজ্ঞতার সহস্র অসুবিধা, বংশপরম্পরায় হাজার হাজার বৎসর ধরে নিজেদের জীবনের জন্য একটু একটু করে যে অভিজ্ঞতা তারা অর্জ্জন করেছে খুব সম্ভব তারই সাহায্যে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু সে সব হিসেব আজ আমাদের করতে যাওয়া অসম্ভব। শুধু তারা কি কি পথ ধরে এগিয়ে এসেছে তারই বিবরণ মাত্র আমরা দিতে পারি, তাও সম্পূর্ণ নয়, তার অনেকখানিই হয়ত অনুমান, অনেকখানি হয়ত মস্ত বড় একটা ফাঁকির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের কিছু অংশ, ইরাণ, আফ্রিকা ও বর্তমান ভূমধ্যসাগরের

স্থানটিকেই এই উন্নততর মানব-সম্প্রদায়ের আদি লীলাভূমি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে ততদিন কিছুই ঠিক করে বলা যাবে না, যতদিন না এই সমস্ত জায়গাগুলি বৈজ্ঞানিকরা ঠিক মত খোঁজ করবার সুযোগ পাবেন। পৃথিবীর আদিম ইতিহাস নিয়ে এ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁদের দেশে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাই হ'ল তাঁদের একমাত্র উপাদান, সুতরাং আমরা আদিমানবের যে ইতিহাস দিতে পারছি তা ইউরোপের ইতিহাস। সেখানে যখন অর্দ্ধনর প্রাণীরা বিচরণ করছিল, তখনই এই এশিয়া বা আফ্রিকার মাটীতে হয়ত মানুষ জন্ম নিয়েছে, প্রথম অবস্থা থেকে অনেকখানিই উন্নতির পথে হয়ত তারা এগিয়ে এসেছে। সে সব কথা ঠিক করে বলা কঠিন, আরও কঠিন সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত মত প্রকাশ করা। পাহাড়ের ওপরে মাটীর স্তর পড়ে পড়ে যে কালের চিহ্ন আঁকা আছে সেই হ'ল আমাদের কাল-নির্ণয়ের সর্ব্বপ্রধান উপায়—কিন্তু সে মতও যে অভ্রান্ত তারই বা প্রমাণ কি ?

চাষবাস করতে মানুষ কেমন করে শিখল এবং কবে শিখল তা বলা কঠিন। চাষবাস করতে শেখা যে এমন একটা কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার তা অনেকেই ঠিক বুঝতে পারবে না। কারণ এখন আমরা সেটিকে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছি। মাটীতে বীজ পুঁতলে শস্য হয়, সেই শস্য তুলে খেয়ে আমরা প্রাণধারণ করি—এই ব্যাপারটা যেন অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। শৈশবে আমাদের মানসিক বৃত্তি থাকে হাওয়ার মতই একটা ফাঁকা জিনিস, ক্রমে বড় হয়ে যে জ্ঞানটা আমাদের হয় সেটা সাধারণ বস্তু নয়—হাজার হাজার বৎসরের মনুষ্য-জীবনের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা যখন তাদের লাভ হয়নি, যখন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দ, মানুষের

কর্ত্তব্য, জীবন-ধারণের পদ্ধতি শিখিয়ে দেবার লোক ছিল না, তখন তাদের দেহ যতই বৃদ্ধি পাক্ না কেন, মন ত তাদের শিশুর মতই থাক্‌বে!

আমাদের মনে হয় শস্যের সংবাদটা তারা পেয়েছিল দৈবাৎ; হয়ত এমনিই গম বা যব বা ধান রাশি রাশি হয়ে থাক্‌ত। ক্রমে, হঠাৎ একদিন তারা সেগুলো সংগ্রহ করে গুঁড়িয়ে খেয়ে দেখলে; তাও হয়ত বপন করার কৌশল তখনই তারা শেখেনি। বপন করতেও শিখেছে হয়ত অমনি সহসা। তারপর কোন্ শস্য বপন করবার কোন্ সময় অর্থাৎ ঋতুজ্ঞান আয়ত্ত করতে বোধ হয় তাদের আরও বহু বৎসর সময় লেগেছে! বহু কুসংস্কার, বহু বৃথা ভয়কে জয় করে, বহু জীবনের বিনিময়ে তাদের জীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানগুলোও অর্জ্জন করতে হয়েছে।

পশুপালনের সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। প্রথমে তারা পশু বধ করত মাংস খাবার জন্য, ক্রমশ তারা একটু একটু করে বুঝতে পারলে যে ওদের কতকগুলোকে পোষা যায় এবং সুবিধামত তাদের কাজেও লাগানো যায়। পশুদুগ্ধ পানের মত অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে তারা সহজে শেখেনি তা বলাই বাহুল্য। গোরু, ষাঁড়, মোষ ইত্যাদি পুষতে শিখলেও, খাদ্য হিসাবে দুগ্ধ ব্যবহারের পদ্ধতি গ্রহণ করতে খুব সম্ভব তাদের বহুদিন সময় লেগেছে।

ধর্ম্মবিশ্বাসের সূচনা

এখন থেকে অতদিন আগেকার মানুষের মানসিক অবস্থা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন শুধু নয়, এক রকম অসম্ভব। খুব সম্ভব মানুষ প্রথমে অন্য স্তন্যপায়ী জীবের মত এক এক বংশের লোক মিলে দল পাকিয়ে বেড়াতে শেখে, সেইটেই হ'ল আদি

সামাজিক গঠনের সূত্রপাত। সে অবস্থার একটু উন্নতি হ'ল পিতামাতাকে ভয় এবং ভক্তি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বংশের বৃদ্ধ লোকেরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের শাসন করবে, তাদের কর্ত্তব্যের পথ দেখাবে, এ ব্যবস্থা মেনে নিতে কিছু দেরী হয়েছিল। তরুণেরা বৃদ্ধদের শাসন কাটিয়ে নিজেরা স্বাধীন হ'তে চাইত নিশ্চয়ই, এবং বৃদ্ধরাও তরুণদের ঈর্ষ্যার চোখে দেখত। এ নিয়ে আদিম কালে হয়ত পরস্পরকে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হবার চেষ্টাও চল্‌ত।

আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধরা শেষ পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়ে তরুণদের বশীভূত করার কৌশল অবলম্বন করে। যারা কিছুদিন আগে পৃথিবীতে এসেছে, পরবর্ত্তীদের অপেক্ষা তাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই বেশী, সেই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের জোরে ভক্তি এবং ভয় দুই-ই আদায় করা সহজ হ'ল। এবং এই ভয় থেকেই আদি ধর্ম্মবিশ্বাসের সূচনা।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে প্রাথমিক অজ্ঞতা, তা থেকে ভয় এল, কুসংস্কার এল। সেই অজ্ঞাত ব্যাপার সম্বন্ধে ভয় ও কুসংস্কারের ভিত্তির ওপর মানুষের ধর্ম্মমত গড়ে উঠল। নানা রকম ভয়—ভূতের ভয়, সাপের ভয়, অভিশাপের ভয়—প্রথম দেবতার সৃষ্টি হ'ল বোধ হয় এই সব ভয় থেকেই। কৃষিকর্ম্ম শেখবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও সূর্য্যকে যখন প্রয়োজন হ'ল তখন এরাও পেলে দেবতার আসন ; সেই উপলক্ষ্য করে এল বলির প্রথা ; বহুদিন ধরে, আর সেদিন পর্য্যন্ত, বিভিন্ন দেশে কৃষিকর্ম্ম উপলক্ষ্য করে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম বোধ হয় এক একটি বিশেষ ভূমির রক্ষক উপদেবতার তুষ্টির জন্যই নরবলি হ'ত, ক্রমে উপদেবতাই দেবতায় রূপান্তরিত হলেন। গ্রামের বৃদ্ধরা এই সকল অপ বা খাঁটি দেবতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে এই ভয় দেখিয়ে গ্রাম বা গোষ্ঠী শাসন

করতে শুরু করলেন। আরও একটু পরে এঁরা পুরোহিত বা ধর্ম্মগুরুর পদ পেলেন। জ্ঞান ও যুক্তির অভাবে মানুষের মনের যে দুর্ব্বল অবস্থা, তারই সন্ধান পেয়ে তাদের ভয় ও কুসংস্কার নিয়ে খেলা শুরু হ'ল। রাশি রাশি কুপ্রথা উঠল পুঞ্জীভূত হয়ে। সাপ ও ভূতের পূজা বহুদিন ধরে চলছিল, এ দুটি পূজা বহু প্রাচীনও বটে। গ্রহনক্ষত্রদের সঙ্গে মানুষ নিজেদের যোগ কবে আবিষ্কার করল জানি না, কিন্তু এরাও পূজা পেতে শুরু করল। এইভাবে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

যখন মনুষ্যসমাজে এই অসংখ্য উপদেবতা ও কুসংস্কারের মাত্রা এক এক দেশে অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই সেই সব দেশে এক একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সংস্কৃত ধর্ম্ম দিয়েছেন দেশকে।—কিন্তু সে কথা আরও অনেক পরে।

আদি মানব-সভ্যতার বিকাশ

একটা জিনিস আমরা সকলেই চোখে দেখি এবং অবাক হয়ে তার কারণ ভাবি। সেটা আর কিছু নয়, এক দেশের মানুষের সঙ্গে আর এক দেশের মানুষের চেহারায় বিপুল পার্থক্য। আর এই পার্থক্য থেকে পৃথিবীতে কম দুঃখ, কম অনাচার আসেনি। আমেরিকাতে আজও সেখানকার সাহেব অধিবাসীরা কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের অকারণে পুড়িয়ে মারে, গরম আলকাৎরার মধ্যে ফেলে দেয়, শহরের কোন হোটেল বা কাফিখানায় তাদের ঢুকতে দেয় না—শুধু তাদের দৈহিক গঠন এবং গায়ের রং আলাদা বলে, এই ত? এই পার্থক্য যে কি করে হ'ল—মানুষ প্রথমে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গঠন নিয়ে জন্মেছিল কিংবা পূর্ব্বে তারা একই রকমের ছিল, পরে বহু সহস্র বৎসর ঠাণ্ডা দেশে বাস করার ফলে সাহেবরা

হল' সাদা আর বিষুবরেখার ওপর বাস করে আফ্রিকার অধিবাসীরা হ'ল কালো—তা ঠিক করে বলা যায় না। সাহেবদের বিশ্বাস যে প্রথম থেকেই এই আকৃতিগত বৈষম্য তাদের মধ্যে ছিল, বোধ হয় নিজেদের সঙ্গে কাফ্রিদের আত্মীয়তা স্বীকার করতে তাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।

যাই হোক্, পৃথিবীতে সমস্ত অংশেই মানুষের চিহ্ন যে সময় থেকে পাওয়া গেল, সে সময়টা এখন থেকে প্রায় পনের হাজার বৎসর আগে। সেই সময়েই আমরা মানুষের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই। সেই সব স্বাতন্ত্র্যই নানা দেশে এবং নানা আব্‌হাওয়া ও স্থানান্তরের মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমান কালের ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী, মঙ্গোল বা নাক খাঁদা হলদে ও তামাটে রঙের মানুষ, কোঁক্‌ড়া চুল বিশিষ্ট কালো রঙের কাফ্রি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের মানুষে এসে পৌঁচেছে। হয়ত প্রথমে মানুষের জন্ম হয় একই জায়গায়, পরে আস্তে আস্তে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে, বিভিন্ন জলহাওয়ার মধ্যে গিয়ে প'ড়ে আকৃতি-প্রকৃতিতে তাদের জ্ঞাতিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কিংবা একই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মানুষ কিছু কিছু দেখা দিয়েছিল, পরে তারা কেউ কেউ স্থান বদল করেছে, অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদানে তাদের সঙ্গে কতকটা মিশে গেছে, কিন্তু সমুদ্র-পাহাড় প্রভৃতি বড় বড় অন্তরায় থাকার দরুণ, এক এক দলের মোটা অংশটা অবিকৃতই থেকে গেছে। কোন্‌টা যে ঠিক খাঁটি কথা, তা মানুষ বোধ হয় কোন দিনই ঠিক করে জানতে পারবে না, যদি বা পারে—আরও বহু বৎসরের সাধনার পরে।

এই যে মানুষের এক একটা বড় বড় সম্প্রদায় বা দল খানিকটা করে বড় জায়গা জোড়া করে বাস করতে এবং বৃদ্ধি পেতে লাগল, তারা নিজেদের প্রয়োজন-মত জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে ক্রমশ সংস্কৃত

করে নিল। মধ্য এশিয়ার যে মানব সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ইউরোপ, মিশর, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ এমন কি বেরিং প্রণালীর (তখন যোজক) পথ বেয়ে আমেরিকাতে গেল তাদের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, এলিয়ট স্মিথ তার নাম দিয়েছিলেন হেলিওলিথিক সংস্কৃতি। এরা ঘরবাড়ী মন্দির তৈরী করতে শিখলে, গ্রাম এবং মাটীর পাঁচিল দেওয়া ছোট ছোট শহরও গড়ে তুললে। মৃতদেহকে রক্ষা করার পদ্ধতি, উল্‌কি দেওয়া প্রভৃতিও এদের জানা ছিল। তাছাড়া এদের আরও কতকগুলি সংস্কার বা অভ্যাস ছিল যা কেমন করে গড়ে উঠেছিল তার কোন ইতিহাসও নেই এবং তার কোন অর্থও খুঁজে পাওয়া যায় না।

যে মানুষগুলি আমেরিকায় গিয়ে সেখানে বসবাস করতে লাগল আর ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তারা বহুদিন অবধি আদিম সংস্কৃতিহীন জীবনযাত্রাকে আঁক্‌ড়ে ধরে ছিল, কিন্তু মেক্সিকো ইউকাটান প্রভৃতি মধ্য-আমেরিকার দেশগুলিতে পরে অদ্ভুত একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে এশিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতির কিছু মিল থাকলেও অনেক দিক দিয়েই তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং পৃথক। এই সভ্যতার আমরা নাম দিয়েছি মায়া সভ্যতা। এরা বড় বড় মন্দির তৈরী করেছিল, যার সৌন্দর্য্য ও গঠনপদ্ধতি দেখলে আমরা আজকের দিনেও অবাক্ হয়ে যাই। এরা লিখতে জানত—সে লেখা শুধু দেওয়ালের গায়ে বা পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাই নয়, চামড়াকে কাগজের মত ক'রে (বর্ত্তমান পার্চ্চমেণ্ট বা দলিলের কাগজের মত) তার ওপরও লিখে রেখেছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এদের পুরোহিত বা ধর্ম্মগুরুরা যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা এদের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন থেকে ভূরি ভূরি পাই। এদের পুরোহিতরাই ছিলেন দেশের আদি শাসনকর্ত্তা এবং তাঁদের আইনও ছিল খুব

কড়া। বলিদানের প্রথাটা খুব সহজ ভাবেই এরা দেখত, জন্তু জানোয়ার পাখী মানুষ সব কিছুই বলি দিত। এদের স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্প তখন কোন্ চিন্তা থেকে গড়ে উঠেছিল তা জানি না, কিন্তু এখনকার মানুষের কাছে তা জটিল, দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয়। শঙ্কাজড়িত এমন একটা রহস্যের আভাস তার মধ্যে আছে, যার কোন অর্থই আজ আমরা খুঁজে পাই না। দুটি সাপ শেকলের মত জড়ানো—এই চিহ্নটা এরা খুব বেশী রকম ব্যবহার করত। সে চিহ্ন কিন্তু আমরা প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যে অজস্র দেখতে পাই, আজও দক্ষিণ ভারতে গেলে দ্রাবিড় সভ্যতার অন্যান্য চিহ্নের সঙ্গে সেই পাথরগুলি চারিদিকেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলে এই সর্পযুগল রীতিমত পূজা পায়। শ্রীরঙ্গম্ শহরে কাবেরীর ধারে এইরূপ কতকগুলি যুগলসর্প সাজানো আছে, ওখানকার অধিবাসীরা সেইখানেই ষষ্ঠী দেবীর পূজা দেয়।

খুব সম্ভব এই জন্যেই অনেকে অনুমান করেন যে মায়া সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের দেশের একটা সংযোগ আছে, যদিও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এ দেশীয় পণ্ডিতেরা তা স্বীকার করেন না।

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা

মানুষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে এগিয়ে গেল সব চেয়ে পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরাই। এখন থেকে আট নয় হাজার বছর আগেই বর্ত্তমান কালের তুর্কীস্থান, তাতারভূমি, আরব, মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে বড় বড় শহর, মন্দির প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। পূর্ব্বেই বলেছি যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরাই প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে তাঁদের যে-সব দেশের ইতিহাস আলোচনা করার



সুমেরিয়ানদের একটি নগর তোরণের ভগ্নাবশেষ



আসিরিয়ানদের একটি প্রাসাদ

সুযোগ মেলেনি সে সব দেশের প্রতি হয়ত কিছু অবিচার করতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতবর্ষও তাই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে মিশর ব্যাবিলন প্রভৃতি থেকে কিছু পেছিয়ে পড়েছিল। তাঁদের মতে ভারতের সভ্যতার বয়স ওদের থেকে ঢের কম, কিন্তু সম্প্রতি মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে অন্তত এখন থেকে ছয় সাত হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে দস্তুরমত একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

মেসোপটেমিয়া এখন আমরা যে দেশকে বলি, সেখানকার দুটি নদী ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ আগে এখনকার মত স যুক্ত হয়ে পারস্য সাগরের দিকে বয়ে যেতো না। দুটি নদী দুদিক থেকে এসে পারস্য সাগরে পড়ত। এই দুটি নদীর মধ্যে যে উর্ব্বর ভূখণ্ড পড়েছিল সেই স্থানটিই হ'ল সুমেরিয়ানদের দেশ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে রীতিমত সভ্যতার চিহ্ন প্রথমে এই সুমেরিয়ানদের মধ্যেই দেখা দেয়। যদিও চীন, মিশর এবং ভারতবর্ষ, এরাও দাবী করে যে এদের সভ্যতা বয়সে কারুর চেয়ে ছোট নয়। অন্তত মিশর যে সুমেরিয়ানদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পথে যাত্রা করেছিল সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ।

সুমেরিয়ানদের গায়ের রং ছিল আমাদের চেয়ে আর একটু গৌর অর্থাৎ বাদামী ধরণের। এখনকার মেসোপটেমিয়া অধিবাসীদের মতই তাদের দৈহিক গঠন ছিল। এরা ধাতুর ব্যবহার জান্‌ত, রৌদ্রপক্ক ইট দিয়ে বড় বড় দেউল তৈরী করত, মিহি মাটির ফলক (কতকটা শেলেটের মত) তৈরী করে তাতে লিখত। গোরু, ভেড়া, গাধা প্রভৃতি পশু পালন করত এবং চামড়ার ঢাল ও বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করত। এরা অনেক বড় শহর গড়ে তুলেছিল ; সেই সব শহরের অধিবাসীরা যদিও প্রত্যেকেই স্বয়ং-প্রধান ছিল, তবু মাঝে মাঝে

এদেরই মধ্যে অনেকে অন্যান্য কতকগুলি শহর জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিল।

লেখার পদ্ধতিটা কতকটা সুমেরিয়া থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল বটে কিন্তু মাটীর ওপর আঁচড় কেটে লেখবার ফলে তার অনেক কিছুই আজ নষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র মিশরের লেখাটা এতদিন পরেও কিছু কিছু উদ্ধার করা গেছে তার কারণ ওরা দেওয়ালের গায়ে বা কাগজ জাতীয় বস্তুর ওপর রং দিয়ে লিখত। এই লেখার সম্বন্ধে একটা বলবার কথা আছে এই যে, আমরা এখন লেখা বলতে যে ব্যাপারটি বুঝি, তখন সে সব কিছুই ছিল না। অর্থাৎ বর্ণমালার ব্যবহার ছিল না। প্রথম মানুষের জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে লেখার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল আপনা থেকেই, সে কথা আমরা আদিমানবের ছবি আঁকবার প্রয়াস থেকেই বুঝতে পারি। শিকার বা লড়াইয়ের ঘটনা ছবিতে আঁকাটা লিপিবদ্ধ করারই চেষ্টা মাত্র। এই ভাবেই চলছিল, পরে সুমেরিয়ানদের সময়ে আর একটু উন্নতি হ'ল। সম্পূর্ণ ছবিটা না এঁকে ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করাই বোধহয় বর্ণমালার প্রথম আভাস। যেমন ধর ঘণ্টাকর্ণ নাম, একটা ঘণ্টা আর একটা কান এঁকে যদি নামটা বোঝানো যায় ত মন্দ কি ? অনেক ছেলেদের মাসিকে এই রকম ধাঁধাঁ দিয়ে এখনও চিঠি পড়ানো হয়। তারপর মানুষ—মানুষও সবটা আঁকবার দরকার রইল না, এখন আমরা বসুধারা দেওয়ার আগে যেমন দেওয়ালের গায়ে সিঁদূর দিয়ে মূর্ত্তি আঁকি, তেমনি একটা লাইনের ওপর আড়দিকে আর ছুটো লাইন টেনে দিয়ে তখন মানুষ বোঝানো হ'ত।

এইভাবে চলতে চলতে মিশরের লোকেরা এই বিজ্ঞানটিকে আর একটু উন্নত করলে। তারা এক একটা বস্তুর বদলে এক একটা চিহ্ন ব্যবহার করতে লাগল। ক্রমশ যেমন হাজার হাজার

বছর কাটতে লাগল, মানুষও সেই লিখনপদ্ধতির ওপরই নির্ভর করে জিনিসটাকে আরও সহজ করে নিলে। বস্তু থেকে শব্দ এল, অর্থাৎ একটা শব্দের বদলে চিহ্ন এবং ক্রমে তা থেকে অক্ষর বা বর্ণমালার সৃষ্টি হ'ল। শব্দের বদলে চিহ্ন দিয়ে লেখবার পদ্ধতি আজও আমাদের প্রতিবেশী চীনাভাইদের দেশে প্রচলিত আছে। বর্ণমালার মত সহজ ব্যাপার নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি।

লেখার ইতিহাস আমাদের মোটামুটি কতকটা জানা আছে বটে কিন্তু ভাষার ইতিবৃত্ত একেবারেই নীরব। যতদূর অনুমান হয় প্রথম আমরা অপর জন্তুদের মত শুধু একটা শব্দ মাত্রই করতে পারতুম, কোন কথা বলতে পারতুম না। বক্তব্যটা ইঙ্গিতেই বোঝাতে হ'ত। তারপর ঢুটো একটা নাম তৈরী হ'ল অর্থাৎ বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ শব্দ করে বোঝানো হ'ত; তারপর অল্প অল্প করে শব্দের পুঁজি বাড়তে লাগল। তাতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি কারণ এই সেদিন পর্য্যন্ত অধিকাংশ ভাষাতেই মোট প্রচলিত শব্দ বা words-এর সংখ্যা এক হাজারের কম ছিল; এখনও প্রায় সব দেশের পল্লীগ্রামে শব্দের সংখ্যা সহস্রর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ-ত গেল সাধারণ শব্দ বা 'কথা'র ইতিহাস, কিন্তু বিভিন্ন ভাষা কি করে সৃষ্টি হ'ল? ইতিহাস এ প্রশ্নের উত্তরে মাথা চুলকোয়, জবাব দিতে পারে না, ঢোঁক গিলে বলে শুধু যে 'বোধ হয় গোড়া থেকেই মানুষের ঢুটো তিনটে প্রধান আড্ডায় ঢুটো তিনটে মূল ভাষার জন্ম হয়, তারপর তাদেরই সন্তান-সন্ততি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একই ভাষা থেকে পৃথিবীর এত রকমের ভাষা সৃষ্টি হ'তে পারে না। তবে কতকগুলো করে ভাষার পরস্পরের সঙ্গে কিছু কিছু মিল আছে। সেই থেকেই মূল ঢুটো-তিনটে বিভাগ আমরা অনুমান করে নিয়েছি।'

লেখবার কৌশল আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি ক্ষমতাই

মানুষের আয়ত্ত হ'ল। আইন, ধর্ম্মানুশাসন, চুক্তি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করার সুবিধা হওয়ায় জীবনযাত্রা হয়ে উঠল ঢের সহজ। এমন কি ছোট ছোট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজ্যগুলি যে প্রসারিত হ'তে লাগল তার জন্যও এই বিজ্ঞানটিই দায়ী। কারণ রাজা বা ধর্ম্মগুরুর আদেশ তাঁদের স্বাক্ষরসুদ্ধ বহন করে দেশ-দেশান্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল। সুমেরিয়াতে শীলমোহর করার চলন হওয়ায় মাটীর ফলকে মোহর দিয়ে সেই ফলক শুকিয়ে নিয়ে সর্ত্ত আদেশ প্রভৃতি বলবৎ রাখা হ'ত। শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালের ইতিহাসও আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠল। মাটীর ফলক পুড়িয়ে টালির মত করে নিয়ে কোন কোন দেশে লিখিত বস্তুকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। এই পদ্ধতি মেসোপটেমিয়ায় দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত চলেছিল।

এই সব ইতিহাস থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। সুমেরিয়া ও মিশরে সোনা, তামা, রূপা, ব্রোঞ্জ এবং অল্প পরিমাণে লোহার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে পৃথিবীর এই অংশের ছোট ছোট নাগরিক রাজ্যগুলির জীবনযাত্রা প্রায় একই রকমের ছিল। ধর্ম্মগুরুই ছিলেন প্রধান পুরুষ, তিনি তিথি-নক্ষত্রের বিধান দিতেন, চাষবাসের পরামর্শ দিতেন, স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতেন, ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন এবং আইন প্রণয়ন করতেন। ক্রমে রাজা বা শাসকেরও প্রয়োজন হ'ল। কিন্তু এদের রাজা থাক্ বা না থাক্ বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। চাষবাস করে খেত সকলেই, খাদ্যও ছিল প্রচুর। টাকা ছিল না, টাকার দরকারও ছিল না। সামান্য যেটুকু মানুষের প্রয়োজন তা বিনিময়েই চলত, আটার বদলে দাল, দালের বদলে কাপড়—এইভাবে। প্রয়োজনের তাগিদেই কর্ম্মজীবন চলত তাদের এবং সে কর্ম্মের পথে কোথাও জটিলতা ছিল না।

সুমেরিয়াতে বহুদিন পর্য্যন্ত পুরোহিতই ছিলেন একমাত্র শাসক কিন্তু মিশরের রাজা বা ফারাও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। ক্রমে মিশরের জনসাধারণ তাঁদের ঈশ্বর-প্রেরিত লোক ব'লে মেনে নিলে। এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের রাজ্যটুকু নিয়েই নির্ব্বিবাদে বাস করতেন। কিন্তু কেউ কেউ রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-যাত্রাও করেছিলেন। কেউ বা আবার মর্ত্ত্য-ভূমে নিজেদের অমর করে রাখার জন্য বড় বড় পাহাড়ের মত সমাধিমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। এইগুলিই মিশরের বিখ্যাত পিরামিড—হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের আশ্চর্য্য পরিশ্রমের সাক্ষ্য-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

আদিম যাযাবর জাতি

সুমেরিয়া, মিশর ছাড়া কাছাকাছির মধ্যে আরও অনেকগুলি রাজ্য ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল। যেখানে জলের প্রাচুর্য্য, সুবিধামত শস্য পাবার সম্ভাবনা, সেখানেই তখনকার মানুষ জনপদ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তখন এইসব উর্ব্বর ভূমিখণ্ডগুলির বাইরেও কতক মানুষ ছিল যাদের ঘরবাড়ীর ঠিক ছিল না, সুবিধামত দেশ যাদের বদ্‌লাত। যখন যেখানে জল আর খাদ্যের সুবিধা হ'ত তারা সেইখানেই বাস করত, আবার যখন শিকার করবার মত পশুর অভাব হ'ত তখন সেদেশ ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যেত। ফলে এরা একদিকে যেমন চাষবাসের মত কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারত না, তেমনি অপরদিকে নিত্য ঘুরে বেড়ানোর জন্য যথেষ্ট কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ আরব ও মধ্য এশিয়ার এই সব যাযাবর জাতিরা, যারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছিল তাদের সুখের ঘরে হানা দিতে শুরু করলে। সুমেরিয়া এ্যাসিরিয়া প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত

রাজ্যগুলি এরা দখল করে বসবাস করতে করতে একদিন তাদের সঙ্গে মিশেও গেল। মিশরও এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি। মিশরের ফারাওদের রাজ্যচ্যুত করে এরা সেখানে বহুদিন রাজত্ব করেছিল, যদিও মিশর কোনদিন এদের আত্মীয় করে নিতে পারেনি।

ভারত বা চীনও এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। সুমেরিয়া বা মিশরে যখন প্রথম ছোট ছোট নাগরিক রাজত্ব গড়ে উঠছিল তখন ভারতবর্ষ এবং চীনেও আর একদল লোক জনপদ বা শহর গড়ে তুলছিল। মধ্য এশিয়ার যাযাবররা পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে সেখানেও একদিন উপস্থিত হ'ল। কালক্রমে তারাও আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নূতন একটা সংস্কৃতি গড়ে তুললে। ভারতবর্ষের ভুটিয়া ল্যাপ্‌চা প্রভৃতিদের পূর্ব্বপুরুষ এবং দ্রবিড়রাও এই শ্রেণীর আগন্তুক। কিন্তু ভারতীয় দ্রবিড়রা তাদের সমসাময়িক প্রতিবেশীদের চেয়ে ঢের বেশী সভ্য ছিল। তাদের দুর্গ, তাদের রাস্তাঘাট, তাদের পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতির কথা শুনলে অন্তত তাই মনে হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যে মোহেন্-জো-দড়ো নামক শহরটির পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, সেই সময়কার নাগরিক সভ্যতার এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। অথচ সে কতদিন আগে!

প্রথম রীতিমত সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা করে এই যাযাবররাই। এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আরবদেশের এক যাযাবর দল, সার্গন বলে এক দলপতির নেতৃত্বে ভূমধ্যসাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ব্যাবিলনের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মূলেও এমনি একদল যাযাবর জাতিই ছিল। পশ্চিম এশিয়ার এই যাযাবর জাতি, যাদের আমরা নাম দিয়েছি 'সেমিটিক', এরা শুধু বড় বড় সাম্রাজ্য তৈরী করেই

ক্ষান্ত হ'ল না, এরা সমুদ্রেও পাড়ি দিতে শুরু করল। মানুষের জলযাত্রার চেষ্টা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলেছে, মানুষ যখন গুহাবাসী, বোধ হয় তখন থেকেই। প্রথম তা ছিল ভেলা, তারপর হ'ল নৌকা, তারপর জাহাজ। এখন থেকে নয় হাজার বছর আগেও জাহাজের অস্তিত্ব ছিল; হয়ত সে জাহাজ এখনকার জাহাজের তুলনায় বড় নৌকা বললেই চলে, কিন্তু তবু জাহাজ। সে সব জাহাজ বাণিজ্যের জন্যই প্রথম ব্যবহার হ'ত কিন্তু সেমিটিকরাই প্রথম জাহাজে চড়ে দেশজয় বা উপনিবেশ-স্থাপন করে। সমুদ্রের কূলে কূলে বন্দর গড়ে উঠল, গড়ে উঠল ছোট ছোট রাজত্ব। ভূমধ্যসাগরের তীরেই এদের প্রতিপত্তি বেশী ছিল। এদের বলা হ'ত ফিনিসিয়ান। এই ফিনিসিয়ানরা যে সামান্য লোক নয়, তা আমরা ক্রমশ জানতে পারব। এদের প্রতিষ্ঠিত কার্থেজ নগরী একদিন প্রতাপ ও প্রতিপত্তিতে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল।

অবশ্য সেমিটিক বা ফিনিসিয়ানরাই শুধু ভূমধ্যসাগরের কূলে নগর বা রাজত্ব স্থাপন করেনি। আরও কতকগুলি লোক বিভিন্ন দ্বীপ ও শহরে নতুন জনপদ গড়ে তুলেছিল, এদের আমরা জানি গ্রীক বলেই কিন্তু প্রথম এই সব স্থানে যারা বসবাস শুরু করে, আমরা পরে জেনেছি তারা গ্রীক নয়। এই সব জায়গার মধ্যে ট্রয় শহর বা ক্রীট দ্বীপ এককালে খুবই খ্যাতিলাভ করেছিল। ক্রীট দ্বীপের রাজধানী নোসস্ শহরের যে ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি মাটীর তলা থেকে বেরিয়েছে তা ভাল করে দেখলে আমরা বুঝতে পারি এক কালে এরা প্রভূত ক্ষমতা লাভ করেছিল এবং শিল্পে বাণিজ্যে বা কৃষিতেও খুব উন্নত ছিল। এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে এদের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করত। ক্রীটদ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশরের রীতিমত বাণিজ্য চলত।

এদের আচার-ব্যবহারও সভ্যজাতির মতই ছিল। নোসস্-এর বিপুল প্রাসাদের দিকে এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। কিন্তু কি ক'রে যে অতবড় রাজধানী ধূলিসাৎ হ'ল তা এখনও কেউই নির্ণয় করতে পারেনি, হয়ত প্রবল ভূমিকম্পে তা একদিন খসে পড়েছিল, নয়ত গ্রীকরা এসে পরবর্ত্তী যুগে লুটপাট করে ভেঙেচুরে আগুন জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল !—কিংবা দুটোই !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারত

এধারে যখন এই সব রাজ্যগুলি বিচিত্র ইতিহাসের উপাদান রচনা করছে তখন প্রকৃতির নিজহাতে বেড়া দেওয়া ভারতবর্ষে আরও বিচিত্র এক ইতিহাস রচিত হচ্ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ইতিহাসের অনেকখানিই আজ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তার প্রথম কারণ যে তখনকার লোকেরা লিখিত ইতিহাস রেখে যাওয়ার সার্থকতা কী বুঝত না। তা ছাড়া লেখার অভ্যাসটাই ছিল কম। এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রচিত মহাকাব্যগুলিও বহুদিন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নি, একজনের স্মৃতি থেকে আর একজনের স্মৃতিতে বাহিত হয়ে এসেছে। আর সেই কারণেই খুব সম্ভব তা অবিকৃত থাকেনি, কারণ সব মানুষের স্মৃতিশক্তি সমান নয়!

লেখা ছাড়াও অন্য যে সব জিনিস থেকে আমরা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের সন্ধান পাই, তা হচ্ছে পুরোনো ঘর-বাড়ী, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বা পুঁথি বা পুরোনো মন্দির—এই সব। কিন্তু ভারতবর্ষ যদিও প্রাকৃতিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চারিদিকে, তবু এতবার বাইরের লোক এখানে এসেছে এবং প্রতিবারই নতুন দল পুরাতন সংস্কৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত ভেঙেচুরে নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছে যে, সে সব চিহ্ন কিছু থাকা সম্ভব নয়। এসেছে দ্রবিড়দের পূর্ব্বপুরুষরা, এসেছে আর্য্যরা, মোঙ্গলরা এসেছে পূর্ব্ব-উত্তরের পথ বেয়ে, উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ অতিক্রম করে শক, হূণ, পাঠান, মুঘল বারবার এসেছে। এই স্বর্ণপ্রসূ স্বপ্নরাজ্যটিকে বারবার এদের লুণ্ঠনের বস্তু হ'তে হয়েছে—সুতরাং ইতিহাসে

ধারাবাহিক চিহ্ন পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র বুদ্ধের সময় থেকে অর্থাৎ বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে কতকটা ইতিহাস আমরা পাই। তার আগেকার ইতিহাসের জন্য আমাদের পুরাণ বা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়, কিন্তু তার কতটা কাব্য আর কতটা ইতিহাস তা ঠিক করে বলা কঠিন। অথচ এই প্রাচীন সংস্কৃতিশীল জাতির ইতিহাস যে পৃথিবীর মধ্যে একটা গৌরবময় ইতিহাস ছিল তাতে ত সন্দেহ নেই!

মোহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নামক পশ্চিম সীমান্তের দুটি বহু সহস্র বৎসর আগেকার নগর মাটীর নীচে থেকে বেরোবার পর অবশ্য প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু আরও কিছুদিন না গেলে কিংবা কোন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের প্রাণান্ত চেষ্টা না হ'লে সত্যকারের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব। এই শহর ঠিক কারা করেছিল, কারা এখানে বাস করত, তা এখনও কিছুই ঠিক করে জানা যায়নি।

যাই হোক্—এখন আমরা মোটামুটি ভারতের ইতিহাস যা খাড়া করেছি তাতে করে জানতে পারি যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি, তা প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে, দ্রবিড় ও অপেক্ষাকৃত নবাগত যাযাবর দল, যাদের আমরা নাম দিয়েছি আর্য্য, এই দুই দলের মিলিত সংস্কৃতি। দ্রবিড়রাও তাদের ধরণে যথেষ্ট উন্নত ছিল, আর্য্যরা এসে তাদের আচার-ব্যবহার কতক গ্রহণ করলে, কতক নিজেদের প্রাচীন সংস্কার রক্ষা করলে এবং দুটো মিলিয়ে কতকগুলো সংস্কার তৈরী করলে। এরা প্রথমে অগ্নি, সূর্য্য, মেঘ, বাতাস প্রভৃতি আমাদের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে দেবতার আসন দিয়েছিল, এবং তাদের প্রথম সরল বিশ্বাস ও ভক্তি থেকে এই সব দেবতাদের উদ্দেশে যে স্তব-গান

উচ্চারিত হয়েছিল তাই হ'ল বেদমন্ত্র। আমাদের বিশ্বাস এই বেদই পৃথিবীর প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ।

ভারতবর্ষে খাদ্য ছিল চিরদিনই প্রচুর, জীবনধারণের যা প্রধান সমস্যা, তা ভারতবাসীর কোনদিনই ছিল না। সুতরাং এখানে বিদ্যা বা জ্ঞান-চর্চ্চার সুযোগ ছিল খুব বেশী। জ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই ভারত এগিয়ে গেছে দ্রুত। এখানকার জীবনযাত্রাও ছিল অনাড়ম্বর। একদল লোক শুধু হোম, পূজা ও জ্ঞানচর্চ্চা নিয়েই থাকতেন, তাঁরাই পরে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। এঁদের বাস ছিল সামান্য পর্ণকুটীরে, বনের মধ্যে নিবিড় শান্তিতে ঘেরা ছোট ছোট কুটীরে অতি সামান্য খাদ্য খেয়ে এঁরা দিনরাত পরের কল্যাণ চিন্তা করতেন। তাই দেশের অন্যান্য লোকেরা ঐশ্বর্য্যে বা ক্ষমতায় যতই বড় হোক্ না কেন, এঁদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করত না, এঁদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত। নৃপতির হৈমমুকুট অতি দীন ব্রাহ্মণের পদতলেও অবনত হ'ত।

ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য লোকদের মধ্যে যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা ক্ষত্রিয়, কৃষি ও বাণিজ্য যাদের জীবিকা ছিল তারা বৈশ্য এবং যারা দাসত্ব করত তারা শূদ্র নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি যে ভারতে খাদ্য ছিল প্রচুর সুতরাং লোকের কাজ ছিল কম। ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চ্চা নিয়ে থাকতেন, বৈশ্যরাও নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকত কিন্তু ক্ষত্রিয়দের কোন কাজই ছিল না। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে সামান্য কারণে মারামারি করাটা এঁদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিপুল ভারতের ছোট ছোট অসংখ্য রাজা অনবরতই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতেন। ক্রমশ সেই বিবাদ এমন মজ্জাগত হয়ে গেল যে বাইরে থেকে যখন কোন প্রবল শত্রু আসত তখন এঁরা আত্মরক্ষার জন্যও মিলিত হ'তে পারতেন না। তারই ফলে ভারতবর্ষকে বার বার বহিঃশত্রুর পদানত হ'তে হয়েছে।

খৃষ্টজন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল তার কতকটা আভাস আমরা পাই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। এই থেকেই আমরা যেমন ঐ ছোট ছোট যুদ্ধবিগ্রহের অসংখ্য বিবরণ পাই, তেমনি এও জানতে পারি যে তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রতিবেশী ছোট ছোট রাজাদের পরাস্ত করে রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট উপাধিও পেয়েছিলেন। সগর, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সম্রাটদের রাজত্বের সীমা ভারতের বাইরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমিত হয়।

মিশর, ব্যাবিলোন প্রভৃতি প্রাচীন সাম্রাজ্য

মানুষের ইতিহাসে এই কথাটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় সত্য। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, খৃষ্ট-জন্মের দু-তিন হাজার বছর আগে, অর্থাৎ যখন থেকে আমরা মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস পাচ্ছি তখন থেকেই দেখছি যে প্রত্যেক দেশেই এই সত্যটা সবচেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে। অনবরত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করছে। কখনও এপক্ষ জিতছে কখনও বা ওপক্ষ। বোধ করি সমস্ত রকম পাশবিক বৃত্তির মধ্যে হিংসাটাই প্রবল।

তখনকার ইতিহাস পৃথিবীর যে ভূখণ্ডটুকু নিয়ে—মিশর ও পশ্চিম এশিয়া—সেখানেও সেই অভিনয়ই চল্‌ছে। মিশরে যে সেমিটিক যাযাবর দল গিয়ে রাজত্ব করছিল, কিছুদিন পরে মিশরের লোক তাদের আর সহ্য করতে না পেরে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করলে এবং সে দলকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করে দিলে। তারপর যাঁরা মিশরের ফারাও বা সম্রাট হলেন, তাঁরা ক্রমশ সেনাদল বৃদ্ধি করে সাম্রাজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। ফারাও তৃতীয় টোটেসিস্ ও তৃতীয় আমেনোফিসের রাজত্বকালে ওধারে বর্ত্তমান সাহারার প্রান্ত

এবং এধারে মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেতিসের তীর পর্য্যন্ত মিশরের শক্তি বিস্তৃত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে মেসোপটেমিয়াও সহজে ছাড়েনি, ফলে দুই দেশের মধ্যে বহুদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছিল। ব্যাবিলোনের শক্তি কম ছিল না, যদিও প্রথম দিকে মিশরই জয়ী হয়েছিল।

মিশর দীর্ঘকাল ধরে তার প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিল বটে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে রাখতে পারেনি। সিরিয়ার লোকেরা, আসিরিয়ান্‌রা, ইথিওপিয়া বা বর্ত্তমান আবিসিনিয়ার লোকেরা মধ্যে মধ্যে মিশরের খানিকটা জয় করেছে, কিছুকাল ধরে রাজত্ব করেছে, আবার হয়ত অন্যের কাছে পরাজিত হয়েছে। আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনেরও ঠিক এই অবস্থা, আজ একজন প্রধান হচ্ছে, কাল আর একজন। ইতিমধ্যে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজসরঞ্জামেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিল। আসিরিয়ান্‌রা লৌহ-অস্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল ; ঘোড়ার উপকারিতাও ইতিমধ্যে সকলেই অনুভব করতে পেরেছিল, ফলে এই সময়ে যা কিছু যুদ্ধ হচ্ছিল, সমস্তই অশ্ববাহিত রথে চেপে।

ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতা, তার ঐশ্বর্য্যের ও নাগরিক সভ্যতার নানা কাহিনী, আসিরিয়ানদের (হয়ত হিন্দুপুরাণে এদেরই অসুর জাতি এবং এদের আচার-ব্যবহারকেই আসুরিক প্রথা বলে উল্লেখ করেছে) বীর্য্য ও যুদ্ধ-কৌশলের বিবরণ এবং মিশরবাসীদের সম্বন্ধে হাজার হাজার গল্প সর্ব্বত্রই শোনা যায়। এদের ইতিহাসও খুব সমৃদ্ধ কিন্তু সে সব কথা এখানে বিস্তৃত করে বলবার অবসর নেই। তবে এইটুকু এখানে উল্লেখ করা দরকার যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে বা বীর্য্যবত্তায় যতই কেননা উন্নত হোক্ এরা তখনও পুরোহিত-শাসিত হয়েই ছিল। এক এক দেবতার বিরাট মন্দিরেই প্রকৃতপক্ষে এক একটা রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হ'ত। রাজা যুদ্ধ করতেন, রাজত্ব

করতেন, সবই করতেন বটে, কিন্তু পুরোহিতদের আদেশই ছিল সর্ব্বশক্তিমান্—সে আদেশ অমান্য করবার সাহস রাজা প্রজা কারুরই ছিল না। যে রাজা এই সব পুরোহিতদের হাত করতে পারতেন তাঁরই রাজত্ব নিরাপদ হ'ত। অনেক সময় এই সব পুরোহিতরা নিজেদের ইচ্ছাকে দৈবাদেশ ব'লেও জারী করতেন।

এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দুধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল থেকে একটু একটু করে আপনিই গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু পশ্চিম বা মধ্য এশিয়া কিংবা মিশরের মত মন্দিরকে কেন্দ্র করে নয়। বেদ-উপনিষদের যুগে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ঈশ্বরই ছিলেন উপাস্য। ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি মানুষের অত্যাবশ্যক প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে দেবতার আসন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এদের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'তে বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'তে বহুদিন সময় লেগেছিল। হিন্দু নৃপতিরা ব্রাহ্মণ ঋষির কাছে মাথা অবনত করতেন, রাজকার্য্যে তাঁদের পরামর্শই শিরোধার্য্য করতেন বটে, কিন্তু সে শ্রদ্ধায়—ভয়ে নয়। সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁদের প্রভূত জ্ঞানের অংশ দেবেন এই আশাতেই সকলে তাঁদের উপদেশ শুনতে যেত। ব্রাহ্মণরাও মিশরীয় বা আসুর পুরোহিতদের মত বিশাল মন্দিরে সর্ব্বপ্রকার বিলাসের মধ্যে বাস করে নিজেদের ইহলৌকিক ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লোলুপ ছিলেন না, কুটীরই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

প্রাচীন চীন

ভারতবর্ষ মিশর ব্যাবিলোন ও আসিরিয়া যখন এম্নি ভাবে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সত্ত্বেও, আরও একটি দেশ ধীরে ধীরে প্রাচীন মানবসভ্যতার লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। সে হ'ল চীন; হোয়াং-হো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীর দুইদিক জুড়ে কতদিন ধরে যে এখানে জনপদ গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আজও সংগ্রহ করা যায়নি। তবে হোনান্ ও মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে যে সব বস্তু বার করেছেন তাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে প্রস্তরযুগেও এখানে বহু লোক বাস করত এবং তখনকার দিনে যতটুকু সভ্যতা ছিল, তা থেকে এরা বঞ্চিত হয়নি। তাদের দৈহিক গঠন এখানকার উত্তর চীনের অধিবাসীদের মতই ছিল, তারা গ্রাম গঠন করে বাস করত এবং শূকর প্রভৃতি পশু পালন করত। পাথরের নানারকম অস্ত্র ছিল। তখনকার দিনের অন্যান্য মানব-সভ্যতার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না, কারণ পথ ছিল দুর্গম। সুতরাং বহুদিন পর্য্যন্ত চীনের লোকেরা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেনি।

আগেই বলেছি যে চীনের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। অনেকখানিই অনুমান করে নিতে হয় আমাদের। যতদূর মনে হয়, যদিও উত্তর চীনে বা টেরিম উপত্যকাতেই চীনের প্রথম মানব-বসতির চিহ্ন পাই, দক্ষিণ চীনেও মানুষ থাক্‌ত আর তারাও ধীরে ধীরে সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হয়ত তাদের সঙ্গে ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশের লোকেদেরও কিছু সম্পর্ক ছিল।

চীনের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক বেষ্টনী থাকার দরুণ বাইরের আক্রমণ বিশেষ তাকে সহ্য করতে হয়নি, কিছু কিছু যা ঐ শ্রেণীর বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায় প্রাচীন পুঁথি থেকে, তা উরাল পর্ব্বতের দিক থেকেই এসেছিল। কিন্তু তখনকার চীনের অধিবাসীরা তাদের আক্রমণ রোধ করতে পেরেছিল বলেই

আমাদের বিশ্বাস। এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে জন পাঁচেক খুব শক্তিশালী সম্রাটের কথা শোনা যায়। তাঁদের কার্য্যকলাপ অলৌকিক বললেও চলে। এর পরে এক একটি বংশ বহুদিন ধরে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ বিদ্রোহদমন প্রভৃতি নিয়েই থাকতে হ'ত। সম্রাটের অধীনে ছোট ছোট রাজ্য বিস্তর ছিল, তারা আপোষে ঝগড়া-বিবাদ ত করতই, তাদের শাসনে রাখা সম্রাটের পক্ষেও কঠিন ছিল। এই সব সম্রাট-বংশের মধ্যে শাং ও চৌ-বংশের নামডাকই খুব বেশী। খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭৫০ থেকে ২৫০ অব্দ পর্য্যন্ত এঁরা রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের রাজত্বকালের যে সব ছোটখাট জিনিস আজও পাওয়া যায় তা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে এঁদের দেশের সংস্কৃতি সে সময়ে খুব উচ্চ স্তরে পৌঁচেছিল।

কিন্তু এই যে সব সম্রাট, গোড়ার দিকে এঁরা কতকটা নামেই সম্রাট ছিলেন। ওদের ভাষায় সম্রাট হলেন ঈশ্বরের পুত্র—সেই হিসেবে সকলের ঊর্দ্ধে তাঁর স্থান। ছোট ছোট রাজা ছিল অসংখ্য, শোনা যায় খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বা ঐ রকম সময়ে চীনে অন্তত ছয় হাজার ছোট ছোট রাজ্য এবং গোটা দশ-বারো ছোট সাম্রাজ্য ছিল! চৌ-বংশের সম্রাটেরা এদের কখনই পূরোপুরি রকম বশে আনতে পারেন নি। অহরহ এই সব ছোটখাট রাজ্যগুলি অন্তর্বিপ্লবে ব্যস্ত থাক্‌ত, কখনও একটা রাজ্য একটু মাথা তুলল, কখনও হয়ত আর একটা। কিন্তু চৌ-বংশের পতনের পর টিসিন-বংশ তাদের ধর্ম্মগুরু বা ঈশ্বরপুত্রের পদটি বাহুবলে দখল করলেন এবং এর পর থেকে তাঁরাই একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে গণ্য হলেন।

টিসিন-বংশের রাজাদের শাসন শাং বা চৌ-বংশের চেয়ে ঢের বেশী কড়া ছিল, আর তাঁরা চীনকে অনেকটা অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করতেও পেরেছিলেন। এই বংশেরই শি-হোয়াং-টি সমগ্র

চীনকে পদানত করেন এবং উত্তর-পূর্ব্ব দেশ থেকে আগত হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য বিখ্যাত চীনের প্রাচীর গাঁথার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বংশেরও অধঃপতন হয়—অবশেষে হান্‌-বংশ সম্রাটের পদবী ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। হান্‌-বংশীয় সম্রাটরা চীনের সীমানা বিস্তৃত করেন, হূণেদের দমন করেন এবং পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে পশ্চিম এশিয়াব সঙ্গে চীনের বাণিজ্য-সূত্র স্থাপিত করেন।

পশ্চিম এশিয়ার নূতন উৎপাত

এখন থেকে চার হাজার বৎসর আগে একদল নতুন মানুষ রঙ্গভূমে দেখা দিল। পশ্চিম এশিয়ার নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে এসে পড়ল যাযাবর দস্যুরূপেই। লুট-তরাজ করে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে, সীমান্তের শহর দখল করে এরা একেবারে উদ্বাস্ত করে তুলল। কোন কোন দেশের লোকেরা পালিয়ে মিশরে গিয়ে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মিশরের তাতে ঘোরতর আপত্তি দেখা গেল। কেউ কেউ আবার জাহাজে করে ইটালীর জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে লাগল, কেউ বা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে নতুন নগর গড়ে তুলল।

উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যখন যাযাবররা এসে এশিয়ামাইনর তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশ দখল করছে তখনও কিন্তু মিশর ও মেসোপটেমিয়া বিশেষ ব্যস্ত হয়নি। তখনও তারা নিরাপদ। তারা নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ বিলাস ও সুখ ভোগ করছে। বড় বড় শহরের বড় বড় প্রাসাদের মধ্যে তাদের বাস, হীরা-জহরৎ স্বর্ণ রৌপ্য তাদের প্রচুর। উৎসব আড়ম্বরের অভাব নেই, নীল নদ ও ইউফ্রেতিসের বুকে নৌকা-

বিলাস এই ছিল তাদের সময় কাটাবার অবলম্বন। টাকা ছিল না বটে, অধিকাংশ জিনিসই বিনিময়ে লেন-দেন হ'ত কিন্তু সোনা-রূপোর তাল দিয়ে জিনিস খরিদ করা চলত। রেশমের ব্যবহার জানত না ওরা, তবে সূতি ও পশমের খুব সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত হ'ত। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর প্রচলন ছিল, এবং গৃহস্বামী মারা গেলে অনেক সময়ে তাঁর স্ত্রী ও জনকতক দাস-দাসী সুদ্ধ তাঁকে কবর দেওয়া হ'ত—অর্থাৎ যাতে পরলোকে গিয়েও বিন্দুমাত্র অসুবিধায় না পড়তে হয়। আবার কোন কোন লোক ছোট ছোট নকল ঘরবাড়ী, কাঠের দাস-দাসী তৈরী করিয়ে কিছু কিছু আসবাবপত্র সুদ্ধ কবরে দিত। এই সব কবর থেকেই আমরা তখনকার দিনের জীবনযাত্রার কথা বেশ একটা মোটামুটি রকম ধারণা করতে পারি। অবশ্য এ ছাড়াও তখনকার দিনের দপ্তরখানার কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ, কবিতা, গল্প এবং বিরাট বিরাট সমাধি-মন্দির এবং মন্দির প্রভৃতি থেকে তখনকার দিনের ইতিহাসের যথেষ্ট খোরাক পাই।

প্রাচীন আর্য্যজাতি

যখন পশ্চিম এশিয়া ও মিশর প্রভৃতি ভূখণ্ড নিজেদের যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত, তখন মধ্য-এশিয়া থেকে মধ্য-ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে আর একদল যাযাবর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাদের সঙ্গে এই সব প্রাচীন সভ্যজাতিদের আকৃতি এবং প্রকৃতিতে অনেকখানিই তফাৎ ছিল। এদের বর্ণ ছিল গৌর, চক্ষু নীল এবং দেহ ছিল দীর্ঘ। এরা বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত, এক এক দলে মুষ্টিমেয় লোক, মধ্যে অসংখ্য যোজনের ব্যবধান হয়ত থাকত দু'দলের মধ্যে কিন্তু একটি ঐক্যের বন্ধন এদের মধ্যে ছিল, সে হচ্ছে এদের ভাষার। কথ্য ভাষায় হয়ত কিছু তফাৎ ছিল কিন্তু মিলও

ছিল অনেকখানি। বনে জঙ্গলেই এরা প্রধানত ঘুরে বেড়াত, পশু-শিকারই ছিল প্রধান জীবিকা, কিন্তু চাষবাসও কিছু কিছু জানত, যদিও এক জমি বার বার চষবার জন্য এরা এক জায়গায় বসে থাকত না কখনই, কাঠের গরুর-গাড়ীতে মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে এক বন থেকে বনান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

পুরোহিত বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে এদের জীবন-যাত্রা চলত না। দলপতি বা সর্দারই ছিলেন এদের এক-একটি দলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই এদের নিজস্ব থাকত না। বাকী যা কিছু, পশুপাল বা শস্যসম্ভার, সবই থাকত দলপতির কাছে জমা, তিনিই সকলের প্রয়োজন মত সব সরবরাহ করতেন। যখন যেখানে এরা সাময়িকভাবে বিশ্রাম করত তখন সেইখানেই এরা লতাপাতা কাঠকুটো দিয়ে তখনকার মত ঘরবাড়ী বানিয়ে নিত আর ওরই মধ্যে দলপতির বাড়ী হ'ত একটু বড় গোছের। সেই-খানেই চলত বাকী সকলের আড্ডা। খেলাধুলো গল্প-গুজব ত বটেই, পান-ভোজনও চলত হরদম। মদের মত পানীয় তখনও ছিল, এবং তা এরা খেতও প্রচুর।

এদের সামাজিক গঠনে খুব আদিকাল থেকেই উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল। অভিজাত-শ্রেণী বলে যাঁরা গণ্য হতেন, তাঁদের বংশধররা জন্ম থেকেই সেই আভিজাত্য দাবী করতেন, সে দাবী সকলে বোধ-করি মেনেও নিত। পরবর্ত্তী কালে হিন্দু আর্য্যদের বর্ণাশ্রম-বিভাগ দেখলেই ব্যাপারটা বেশ বোঝা যায়। এদের উৎসব উপাদানের প্রধান অঙ্গ ছিল চারণরা। লেখার অভ্যাস এদের প্রথমে ছিলই না, চারণরা বড় বড় বীর বা মহাপুরুষদের কীর্ত্তিকাহিনী আবৃত্তি করে শোনাত, এবং সেই ছিল ওদের কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, সব কিছু। আনন্দের সবচেয়ে বড় উপাদান।

এই যাযাবর লোকগুলি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থা

হ'ল যে এদের সীমাবদ্ধ স্থানটুকুতে আর কুলোল না। এধারে পশ্চিম এশিয়াতেও যেমন এরা একটু একটু করে আসতে শুরু করল ওধারে ইউরোপের বর্ত্তমান ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান-গুলিতেও বেশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর একদল দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে ভারতের দুর্গম গিরিবর্ত্ম পার হয়ে সিন্ধুর উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। এরাই হ'ল ভারতীয় বা হিন্দু আর্য্য, এদের ভাষা ছিল সংস্কৃত, এবং এদের জীবনযাত্রার কথা আগেই কিছু বলেছি। এরা এসে প্রাচীন দ্রবিড় সভ্যতা থেকে অনেক কিছু শিখলে এবং আরও অনেক এগিয়েও গেল। পশ্চিম এশিয়াতে এদের অগ্রগতিটা ছিল খুব মন্থর কিন্তু সেখানকার অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিদের সংস্পর্শে এসে সভ্যতাটা খুব সহজেই এরা আয়ত্ত করতে পেরেছিল।

আসিরিয়ান প্রভৃতি তখনকার সভ্য জাতিরাও ক্রমশ এদের পরিচয় পেতে লাগল। এই অসভ্য যাযাবর জাতিরা যে শৌর্য্যে বীর্য্যে তাদের চেয়ে ছোট নয়, সে সম্বন্ধেও জ্ঞান হ'তে এদের বেশী দেরী হ'ল না। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে যে দারুণ বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আস্‌ছে সে দিকে চোখ না দিয়ে উপায়ও ছিল না, উত্তর পারস্যে তখনই এদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিডিস ও পারসিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষদের পরাক্রমের কথা খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসরেরও অনেক আগে প্রাচীন সভ্যজাতিদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার মূলে এই যাযাবর দস্যুদল যে কুঠারাঘাত করলে, সে আঘাত এল প্রধানত গ্রীসের পথ বেয়েই। বহুদিন ধরেই ওরা দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গ্রীসের প্রাচীন ঈজিয়ান সভ্যতা লুপ্ত হ'ল। আর্য্যদের একটির পর একটি দল এসে গ্রীসে এবং তার চার পাশের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এদের সব লোকগুলিকেই আমরা গ্রীক নামে অভিহিত করে থাকি বটে কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন যে এই সব দলের মধ্যে অনেক

নাকি পার্থক্য ছিল এবং এদের নামও দিয়েছেন তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন—ইয়োলিক, আয়োনিক, ডোরিক, ফ্রিজিয়ান—এম্‌নি কত কি। সে সব কথা বাদ দিয়ে মোটামুটি আমরা এদের গ্রীক্ বলেই ধরে নিয়ে দেখতে পাই যে সমস্ত গ্রীস ত এরা দখল করে নিলেই, কাছাকাছি সমস্ত দ্বীপ এবং সমুদ্র পেরিয়ে এশিয়া মাইনরেও এসে উপস্থিত হ'ল। সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালীতে এদের উপনিবেশ দ্রুত গড়ে উঠল। প্রাচীন শহর অনেকগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এরা নতুন শহর, নতুন রাজ্য গড়ে তুলল এবং পুরাতন সভ্যতার বুকের ওপর আর এক নতুন, বিচিত্র সভ্যতা সৃষ্টি করলে।

মিডিয়ান ও পারস্য সাম্রাজ্য

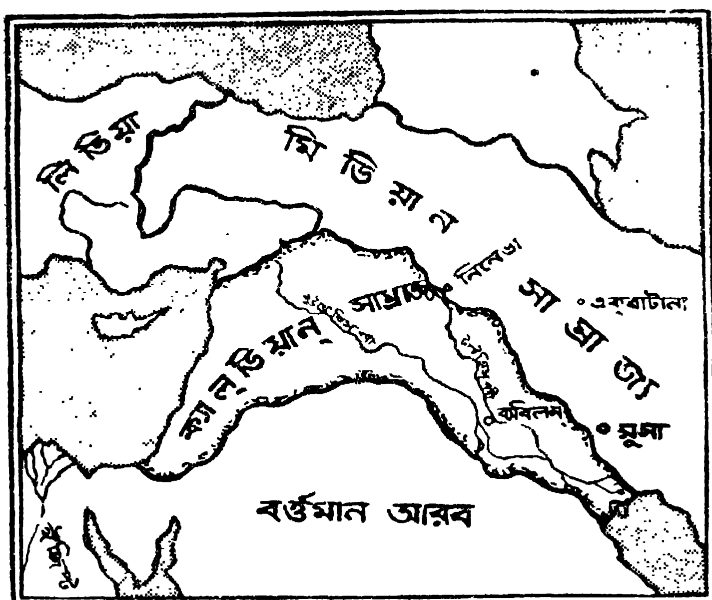
আসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী আমরা আগেই বলেছি। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে আসিরিয়ানরা প্রবল হয়ে উঠে ব্যাবিলোন সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ দখল করলে। এই সময়ে আসিরিয়ানরাই হয়ে উঠেছিল বোধ হয় সবচেয়ে দুর্দ্ধর্ষ, তাদের সাম্রাজ্য ছিল যেমন বিস্তৃত তেমনি শক্তিশালী। কিন্তু তাদের এই প্রাধান্য বেশী দিন টিক্‌ল না। মিশরের যে খানিকটা অংশ এরা দখল করেছিল, কিছুদিন পরে মিশরের লোকেরা সেটা ত কেড়ে নিলেই, উপরন্তু নিকো নামে এক ফারাও এশিয়ার মধ্যে ওদের যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তার থেকেও খানিকটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। আসিরিয়ানরা তাঁকে বিশেষ বাধা দিতে পারলে না, তার কারণ এদিক থেকে আর এক বিপদ তাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ক্যালডিয়া বলে যে একটি প্রদেশ ছিল, সেইখানকার অধিবাসীরা মিডিস ও পারসিয়ান আর্য্যদের সঙ্গে মিলে প্রবলভাবে আসিরিয়ানদের তখন আক্রমণ

করেছে। এইভাবে চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে বেচারীরা আর কতকাল আত্মরক্ষা করবে, ৬০৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আসিরিয়ানরা আর্য্য ও ক্যালডিয়ানদের মিলিত বাহিনীর কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'ল, আর্য্যরা বিজয়গর্ব্বে আসুর-রাজধানী নিনেভা দখল করলে।

এই অভিনয় পৃথিবীতে বার বার হয়েছে, যখনই কোন দেশ বা জাতি উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে, অখণ্ড প্রতিপত্তি যখনই তাদের করায়ত্ত হয়েছে, তখনই দেখা গেছে চারিদিক থেকে দুর্ভাগ্য এসে তাদের গ্রাস করেছে। কোন দেশ, কোন জাতি বেশী দিন শক্তিশালী হয়ে থাকতে পারেনি, সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার অভিশাপ এসে ঘিরেছে তাকে। খুব সম্ভব শক্তি বা ঐশ্বর্য্য এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা পৃথিবীর পক্ষে অকল্যাণকর ব'লেই মঙ্গলময়ের অমোঘ বিধানে তা কখনও থাকতে পারেনি।

আসিরিয়ানদের পতনের পর ওদের বিপুল সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে গেল। উত্তর দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মিডিয়ান সাম্রাজ্য গঠিত হ'ল। প্রাচীন নিনেভা এই সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হ'ল; যদিও মিডিয়ানদের রাজধানী হ'ল এক্‌বাটানা বলে অন্য একটি শহরে। মিডিয়ান সাম্রাজ্য পূর্ব্বে ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মিডিয়ান সাম্রাজ্যের দক্ষিণে ক্যাল্‌ডিয়ানরা আবার ব্যাবিলোনকে কেন্দ্র করেই আর একটি বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করলে। এদের প্রথম সম্রাট নেবুকাড্‌নেজার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, এঁর রাজত্বকালে ব্যাবিলোন শিল্পে, বাণিজ্যে, বিদ্যায়, শক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে এই নেবুকাড্‌নেজারেরই উল্লেখ আছে। উত্তর ও দক্ষিণের দুটি শক্তিশালী সম্রাটের বন্ধুত্বই এই দুটি সাম্রাজ্যের শক্তি-সঞ্চয়ের প্রধান কারণ। নেবুকাড্‌নেজার মিডিয়ান সম্রাটকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করে সেই বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করেন।



ফারাও নিকো ইতিমধ্যে আসিরিয়ানদের অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছিলেন। সিরিয়া ত বহু পূর্ব্বেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল, জুডা বলে আর একটি প্রদেশও তিনি দখল করেছিলেন। এইবার সাহস পেয়ে নিকো সোজা ইউফ্রেতিসের তীর পর্য্যন্ত হানা দিলেন। কিন্তু শিয়াল মারতে গিয়ে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে সামনে বাঘ দেখতে পেলে যে অবস্থা হয় নিকোরই তাই হ'ল। নেবুকাড্‌নেজারের হাতে তাঁর পরাজয় ত হলই, কোন মতে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। সৈন্যসামন্ত অধিকাংশই ক্যালডিয়ানদের হাতে প্রাণ হারাল। লাভের মধ্যে নেবুকাড্‌নেজারের সাম্রাজ্য মিশরের রাজ্য-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'ল।

কিন্তু ক্যাল্‌ডিয়ানদের সৌভাগ্যরবি খুব শিগ্‌গিরই অস্ত গেল। ক্যাল্‌ডিয়ানদের শেষ রাজা নেবোনিডাস্ তাঁর প্রজাদের

মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষ্য করে তাদের খুশী করবার এক মতলব ঠিক করলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য কতকগুলি দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করে এনে ব্যাবিলোনের মধ্যে তাদের মন্দির তৈরী করে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন। এতে হিতে বিপরীত হল। বেল মারডুক নামক ব্যাবিলোনের প্রধান দেবতার পূজারীরা চটে গিয়ে নেবোনিডাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন, এবং মিডিয়ান সম্রাট দিগ্বিজয়ী সাইরাস্‌কে সম্রাট হবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। সাইরাসও তাই চান, তিনি ইতিপূর্ব্বেই লিডিয়ার জ্ঞানী ও বিপুল বিত্তশালী সম্রাট ক্রাসাসকে পরাস্ত করে লিডিয়া দখল করেছিলেন, এইবার ব্যাবিলোনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এবং বেল মারডুকের পুরোহিতদের কৃপায়, বলতে গেলে বিনাযুদ্ধেই ব্যাবিলোন দখল করলেন।

ব্যাবিলোন-বিজয় সম্বন্ধে বাইবেলে চমৎকার একটি গল্প আছে। যেদিন সাইরাস্‌ ব্যাবিলোন দখল করলেন সেইদিন রাত্রে নেবোনিডাসের পুত্র যুবরাজ বেলশাজার একটা কী ভোজ দিয়েছিলেন। সকলে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ করছেন এমন সময় দেখা গেল যে একটি হাত সহসা শূন্যে দেখা দিয়ে কতকগুলি অদ্ভুত শব্দ লিখে দিয়ে চলে গেল। বেলশাজার এই ব্যাপারে ভীত হয়ে তখনই পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন ঐ লিখনের অর্থ ব্যাখ্যা করবার জন্য, কিন্তু প্রায় কেউই তার কোন অর্থ খুঁজে পেলে না, শুধু ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল বললেন, এর অর্থ হ'ল যে 'তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, পারসিকরা তোমার সিংহাসন দখল করবে। সেই দিনই বেলশাজার নিহত হলেন এবং নেবোনিডাস বন্দী হলেন। ক্যালডিয়ান সাম্রাজ্যও মিডিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

ব্যাবিলোন চিরদিনই জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এমন

কি আসিরিয়ানদের রাজত্বকালেও ব্যাবিলোন শহর বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। আসুররাজ সার্দানোপেলাস ব্যাবিলোনে মাটীর ফলকে লেখা পুঁথির এক বিরাট লাইব্রেরী স্থাপন করেন। কিন্তু ক্যালডিয়ানদের আমলে, বিশেষ করে নেবোনিডাসের সময়ে ব্যাবিলোন জ্ঞান-সাধনায় পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। নেবোনিডাস্ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনাকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাঁরই উৎসাহে ও সাহায্যে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা তার রাজত্বকাল থেকে বহুশত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসও উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এত করেও বেচারা নিজের রাজ্য রক্ষা করতে পারলেন না। তার কারণ আগেই বলেছি যে, রাজা যিনিই হোন—এই সব রাজত্বগুলি ছিল চিরকালই পুরোহিত-শাসিত, সুতরাং পুরোহিতদের ঈর্ষ্যা উদ্রিক্ত করাই বেচারার পক্ষে মারাত্মক হ'ল।

যাই হোক—এইভাবে মিডিয়ান ও ক্যালডিয়ান সাম্রাজ্য মিলিত হ'ল। অবশ্য মিডিয়ানদের জয়যাত্রা এখানেই থামল না। সাইরাসের ছেলে ক্যাম্‌বাইসেস মিশর জয় করে মিডিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ক্যাম্‌বাইসেস্ বেচারা কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি, অকস্মাৎ একদিন তাঁর অপঘাতে মৃত্যু হ'ল। তখন দারায়ুস নামক তারই একজন অমাত্য-পুত্র বিপুল পারস্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসলেন। এই দারায়ুস বড় সহজ লোক ছিলেন না, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিটুকু প্রায় সমস্তই তিনি অধিকার করে ছিলেন; তাঁর রাজত্বকালে পারস্যসাম্রাজ্য মিশর, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া থেকে শুরু করে ওধারে ককেশাস পর্ব্বত এবং এধারে ভারতের সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আর্য্যদের ঐ প্রথম সাম্রাজ্য-স্থাপনা, কিন্তু তার আগে বা তার পর

বহুদিন পর্য্যন্ত বোধ হয় অতবড় সাম্রাজ্যের কল্পনাও কেউ করতে পারেনি, এত বিপুল ছিল দারায়ুসের সাম্রাজ্য।

দারায়ুসের সমসাময়িক কালে সাম্রাজ্য শাসন করাও অবশ্য সহজ হয়ে পড়েছিল। আগেকার বলদ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রবাহন গিয়ে ঘোড়া ও রথের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে তখন। আর্য্যসম্রাটদের আমলে প্রশস্ত রাস্তাঘাটও প্রচুর তৈরী হয়েছিল, ফলে এক দেশ থেকে আর এক দেশে গমনাগমনও সহজ হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া দারায়ুসের সময়ে ডাকের ঘোড়া রাখার রীতিও আয়ত্ত হয়েছে, অর্থাৎ রাস্তার পথে পথে গাড়ী টানবার ঘোড়া সজ্জিত থাকত, রাজকার্য্য বা কোন জরুরী কাজে তাড়াতাড়ি যাবার দরকার হ'লে গাড়ী একবারও না থামিয়ে যাওয়া চলত। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হ'লে আর একটা ঘোড়া শুধু সে জায়গায় জুড়ে দেওয়া হ'ত—বিশ্রাম করবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট হ'ত না। দ্রুত গমনাগমনের জন্য এই প্রথাই সেদিন পর্য্যন্ত একমাত্র উপায় ছিল।

এই সময় থেকে আরও একটি মূল্যবান প্রথা যা দেখা দিল তা হচ্ছে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন। এতদিন পর্য্যন্ত সাধারণ কেনা-বেচা বা বাণিজ্যের জন্য বিনিময়-প্রথাই ছিল অদ্বিতীয়। কিন্তু এইবার সে জায়গায় টাকাপয়সার প্রচলন হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করাটা অনেক সহজ হয়ে উঠল। অবশ্য তখনই যে, সব জায়গায় ঐ প্রথার চলন হয়েছিল তা মনে করলে ভুল বোঝা হবে।

কিন্তু বেল মারডুকের পুরোহিতরা যে আশায় নেবোনিডাসের সর্ব্বনাশ করলেন সে আশা তাঁদের সফল হ'ল না। ব্যাবিলোন বড় নগর হিসাবে গণ্য থাকলেও তার রাজধানীর সম্মান আর রইল না। ওখান থেকে রাজধানী চলে গেল সুসায়। আরও কতকগুলি বড় বড় শহর ইতিমধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল। ব্যাবিলোনের সৌভাগ্য-সূর্য্য পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়ল।

এম্‌নিই হয়! পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা বারবারই ঘটেছে, বারবারই তার ফল-লাভ হয়েছে এম্‌নি অশুভং। যখনই কোন দেশের লোকে জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাদ করে বহিঃশত্রুকে ডেকে এনেছে, তখনই দেখা গেছে সেই বহিঃশত্রুই তাদের কাল হয়েছে। বন্যার জল বাঁধ ভেঙে দেশে ঢোকালে তা শুধু আমার শত্রুর বাড়ীই ভাঙে না, আমার নিজের বাড়ীও ভাঙে। আমাদের ভারতবর্ষেই ত এ অভিনয় হয়েছে বারবার। রাজা জয়চাঁদ, সংগ্রামসিংহ প্রভৃতি বার বার এই ভুল করেছেন, বার বারই তার বিষময় ফল ভোগ করতে হয়েছে তাঁদেরই। নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেরাই ডুবে মরেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহুদীদের ইতিবৃত্ত

এইবার যাদের কথা বলব, সেই ইহুদীরা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর জাতি। ছোট্ট এতটুকু দেশ ছিল এদের, আজ বোধ হয় তাও নেই, এশিয়ার সর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তে বিন্দুর মত একটুখানি ভূখণ্ড, আর তার রাজধানী জেরুসালেম। কিন্তু ঐটুকু দেশের সামান্য ক'জন অধিবাসী চিরকাল পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় স্থান অধিকার করে গেছে। আজও এদের নিয়ে গোলযোগ বড় কম হচ্ছে না।

প্রথম আমরা যখন এদের দেখি এরা পূর্ব্বকথিত যাযাবর সেমিটিক দলেরই একটি, জুডিয়া বলে আফ্রিকা ও এশিয়ার সংযোগস্থল সুয়েজের কাছাকাছি একটুখানি একটা দেশে বসবাস শুরু করেছে। সে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর কিংবা আরও আগের কথা। তুদিকে বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ওপর এদের ভাগ্য নির্ভর করত; এদিকে মিশর ওদিকে আসিরিয়া-ব্যাবিলোন, মিডিয়ান, ও ক্যাল্‌ডিয়ান রাজ্যের মাঝামাঝি পড়ে বেচারারা হয়রান হয়ে উঠেছিল। ফারাও নিকো যখন এশিয়ায় জয়যাত্রা করলেন তখন এই সামান্য ভূখণ্ডের রাজা জোসিয়া তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু ফলে জোসিয়াই নিহত হলেন, জুডিয়া মিশরের করতলগত হ'ল। আবার নেবুকাড্‌নেজার যখন নিকোর পেছনে তেড়ে এসে তার ঘরের দোর পর্য্যন্ত হানা দিলেন তখন পথের ধারের জুডিয়া নেবুকাড্‌নেজারেরই পদানত হ'ল। নেবুকাড্‌নেজার তাঁর করদরাজ্য বলে এটিকে গণ্য করে একটি অপদার্থ রাজা মনোনীত করলেন, কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে বেশীদিন

সহ্য করলে না, তাঁকে ত তাড়িয়ে দিলেই, নেবুকাড্‌নেজারের প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীদেরও সকলকে মেরে ফেল্‌লে। এ স্পর্দ্ধা নেবুকাড্‌নেজারের অসহ্য মনে হ'ল। ব্যাবিলোনের সাগর-প্রমাণ সৈন্য এসে জেরুসালেম ধ্বংস করলে। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে, মন্দির প্রভৃতি ভেঙে ভূমিসাৎ করে দিয়ে ইহুদীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যাবিলোনে বন্দী করে রাখা হ'ল। সেইখানেই তারা অনেকদিন ছিল, এবং সেইখান থেকেই তারা বোধ হয় প্রথম লেখাপড়া শিখলে, সভ্যভব্য হ'ল। এবং খুব সম্ভব ইহুদীদের প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ হিব্রু বাইবেল, যাকে বাইবেলের প্রথমাংশ বা ওল্‌ড্‌ টেস্টামেণ্ট বলে ক্রীশ্চানেরা গণ্য করেন, তা ব্যাবিলোনেই প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। এই বইটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। বইটি একাধারে ইহুদীদের ধর্ম্মপুস্তক, আইনের বই, ইতিহাস—সব কিছু। আবার সাহিত্য-গ্রন্থ হিসাবে এ'কে গণ্য করলেও পৃথিবীর আদিম সাহিত্য-গ্রন্থের মধ্যে এ একটি। হয়ত এর অধিকাংশই বহু পূর্ব্ব থেকে মুখে মুখে রচিত হচ্ছিল কিন্তু খৃষ্ট জন্মাবার পাঁচ-ছয় শ' বছর পূর্ব্বেই এ'কে আমরা প্রথম লিপিবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাই।

সাইরাস্‌ যখন ব্যাবিলোন দখল করলেন তখন আবার এদের বরাত ফিরল। তিনি আবার ওদের সবস্থদ্ধ জুডিয়াতে চালান করে দিলেন, এবং জেরুসালেমের মন্দির ঘরবাড়ী কিছু কিছু তৈরী ক'রে দিয়ে নগর-প্রাকার পুনর্নির্ম্মাণ করে জেরুসালেমের নূতন করে পত্তন করলেন। তার পূর্ব্বেকার ইতিহাস খুঁজলে আমরা যতদূর জানতে পারি এই যাযাবর জাতিটি বহুদিন ধরে মরুভূমির ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবার পর মিশরে যায় এবং সেখানেও অনেকদিন বাস করে। তারপর মোজেস্‌ বা মুসা নামক এক উপদেষ্টা বা গুরুর নেতৃত্বে কিছুদিন ধরে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। খুব সম্ভব এরা তদানীন্তন ফারাও-এর অপ্রীতিভাজন হয়, এবং তাঁর রোষ থেকে আত্মরক্ষ

করার জন্যই এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে হয়, যদিও মিশরের ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ নেই। এর পর এরা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং জুডা ও ইস্রায়েল নামক পার্ব্বত্যভূমি অধিকার করে এখানে একরকম বসবাস শুরু করে। কিন্তু নজর ছিল ওদের জুডার পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলের ফিলিস্টিয়া নামক শস্যশ্যামল ভূমিখণ্ডের উপর; ওরা বহু বৎসর ধরে চেষ্টাও করেছে ঐ জমিটুকু দখল করবার, কিন্তু প্রত্যেক বারই ফিলিস্টাইনদের কাছে পরাস্ত হয়েছে।

আগে এদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ দলপতি তাঁরাই উপদেষ্টা-বিচারক-ধর্ম্মগুরুর মিলিত পদে একজনকে নির্ব্বাচিত করতেন, তিনিই এদের শাসন করতেন। বোধ হয় ফিলিস্টাইনদের কাছে বারবার হেরে গিয়েই এরা রাজার উপকারিতা প্রথম অনুভব করে এবং খৃষ্টপূর্ব্ব একসহস্রাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে সল নামক একজনকে এরা রাজা বলে স্থির করে। কিন্তু রাজা সলও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না, ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনিও প্রাণ হারালেন।

সলের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ডেভিড (বা দায়ুদ) রাজা হলেন। ইনি ইহুদীদের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি যেমন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ তেমনি চতুর ছিলেন। ইনিই ফিনিসিয়ানদের এক রাজা হিরামের সঙ্গে সন্ধি করে ইহুদীদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। হিরাম বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলেন লোহিত সাগর দিয়ে বাণিজ্য করতে যাবার, কারণ আগে তাঁকে যেতে হ'ত মিশর দিয়ে ঘুরে, আর সেটা মোটেই নিরাপদ ছিল না। ডেভিড প্রচুর অর্থ ও অন্য প্রকার সুবিধার বিনিময়ে হিরামকে জেরুসালেমের উপর দিয়ে বাণিজ্যপথ ছেড়ে দিলেন। ফলে ডেভিডের এবং তাঁর ছেলে জগদ্বিখ্যাত রাজা সলোমনের সময়

জেরুসালেম সমৃদ্ধির চরম শিখরে উঠেছিল। বড় বড় ঘর-বাড়ী প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতি তৈরী হ'ল, সৈন্য-সামন্ত রথ• অশ্ব প্রভৃতিও যথেষ্ট বেড়ে গেল। সলোমনের এতই নাম-ডাক ছিল যে মিশরের এক ফারাও তাঁকে কন্যাদান করেছিলেন (সে সম্মান তখনকার দিনে অসাধারণ বলেই গণ্য হ'ত)। এবং সুদূর মধ্য-আফ্রিকা থেকে তখন রাণী শেবা তাঁকে বিবাহ করতে এসেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। সলোমনের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের অদ্ভুত সব কাহিনী আজও নানা দেশের সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু সলোমনের মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পরেই এদের সুখ-সৌভাগ্যের অবসান হ'ল। ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাসে সৌভাগ্য ঐ একবারই এসেছিল, বিদ্যুদ্দীপ্তির মত চকিতে দেখা দিয়ে তা আবার মিলিয়ে গেল। জেরুসালেমের অখণ্ড প্রতিপত্তি দুই ভাগ হয়ে জুডা এবং ইস্রায়েল দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হ'ল। এর পরে এই দুটি ক্ষুদ্র রাজ্য কি ভাবে একদিকে মিশর এবং অপর দিকে অন্যান্য শক্তিশালী সেমিটিক সাম্রাজ্যের মধ্যে পড়ে বার বার বিপর্য্যস্ত হচ্ছিল তার কথা আগেই বলেছি। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে আসিরিয়ানদের রোষদৃষ্টিতে পড়ে ইস্রায়েলদের রাজ্য এমন কি তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল। জুডা যদি-বা টিকে ছিল, ফারাও নিকোর হাতে তারও স্বাধীনতা নষ্ট হ'ল।

ইহুদীদের ধর্ম্মবিশ্বাস

এ পর্য্যন্ত গেল ইহুদীদের সাধারণ ইতিহাস। কিন্তু এদের অসাধারণ দিকও একটা ছিল, সেটা হচ্চে এদের ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক। আগেই বলেছি যে সাইরাসের আদেশে এরা যখন ব্যাবিলোন থেকে আবার জেরুসালেমে ফিরে এল তখন এরা রীতিমত সভ্য বা

শিক্ষিত হয়েই ফিরে এসেছিল এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এদের মহাগ্রন্থ বাইবেল লিপিবদ্ধ করে। এই বাইবেলটি মানুষের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। এতদিন পর্য্যন্ত যা কিছু সভ্যতা, যা কিছু রাজশক্তি, সব গড়ে উঠেছিল মন্দিরকে কেন্দ্র করে, এক একটি বিশেষ দেবতা এবং তাঁদের পুরোহিতদের লক্ষ্য করেই। কোন একটা বিশেষ ধর্ম্ম বলে কিছু ছিল না; স্থানীয় দেবতাদের পূজা করা, প্রয়োজন হ'লে বলি দেওয়া এবং তাঁকে লক্ষ্য করে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করা—ধর্ম্ম বলতে এইটুকুই বোঝাত।

এতে করে সকলের চেয়ে বড় অসুবিধা হ'ত এই যে, এক দেশের লোক যখন আর-এক দেশের ওপর চড়াও হয়ে মন্দির দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি ভেঙে-চুরে দিত তখন অনেক সময় সে-দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পেত। শুধু তাই নয়, এক এক দেবতাকে কেন্দ্র করে যে দল পাকানো হ'ত সেই সব দলে বিরোধ ষড়যন্ত্র প্রভৃতির অন্ত থাকত না, এবং এই নিয়ে যে কত বড় বড় কাণ্ড হ'তে পারে তার প্রমাণ আমরা নেবোনিডাসের ইতিহাস থেকেই পাই।

কিন্তু ইহুদীদের বাইবেল সম্পূর্ণ নতুন কথা শোনালে। ইহুদীরা বললে, তাদের ঈশ্বর এক এবং অপরিবর্ত্তনীয়। তিনিই তাদের পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, জীবন-মৃত্যুর মালিক। তাঁর আদেশ (অন্তত তাদের বিশ্বাস যা ঈশ্বরের আদেশ) পালনই ওদের একমাত্র ধর্ম্মাচরণ। দেবমূর্ত্তি নেই, সুতরাং পুরোহিত বা দলাদলিও নেই; শুধু ঈশ্বর এবং তাঁর আদেশ—এই হ'ল ওদের ধর্ম্ম। মধ্যে মধ্যে এক একজন লোক দেখা দিতেন যাঁদের ওরা prophet বা ঈশ্বর-জানিত মহাত্মা বলে বিশ্বাস করত; তাঁরা ওদের কোন্ পথে চলতে হবে, কেমন করে জীবন যাপন করতে হবে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, নানা রকম আশার বাণী শোনাতেন, তাদের সম্বন্ধে যা কিছু

কল্যাণকর বলে মনে করতেন তা অনেক সময় ঈশ্বরের আদেশ বলেও প্রচার করতেন এবং তাতে ফলও হ'ত ভাল।

এই সব সাধুরাই প্রথম বোধ হয় মানুষকে শোনালেন যে পুরোহিতের কাছে নয়, রাজার কাছেও নয়, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই, এবং আমাদের যা কিছু অভাব অভিযোগ, যা কিছু প্রার্থনা তা আমরা সোজা তাঁর কাছেই নিবেদন করতে পারি ; তার জন্য পুরোহিতদের শরণাপন্ন হবার কিছু নেই। তিনি সকলকারই ঈশ্বর—ধনীরও যেমন, দরিদ্রেরও ঠিক তেমনি—তাঁর কাছে রাজা, পূজারী বা দরিদ্রতম প্রজার কোনও প্রভেদ নেই। যে লোক ঐশ্বর্য্যের সুযোগ নিয়ে বা পদবীর সুবিধা নিয়ে দরিদ্রের ওপর অত্যাচার করছে তাকে একদিন সেই ওপরওলার কাছ থেকে এই সমস্ত অন্যায়ের শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে, যাঁর কাছে মানুষের প্রত্যেকটি অন্যায়ের বিবরণ জমা থাকছে—যাঁর ন্যায়-বিধান অমোঘ, অব্যর্থ।

এই যে বাইবেলের ধর্ম্ম, এই যে মহাপুরুষদের বাণী, যা কালে বাইবেলের সঙ্গেই মিশে গেল, এই বিশ্বাস ইহুদীদের এমন একটা বলিষ্ঠ সুদৃঢ়তা এনে দিলে যাতে করে পরে এরা বহুদিন বহু ঝঞ্ঝা সহ্য করেও পৃথিবীর বুকে নিজেদের বিশ্বাস, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে রইল। শুধু তাই নয়, আর্য্যরা এসে যখন একে একে প্রাচীন সেমিটিকদের পদদলিত করে তাদের হাত থেকে সমস্ত রাজ-ক্ষমতা, সমস্ত ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিলে, তখন অন্যান্য সেমিটিক দলেরও বহু লোক এসে বাইবেলের শান্তিচ্ছায়ায় আশ্রয় নিলে। বস্তুত তখনকার দিনের সেমিটিক জাতি বলতে এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত মুষ্টিমেয় ইহুদী এবং আরবের মরুভূমি অঞ্চলের সামান্য কয়েক জন বেদুইনদেরই বোঝায়। আর কোথাও কেউ নেই।

ইহুদীরা বহুদিন ধরেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে আসছে, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশই এদের ঘৃণার চোখে দেখেছে চিরকাল ; বর্ত্তমান কালে, এমন কি এখনও পর্য্যন্ত, এদের দুর্দ্দশার সীমা নেই। কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত, এই ক'টি লোক সেই সুপ্রাচীন কালের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মগ্রন্থকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যুগে যুগে এরা 'শির' দিয়েছে কিন্তু 'শিখ' বা ধর্ম্মমতকে বিসর্জ্জন দেয়নি !

গ্রীক ও পারসিক

আর্য্যদের দুটি-তিনটি দল বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে গ্রীসে প্রবেশ করল এবং ঈজিয়ানদের পরাজিত করে তারা সেই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর একটু একটু করে নিজেদের স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলল, তা আমরা আগেই বলেছি। ওদের সেই সময়কার ইতিহাস যে লিপিবদ্ধ নেই তা বলাই বাহুল্য, কারণ লেখার কৌশলটা ওরা আয়ত্ত করেছিল অনেক পরে। তবে ওদের সে সময়কার ঠিক ইতিহাস না জানলেও ওদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি আমরা জানতে পারি ইলিয়াড ও ওডিসি নামক ওদের দুটি মহাকাব্য থেকে। এশিয়া মাইনরের ট্রয় নগরী গ্রীকরা কেমন করে দীর্ঘকাল অবরোধের পর দখল করলে এবং ধ্বংস করলে তারই কাহিনী নিয়ে ইলিয়াড এবং ট্রয় যুদ্ধের সেনাপতি ওডিসীয়ুস্ কেমন করে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ট্রয়যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এলেন তাই নিয়ে ওডিসি নামক মহাকাব্যটি রচিত। এই দুটি কবে রচিত হয় ঠিক জানা নেই, কারণ চারণদের মুখে মুখে বহুকাল ধরে গীত হবার পর, বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে, প্রথম এ দুটি লিপিবদ্ধ হয়। হোমার নামক একজন অন্ধ গায়ক

এ দুটি কাব্যের রচয়িতা বলে বিখ্যাত, যদিও অনেকে তা স্বীকার করে না।

সে যাই হোক্—এই দুই বই থেকেই আমরা তখনকার গ্রীকদের কিছু পরিচয় পাই ; যেমন আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বই থেকে ভারতীয় আর্য্যদের জীবনযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রীকেরা যখন প্রথম বর্ত্তমান গ্রীসে এসে বসবাস করতে শুরু করে তখন ওরা শহর কাকে বলে তাই জানত না। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে বাস করত, দলপতির কুটীরটি হ'ত একটু বড় গোছের, তাকে ঘিরে এদের কুটীর বাঁধত এরা। ইলিয়াড যে সময়কার ঘটনা নিয়ে রচিত তখনও এরা লৌহ-অস্ত্রের ব্যবহার জানত না। ইজিয়ানদের যে সব শহর এরা ভাঙলে তারই অনুকরণে কিছুদিন পরে এরা পাঁচিল দিতে শিখলে। নিজেদের বসতির চারপাশে পাঁচিল দিয়ে প্রথম শহরের পত্তন হ'ল। ক্রমে ইজিয়ানদের দেখাদেখি মন্দিরও তৈরী করতে শিখলে যদিও, তাই বলে পুরোহিত-শাসিত রাষ্ট্রে এরা কখনই পরিণত হয়নি। এই ভাবে কতকগুলি শহর গড়ে উঠল, ক্রমে এই শহরগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করলে, এমন কি অন্যান্য দেশেও এরা বাণিজ্য করতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তা-ছাড়া কাছাকাছি অন্য দেশে (যেমন ইটালী) বা ছোট ছোট দ্বীপে এরা পরে উপনিবেশ স্থাপন করবার ব্যবস্থাও করেছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে গ্রীসে অনেকগুলি বিখ্যাত শহর গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে এথেনস্, স্পার্টা, কোরিন্থ প্রভৃতি পরে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু এই নগরগুলিকে কেন্দ্র করে যে ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠিত হ'ল তারা কোনদিনই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারেনি। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এদের ভৌগোলিক অবস্থান। গ্রীস এবং গ্রীক উপনিবেশ, যাকে বৃহত্তর

গ্রীস বলা হ'ত, তা প্রায় সমস্তটাই পার্ব্বত্যভূমি। সমতল ক্ষেত্রে বড় বড় নদীর ধারে যে সব শহর আমরা এর আগে গড়ে উঠতে দেখেছি, তা গমনাগমনের সুবিধা থাকায় শীগ্‌গিরই এক একটি মিলিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এখানে সে রকম কোন সুবিধা না থাকায় এরা ক্ষুদ্র, স্ব স্ব-প্রধান এবং স্বতন্ত্র হয়েই রইল। বরং পরস্পরের প্রতি কিছু বৈরভাবাপন্নই ছিল, যদিও তাতে বাণিজ্যের আদান-প্রদান হবার কোন বাধা ছিল না। অবশ্য একটা একতার সূত্র এদের ছিল; তা হচ্ছে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অলিম্পিয়া নগরীতে প্রতি চারি বৎসর অন্তর একটি করে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হ'ত: সেই উপলক্ষ্যে সমস্ত গ্রীস এমন কি বিদেশ থেকেও বহু লোক দর্শক হিসাবে, বা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আসত। এই সময়ের জন্য সমস্ত বিদ্বেষ বা ভেদবুদ্ধি সংযত করে রাখা হ'ত এবং সমস্ত বিদেশী যাতে নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে দেশে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হ'ত।

ক্রমে এই ছোট ছোট শহরগুলি ক্ষমতায় ও ঐশ্বর্য্যে বড় হয়ে উঠ্‌ল। কতকগুলি ছোট ছোট শহর নিকটবর্ত্তী বড় শহরগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই মেনে নিলে বটে কিন্তু তবুও এই সব রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও ছিল কিছু স্বতন্ত্র ধরণের; তাকে সাধারণতন্ত্রই ধরা যায়, যদিও সে রাষ্ট্রতন্ত্রে ঠিক জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। দেশের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ধনী ও অভিজাতবংশীয় তাঁরাই দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করতেন।

কিন্তু তবুও এ অনেকখানি স্বাধীনতা। পুরোহিত বা অতিমানব রাজাদের শাসন না থাকায় শুধু তারা তাদের বাহ্যিক জীবনেই যে খানিকটা স্বাধীনতা পেলে তাই নয়, তাদের মনেও ঢের পরিবর্ত্তন দেখা দিলে। তারা বিশ্বসৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল।

নানাবিধ তত্ত্বানুসন্ধানে মন দিলে, এতদিন যে চিন্তা অর্থাৎ দেবতা বা পরলোক সম্বন্ধীয় চিন্তায় একমাত্র গুরু-পুরোহিত বা রাজাদেরই একচেটে অধিকার ছিল, এখন জনসাধারণের মধ্যে থেকেই কতকগুলি লোক সে বিষয়ে আলোচনা, চিন্তা এবং আত্মজিজ্ঞাসা শুরু করলে। এই লোকগুলির চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু ঋষিদের চিন্তাধারার অনেক সাদৃশ্য ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতিতে যাঁরা এইভাবে আত্মনিয়োগ করলেন সেই গ্রীক পণ্ডিত বা দার্শনিকদের প্রভাব পাশ্চাত্ত্যজীবনে বড় কম নয়। আমরাও যেমন আজ পর্য্যন্ত ঋষিদের উপদেশ বা রচনা থেকেই আমাদের চিন্তা বা কর্ম্মের প্রেরণা পাচ্ছি, গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে থেকে ইউরোপও বহুদিন ধরে সেই প্রেরণা পেয়ে এসেছে; এবং আজও হয়ত কিছু পায়।

কিন্তু এই সব তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পরিচয় দেবার আগে পারসিকদের সঙ্গে গ্রীসের যে যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে, সেই অসাধারণ বিরোধের কথা কিছু বলা দরকার। পারসিকরা যে ইতিমধ্যে কি বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেছে তা আগেই বলেছি। ব্যাবিলোন এবং লিডিয়ার বিপুল রাজ্যখণ্ড নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করার ফলে সাইরাসের সাম্রাজ্য যে আয়তন প্রাপ্ত হ'ল, তা তখনকার দিনে ত নয়ই, তার পরবর্ত্তী কালেও খুব অল্পসংখ্যক সম্রাটের অদৃষ্টেই ঘটেছে। তা-ছাড়া এশিয়া-মাইনরের ফিনিসিয়ান এবং গ্রীকদের যে ছোট ছোট শহরগুলি ছিল, সেগুলিকেও তিনি করদরাজ্যে পরিণত করলেন। সাইরাসের পর ক্যামবাইসেস যখন সম্রাট হলেন তখন তিনি মিশর আক্রমণ করলেন এবং অল্পায়াসেই মিশরকেও পারস্য-সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। তার ফলে সম্রাট প্রথম দারায়ুস যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন তিনি মিশর থেকে সিন্ধুনদের উপকূল এবং ওধারে

মধ্য এশিয়ার প্রান্তভূমি পর্য্যন্ত এক বিপুল রাজ্যখণ্ডের মালিক। গ্রীকেরা এঁর অধীন না হ'লেও এই বিপুলবিত্তশালী এবং প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাটকে তারা যথেষ্ট ভয় করে চল্‌ত এবং কোনমতেই চটাতে চাইত না। কিন্তু এতবড় নরপতিরও একজায়গায় একটু অশান্তি ছিল। দক্ষিণ রুষের যাযাবর সিথিয়ান্‌রা তাঁর রাজ্য-সীমান্তে এসে প্রায়ই উৎপাত করত। শেষে একসময় যখন তাদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠল তখন দারায়ুস তাদের একেবারে উচ্ছেদ করবার সংকল্প করে বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন। এবং এই সিথিয়ানদের দমন করবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথম ইউরোপ আক্রমণ করলেন, আর তাতে করেই বাধল গ্রীকদের সঙ্গে ওঁর বিবাদ।

প্রথমে তাঁর বিপুল বাহিনী বস্‌ফোরাস প্রণালী পার হয়ে বুলগেরিয়ার মধ্যে দিয়ে সটান অগ্রসর হ'ল। কিন্তু ডানিয়ুবের তীরে পৌঁছে সার সার নৌকো সাজিয়ে তার সাঁকোয় নদী পার হয়েই তিনি বিপদ বুঝতে পারলেন। তাঁর সৈন্যেরা প্রায় সকলেই পদাতিক, কিন্তু যে সিথিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধযাত্রা, তারা সকলেই অশ্বারোহী। ডানিয়ুব ছাড়িয়ে তিনি যত উত্তর দিকে যেতে লাগলেন ততই সিথিয়ানদের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে উঠলেন। তারা কোথা থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনীর ওপর এসে পড়ে, যতদূর সম্ভব লোকক্ষয় করে রসদ নষ্ট করে আবার কোথায় পালিয়ে যায়। যারা সামনে আসে না, যাদের ধরা-ছোঁয়াও যায় না কোনমতে, তাদের সঙ্গে কী যুদ্ধ করবেন তিনি? শেষে এমন ক্ষতি হ'ল তাঁর যে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পালিয়ে আসা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

দারায়ুস নিজে সুসায় ফিরে এলেন কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনীর এক অংশ গ্রীসে রেখে এলেন। তার ফলে মাসিডোনিয়া শীগ্‌গিরই তাঁর পদানত হ'ল। ইতিমধ্যে এশিয়ার যে সব গ্রীক শহরগুলি

তাঁর অনুগত রাজ্য হিসাবে গণ্য হচ্ছিল, সেগুলিও তিনি খাসে নিয়ে এলেন। এবং এর কিছুদিন পরে তিনি আবার যুদ্ধযাত্রা করলেন— এবারে তাঁর লক্ষ্য হ'ল সোজাসুজি গ্রীসই।

এবার তিনি ফিনিসিয়ানদের অনেকগুলি জাহাজকে যুদ্ধ-জাহাজে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন আর তার ফলে গ্রীকদের অধিকৃত ছোট ছোট দ্বীপগুলি তিনি অনায়াসেই দখল করে নিলেন। এই বিজয়-উল্লাসে মত্ত হয়ে তিনি তাঁর বিপুল বাহিনীর মুখ ফেরালেন গ্রীসের বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শহর এথেন্স্‌-এর দিকে, আর সেই উপলক্ষে এথেন্স্‌-এর উত্তর সমুদ্রোপকূলে ম্যারাথন নামক একটি স্থানে এসে তাঁরা জাহাজ ভেড়ালেন। কিন্তু দারায়ুসের দর্প চূর্ণ করাই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল, সামান্য এথেন্স্‌-এর অধিবাসীদের কাছে তাঁর বিপুল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে গেল।

প্রথমটা এথেন্স্‌-এর লোকেরাও খুব ভয় পেয়েছিল, তারা এই উপলক্ষ্যে স্পার্টার পৌরসভার কাছে একটি দূত প্রেরণ করে এই ব'লে যে, 'গ্রীকদের এই আসন্ন বিপদের দিনেও কি গ্রীকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে? একবার মিলিতভাবে চেষ্টা করবে না বহিঃশত্রুকে তাড়াবার জন্য?' যে দূতটিকে পাঠানো হয়েছিল সে প্রাণপণে দৌড়ে এক-শ' মাইলেরও বেশী পথ দেড় দিনে অতিক্রম করে এই সংবাদ স্পার্টায় পৌঁছে দিয়েছিল। স্পার্টানরাও কালবিলম্ব না করে এথেন্স্‌-এর দিকে যাত্রা করলে, কিন্তু তারা যখন এসে পৌঁছল তখন দেখলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, শত্রুদের চিহ্নও নেই, শুধু পরাজিত পারসিকদের মৃতদেহে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন!

পরাজয়ের এই নিদারুণ আঘাত দারায়ুস আর বেশী দিন সহ্য করতে পারলেন না, এই যুদ্ধের অল্পদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। কিন্তু এই অপমানের কথা তাঁর ছেলে জারেক্‌সেস্‌ ভুলতে পারলেন

না, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের আয়োজন শুরু করলেন। চার বৎসর ধরে উদ্যোগ-আয়োজন করে যে বাহিনী নিয়ে এবার তিনি যাত্রা করলেন তা তখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। গ্রীকরা সেই সৈন্যসংখ্যার খবর পেয়ে, নিজেদের যতটুকু ক্ষমতা ছিল সঙ্ঘবদ্ধ করে তাঁকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হ'ল বটে কিন্তু বাধা দিতে পারলে না কিছুতেই। পারসিকদের সৈন্যরা দার্দ্দানেলিস প্রণালী পার হয়ে সমুদ্র-তীর বেয়েই এগিয়ে চলল গ্রীসের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুল নৌবহর চলল তাদের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করে। ৪৮০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে থার্ম্মপলির গিরিসঙ্কটে গ্রীকেরা পারসিকদের সম্মুখীন হ'ল। লিওনিডাস নামক একজন স্পার্টান সেনাপতির অধীনে গ্রীক সৈন্যেরা প্রাণপণে পারসিকদের বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু যা অসম্ভব তা কেমন করে তারা সম্ভব করবে? সমুদ্র যেমন করে একবিন্দু জলকে নিঃশেষে গ্রাস করে তেমনি করেই পারসিকরা গ্রীকদের গ্রাস করলে, একটি প্রাণীও জীবিতাবস্থায় রণস্থল ত্যাগ করতে পারলে না।

এই যুদ্ধের পরে পারসিকদের প্রথম লক্ষ্য হ'ল এথেনস্। কিন্তু এথেনস্‌বাসীরা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে দেশ ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করলে, পারসিকরা শূন্য শহরে প্রবেশ করে পূর্ব্বতন পরাজয়ের প্রতিহিংসায় সমস্ত শহরে আগুন ধরিয়ে দিলে।

কিন্তু পারসিকদের এ বিজয়-উল্লাস স্থায়ী হ'ল না। বেচারীরা মারাথনের প্রতিশোধটা উপভোগ করার অবসর পাবার আগেই গ্রীক নৌবহর, যদিও তা সংখ্যায় এবং সামর্থ্যে পারসিকদের কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, পারসিকদের নৌবাহিনী আক্রমণ করে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দিলে। ফলে এদের রসদ প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল। এই আকস্মিক পরাজয়ে জারেক্‌সেসের মতিভ্রম

ঘটল, তিনি যেন দিশেহারা হয়ে তাড়াতাড়ি অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। গ্রীকদের তখন মহা উৎসাহ, তারা বাকী পারসিকদের বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে একেবারে নির্ম্মূল করে দিলে। এমন কি, যে দু'চারটে জাহাজ কোনমতে গ্রীকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে এসেছিল, গ্রীক নৌবহর পেছনে পেছনে তেড়ে এসে তাদেরও শেষ করে দিলে।

গ্রীকরা এইবার পারসিকদের ভয় থেকে একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'ল। কারণ এই সাংঘাতিক পরাজয়ের পর পারসিকদের আর কোনদিনই মাথা তুলতে হয় নি। ৪৬৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে জারেক্সেস আততায়ীর হাতে নিহত হন, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে বিদ্রোহ শুরু হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পারসিকদের অতবড় বিপুল সাম্রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

পারসিকদের পরাজয়ের ফলে গ্রীসে যে নব জাগরণ দেখা দিলে তার প্রভাব তাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত অংশেই প্রতিফলিত হ'ল। এথেন্স্-এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে অধিকতর সুন্দর এথেন্স্ গড়ে উঠল। পেরিক্লিস্ নামক যে নেতা এই পুনর্গঠন সম্ভব করলেন তাঁরই উৎসাহে চারিদিক থেকে নানা জ্ঞানী ও গুণী লোক এথেন্স্-এ এসে জড়ো হ'ল। এল ভাস্কর, এল শিল্পী, এল কবি, এল দার্শনিক, এল নাট্যকার! সেই সময়কার ঐতিহাসিক হেরোদোটাস, বৈজ্ঞানিক আনাক্সাগোরাস, নাট্যকার সফোক্লিস ও আস্কাইলাসের নাম আজও পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

অবশ্য এই সময়ে গ্রীসেও গৃহবিবাদের আগুন জ্বলছিল। এথেন্স্, স্পার্টা প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি, কে কাকে শাসন করবে এই নিয়েই পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের সীমা ছিল না। এই সব যুদ্ধই ইতিহাসে পিলপনেসিয়ান যুদ্ধ নামে

বিখ্যাত ; এবং এই সব যুদ্ধের ফলে পরে গ্রীসের উত্তর ম্যাসি-ডোনিয়া নামক রাজ্যটিই প্রকৃত পক্ষে গ্রীসের মালিক হয়ে বসেছিল। কিন্তু এত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও গ্রীকদের মানসিক উন্নতি একটুও বাধা পায় নি, বরং তা বাইরের এইসব বাধার আঘাতেই যেন দ্রুত জয়যাত্রার পথে এগিয়ে গেল। এতদিন পর্য্যন্ত যা কিছু ধ্রুব বলে মেনে নিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল গ্রীক দার্শনিকরা প্রথম তাতে সন্দেহ করলে, প্রথম তারা প্রশ্ন করলে যে, মাত্র চোখে আমরা যা দেখছি এবং পিতৃপিতামহ যা বলে গেছেন তা-ই সব সময় ঠিক, কিংবা যুক্তি-তর্ক ও আলোচনার দ্বারা এই সব তথ্য ছাড়িয়ে আর কোন সত্যে পৌঁছন যায়! পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর এথেন্‌স্‌-এ সক্রেটিস নামক একজন পণ্ডিত সহসা তাঁর সারগর্ভ যুক্তি এবং নতুন মতের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই লোকটি এমনই সব নতুন কথা বললেন যে, এথেন্‌স্‌-এর অধিবাসীরা মানুষের মনকে বিপথে নিয়ে যাবার অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড দিলে। তীব্র বিষ পানে সক্রেটিসের মৃত্যু হ'ল।

সক্রেটিস মারা গেলেন বটে কিন্তু যে 'নতুন দিনের আলো' তিনি জ্বেলে গেলেন তা আর নিভল না। তাঁর শিষ্যেরা তাঁর চিন্তাধারাই প্রচার করতে শুরু করলেন। এইসব শিষ্যদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত, সেই প্লেটো শুধু মানুষের গতানুগতিক আধ্যাত্মিক চিন্তার মূলেই আঘাত করলেন না, তার তদানীন্তন জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রনীতিকেও সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করলেন। তিনি তাঁর কল্পিত রাজ্য ইউটোপিয়ার বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিলেন যে তার গলদ কোথায় এবং কি করলে মানুষের চিন্তা, তার জীবনযাত্রা মহত্তর হ'তে পারে। প্লেটোর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য এ্যারিস্টটল এই চিন্তাধারার নব জাগরণকে বাঁচিয়ে ত রাখলেনই, বরং তাঁর সময় তা আরও প্রসার লাভ করল।

এ্যারিস্টটল ম্যাসিডোনিয়ার লোক এবং একসময় তিনি ম্যাসিডোনিয়ার যুবরাজ আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষক ছিলেন, যিনি পরে আলেকজান্দার দি গ্রেট নামে বিখ্যাত হন।

এ্যারিস্টটল ভেবে দেখলেন যে প্লেটোর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্ব্বে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের আরও কিছু বৃদ্ধি হওয়া দরকার। তিনি সেই প্রথম সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে বিজ্ঞানচর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং দেশবিদেশে লোক পাঠিয়ে নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সেদিন পর্য্যন্ত তাঁর মতবাদই পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান-সাধনায় প্রামাণ্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়েছিলেন আর সেই সব গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন। একটা লোক তার নিজের জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে কতখানি বাড়িয়ে যেতে পারে, এ্যারিস্টটলই হলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ্যারিস্টটলকে নব্য-ন্যায় এবং পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ

ওধারে পশ্চিম প্রান্তে যখন গ্রীকদের মধ্যে নব চিন্তাধারার সূচনা মাত্র হয়েছে কিংবা তখনও হয়নি, সেই সময়েই এই ভারতবর্ষে, গ্রীক-পারসিক-ইহুদীদের অজ্ঞাতে আর এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীকে এক নতুন আলো দিলেন, মানুষকে এক নতুন পথ দেখালেন। পৃথিবীতে যুগান্তর এলো।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ছ শ' বছর আগে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়; অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ছাব্বিশ-শ' বছর আগে! বৈদিক ঋষিদের প্রবর্ত্তিত জীবনযাত্রা, ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতি এবং ঈশ্বর-উপাসনার উপদেশ তখন কুসংস্কারে এবং অসংলোকের চেষ্টায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। যে-ব্রাহ্মণরা একদা নিজেদের নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তি এবং জ্ঞানসাধনার দ্বারা সকলের নমস্য হয়েছিলেন, সেই ব্রাহ্মণরাই নিজেদের পাপাচার দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজকে কলুষিত করে তুলেছেন। ধর্ম্মের চেয়ে তখন আচার হয়ে উঠেছে বড়, পূজাকে ছাপিয়ে গেছে অনুষ্ঠান, সংস্কারই দেবতার আসন পেয়েছে। হিন্দুধর্ম্মের সেই ঘোর সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ভারতের উত্তরে নেপালের সীমান্ত-দেশে কপিলাবাস্তু নগরের এক ক্ষত্রিয় রাজার ঘরে জন্মালেন গৌতম-বুদ্ধ! সঙ্গে সঙ্গে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

রাজার একমাত্র ছেলে, যথেষ্ট সুখ এবং বিলাসের মধ্যেই থাকেন, কিন্তু তবু মনে হয় সিদ্ধার্থ বা গৌতমের যেন মনে শান্তি নেই, তিনি যেন সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। ভাবগতিক দেখে রাজা তাঁর সতের-আঠারো বছর বয়সের সময়েই দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের

সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। অর্থাৎ যাতে সংসারে মন বসে,—এই রাজ্যের যে ভবিষ্যৎ মালিক, তার রাজ্য-ঐশ্বর্য্যে আসক্তি থাকা দরকার ত! প্রথমটা মনে হ'ল যে রাজার এই ওষুধ বুঝি খাটল কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার গৌতমের সেই অন্যমনস্ক ভাব দেখা দিল; যে প্রচণ্ড চিন্তাশক্তি একদিন সমস্ত বিশ্ববাসীর মোহনিদ্রার মূলে, জড়তার মূলে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল, সেই চিন্তাশক্তি তাঁর অলস মস্তিষ্কের কোষে কোষে তখন প্রকাশপথের সন্ধানে মাথা খুঁড়ছে। তিনি কি স্থির থাকতে পারেন! তাঁর সর্ব্বদাই মনে হয় কী একটা কাজ করতে হবে, গুরুতর কী একটা দায়িত্ব তাঁর মাথায় চাপানো আছে অথচ তিনি তা না ক'রে বৃথা আলস্যে দিন কাটাচ্ছেন। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে থাকতে থাকতে ক্রমে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন, একদা স্থির করলেন যে প্রজাদের অবস্থা নিজচোখে দেখবার জন্য তিনি প্রত্যহ নগর-ভ্রমণে বেরোবেন। রাজার ছেলে, এতকাল সুখের মধ্যেই দিন কাটিয়েছেন, নগর-ভ্রমণে বেরিয়ে এই তিনি দুঃখকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন জরা, দেখলেন মৃত্যু, দেখলেন দুঃখের নানারকম রূপ। আর সেই সঙ্গেই দেখলেন এক সন্ন্যাসীর শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি, আনন্দের মূর্ত্তিমান্ ছবি।

প্রাসাদে ফিরে এসে সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগলেন—কেন এমন হয়? এর কি কোন প্রতিকার নেই? সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর জীবনের পথ দেখতে পেলেন, নিজের জীবনের ব্রত খুঁজে পেলেন। তিনি স্থির করলেন, পৃথিবীর দুঃখ এবং অশান্তি দূর করবার মহৎ সাধনাই তিনি করবেন, ঐ-ই তাঁর পথ। এই সময় তাঁর একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'ল; মায়ার বাঁধন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে এক দিন রাত্রে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করলেন এবং বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী

অনশনে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করে তিনি যোগাভ্যাস প্রভৃতি করতে লাগলেন। কিছুদিন পরেই কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে অনশনে শুধু দৈহিক কষ্ট পাওয়া যায়, তাতে করে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তিনি সে পথ ছাড়লেন, আবার খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন, এবং নির্জ্জনে গভীরভাবে শুধু চিন্তা করতে লাগলেন কি-করে মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর তপস্যার সময়ে কয়েকটি শিষ্যও জুটেছিল, তারা তাঁর এই ভাবান্তর দেখে হতাশ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল, কিন্তু তাতে সিদ্ধার্থ বিচলিত হলেন না, তিনি একমনে শুধু ভেবেই চললেন। অবশেষে বর্ত্তমান গয়ার কাছে, বনের মধ্যে এক পাকুড়গাছের তলায় বসে তিনি এই পরম সত্য আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ নিজের কর্ম্ম অনুসারেই ফলভোগ করে, পবিত্র কাজ করলেই শান্তি পাওয়া যায়। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন তাতে করে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই, পূজার অনুষ্ঠান নিয়েও মাথা ঘামাবার কোন সার্থকতা নেই; মানুষ যদি কোন পাপ না করে, মানুষ যদি জীবনের পথে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন জঞ্জাল জড়ো না করে ত কোন কষ্ট কোন অশান্তি তাকে ভোগ করতে হবে না।

এই চরম জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব তাঁর লাভ হ'ল বলে সেই দিন থেকে তাঁর নাম হ'ল বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। যেখানে বসে তিনি এই সত্যের আলোক পান, সেইখানেই বুদ্ধগয়ায় বিরাট স্মৃতিমন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। বুদ্ধ গয়া থেকে কাশীতে গেলেন, যেহেতু কাশী চিরকালই জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত; বুদ্ধ জানতেন যে কাশীর লোককে যদি তিনি তাঁর মতাবলম্বী করতে পারেন ত তাঁর মত প্রচারে আর কোন বিঘ্ন হবে না। দেখতে দেখতে তাঁর শিষ্যসংখ্যা বেড়ে চল্‌ল সমস্ত ভারতবর্ষময়, এবং এর কিছুদিন পরে সম্রাট অশোকের চেষ্টায় সারা পৃথিবীময় এই বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ল যে, অদ্ভুত একটি মানুষ জন্মেছেন

পৃথিবীতে—পৃথিবীর লোককে আশার বাণী, মুক্তির বাণী শোনাতে—মানুষের আর ভয় নেই!

মানুষের যা কিছু কষ্ট, যা কিছু দুঃখ, তা আসে তার কামনা থেকেই। আহারের লোভ, দৈহিক ভোগবিলাসের লোভ, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি থেকেই তার যা কিছু অশান্তি ও বিরোধ! বুদ্ধ বললেন, এই কামনাকে যদি সংযত করতে পারো, নিজেকে ঘিরে এই যে সহস্র ভোগবিলাসের ইচ্ছা, এ'কে যদি দমন করতে পারো, নিজের অহংজ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে। আর তা'লেই দেখবে যে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট নিমেষে তোমার কাছ থেকে সরে দাঁড়াবে। নিষ্কাম শুদ্ধ সংযত জীবনযাত্রার ফলই নির্ব্বাণ বা মুক্তি। বুদ্ধের উপদেশের এই হ'ল সারাংশ। এ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, আর তা কার্য্যে পরিণত করা আরও কঠিন। সেই জন্যই বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম বেশী দিন টিকে থাকতে পারে নি, খুব শীগ্‌গিরই নানা অনাচারে বিকৃত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তবু মানুষের ইতিহাসে বুদ্ধের এই আবির্ভাব চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, তাঁর এই অভিনব চিন্তা-শক্তির প্রভাব তার জীবনে বড় কম নয়।

প্রায় আশী বছর বয়সে কুশীনগরের কাছে বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

আলেকজান্দার

বুদ্ধের পরও ভারতবর্ষের ইতিহাস কিছুদিন পর্য্যন্ত ঝাপ্‌সা ঠেকে। যে সময় থেকে সেখানকার ইতিহাস স্পষ্ট দেখতে পাই সে হচ্ছে আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের সময়। কিন্তু তার পূর্ব্বে মহাবীর আলেকজান্দারের কথা কিছু বলি। আলেকজান্দারের জন্মভূমি ম্যাসিডোনিয়া বলা হ'ত গ্রীসের ঠিক উত্তর-প্রান্তের

ভূখণ্ডকে। গ্রীস যখন অন্তর্ব্বিরোধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল সেই পিলপনেসিয়ান যুদ্ধের অবসরে ম্যাসিডোনিয়া ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় করেছিল। অবশেষে রাজা ফিলিপের সময় তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলে ফিলিপ ম্যাসিডোনিয়ার শক্তিকে দুর্দ্ধর্ষ করে তুল্‌লেন। এবং ফিলিপই ৩৩৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চেরোনিয়ার যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত গ্রীসকে ম্যাসিডোনিয়ার পদানত করে ফেল্‌লেন। ফিলিপের ইচ্ছা ছিল যে এইবার তিনি গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার মিলিত বাহিনী নিয়ে এশিয়ায় যাত্রা করবেন এবং একদা পারসিকদের মতই এক অখণ্ড বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা কাজে লাগাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। কিংবদন্তী, তাঁর স্ত্রীর চক্রান্তেই ফিলিপ নিহত হন।

কিন্তু ফিলিপের মৃত্যুতে গ্রীকদের জয়যাত্রা ব্যাহত হ'ল না। ফিলিপ তাঁর উত্তরাধিকারী আলেকজান্দারের শিক্ষার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নি। বিশেষতঃ চোরোনিয়ার যুদ্ধে কিশোর আলেকজান্দার নিজে একটি সৈন্য-বাহিনীর পুরোভাগে থেকে যুদ্ধও করেছিলেন। সুতরাং আলেকজান্দার যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন তাঁর মাত্র বিশ বৎসর বয়স হ'লেও তিনি তৎক্ষণাৎ পিতার অপূর্ণ কার্য্যের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। মাত্র বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের সময় ৩৩৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তিনি দিগ্বিজয়-যাত্রায় বার হলেন।

প্রথমে এসিয়ায় পৌছেই তাঁকে পারসিকদের সঙ্গে একটি ছোটখাট যুদ্ধ করতে হয়, সে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি এশিয়া মাইনরের অনেকগুলি শহর দখল করেন, তারপর সমুদ্রতীর বেয়ে এগিয়ে এসে তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ দুটি শহর, টায়ার ও সিডনের পথে অগ্রসর হন। সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসের বিপুল বাহিনী এইবার তাঁর সম্মুখীন হ'ল। কিন্তু ৩৩২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ইসাসের যুদ্ধে তিনি সেই

বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করে টায়ার ও সিডন দখল করলেন। সিডন সহজে আত্মসমর্পণ করেছিল কিন্তু টায়ার শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে বলে টায়ার দখলের পর তিনি শহরটি সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করবার আদেশ দেন। এরপর তিনি অনায়াসে মিশরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সিংহাসনও গ্রীক-সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন।

মিশরে কিছুদিন বাস করে নিজের নামানুসারে তিনি গুটিকতক বড় বড় শহরের পত্তন করলেন। এই শহরগুলি শীগ্‌গিরই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠে রীতিমত প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু মিশরে বৎসর খানেক কাটাবার পরই আবার তিনি পূর্ব্বের দিকে যাত্রা করলেন। এবার তাঁর লক্ষ্য হ'ল ব্যাবিলোন। নিনেভার কাছে আরবেলা নামক একটি স্থানে শেষবার তাঁর দারায়ুসের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধেও পারস্য-সম্রাট হেরে যান। দারায়ুস এই পরাজয়ের পর আর কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা মাত্র না করেই নিজের প্রাণ নিয়ে পালাবার চেষ্টা দেখলেন কিন্তু কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছবার আগেই পথে কে তাঁকে রথের উপরে হত্যা করে গেল।

আরবেলার যুদ্ধে জয়লাভের পর আলেকজান্দারের উন্মত্ত সৈন্যরা আকণ্ঠ মদ্য পান করে দারায়ুসের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে এবং যে যা পারলে লুটে নিলে। এখান থেকে আলেকজান্দার পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন, তারপর সেখান থেকে ফেরবার পথে ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শুনে কৌতূহলী হয়ে খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন। আরবেলার যুদ্ধের পর এতদিন কেউ আর সাহস করে তাঁর জয়যাত্রাকে প্রতিহত করার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করে সিন্ধু নদের তীরে এসে আলেকজান্দার

বা সিকন্দর শাহ্ প্রথম বাধা পেলেন। ভারতবর্ষের অসংখ্য ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে পুরু নামে একজন তাঁর গতিপথ রোধ করে দাঁড়ালেন, আর তাঁকে যদিও শেষ পর্য্যন্ত সিকন্দর শাহের কাছে হার মানতেই হ'ল, তবু তিনি তার আগে গ্রীক সৈন্যদের দস্তুরমত বেগ দিয়েছিলেন।

পুরু বন্দী হয়ে আসার পর আলেকজান্দার তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মগধ পর্য্যন্ত এগিয়ে যাবার, কিন্তু বহুদিন দেশ-ছাড়া তাঁর সৈন্যেরা আর কিছুতেই যেতে চাইল না, অগত্যা তিনি জাহাজে করে সিন্ধুনদের স্রোতোরেখা ধরে নেমে এলেন এবং বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে সুসায় ফিরে গেলেন। তিনি এইবার তাঁর বিপুল সাম্রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন; হয়ত তা সম্ভবও হ'ত, যদি না ৩২৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তাঁর অকাল মৃত্যু হ'ত। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অতবড় সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। তাঁর তিন সেনাপতি তিনটি অংশ দখল করে নিজেদের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। সেলিউকাস নিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের সমস্তটা, মায় সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতের অংশটুকুও; টলেমি নিলেন মিশর, আর এ্যান্টিগোনাস দেশে ফিরে গিয়ে মূল ম্যাসিডোনিয়ার সিংহাসন দখল করেন।

এই সেনাপতিদের মধ্যে টলেমি ছিলেন এ্যারিস্টটলের ছাত্র এবং আলেকজান্দারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি জানতেন যে এ্যারিস্টটলের বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য আলেকজান্দার বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তাই আলেকজান্দার যেটুকু করে যেতে পারেননি, তিনি নিজে সেই কাজের ভার হাতে তুলে নিলেন। আলেকজান্দার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতেই তিনি মিশরের নূতন রাজধানী তৈরি করেন। আর সেই রাজধানীতে তিনি বিজ্ঞান-

চর্চ্চার একটি নিরাপদ ও চিরস্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই কেন্দ্রটিই হ'ল পৃথিবীর প্রথম ম্যুজিয়াম! এই ম্যুজিয়ামে রাজশক্তির আশ্রয়ে ও রাজার অর্থানুকূল্যে যাতে নির্ব্বিঘ্নে পণ্ডিতরা জ্ঞানচর্চ্চা করতে পারেন, তার ব্যবস্থাও টলেমি ভালভাবেই করে দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য টলেমির সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। টলেমি ও তাঁর ছেলে দ্বিতীয় টলেমির রাজত্বকালে এই ম্যুজিয়ামটিকে কেন্দ্র করে কত পণ্ডিত যে কত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীকে দান করে গিয়েছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রথম জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ইউক্লিড, কণিক-শাস্ত্রের আবিষ্কারক আপোলোনিয়াস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এইখানকার বিদ্বজ্জন-সভাকেই অলঙ্কৃত করেছিলেন। এমন কি এখানকার ম্যুজিয়ামের খ্যাতি শুনে একদা সিরাকিউজ থেকে স্বয়ং আর্কিমিডিস্ পর্য্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন।

টলেমি শুধু গবেষণাগারই করেননি, বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধার জন্য বিরাট একটি লাইব্রেরীও স্থাপনা করেছিলেন। যখন কাগজ কী বস্তু তাই জানা ছিল না, ছাপাখানা তো দূরের কথা—একটা বই নকল করাতে গেলে বিপুল অর্থ ব্যয় এবং সময় নষ্ট হ'ত—তখনকার দিনে এ প্রচেষ্টা শুধু প্রশংসার্হই নয়, বিস্ময়করও বটে। এই সময়টাকেই গ্রীকদের নবজাগরণের যুগ বলা যায়, কারণ শুধু আলেকজান্দ্রিয়ায় নয় অন্যান্য অনেক গ্রীক শহরে এই সময়ে পূরোদমে বিজ্ঞানচর্চ্চা শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে সিসিলির সিরাকিউজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এ জ্ঞানচর্চ্চা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমির মৃত্যুর পর পরবর্ত্তী রাজাদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ বা আগ্রহ না থাকাতে মিশরের বিজ্ঞান-সাধনা একরকম বন্ধ হয়েই গেল। আর গ্রীসও উত্তরদেশ থেকে আগত বর্ব্বর 'গল'দের আক্রমণে বিব্রত

হয়ে উঠল। নিজেদের অস্তিত্বটুকু রক্ষা করা যাদের পক্ষে কঠিন তারা শিল্প-বিজ্ঞান-ললিতকলার চর্চ্চা করে কি-করে ?

আরও একটা যে প্রধান কারণে গ্রীসে বা আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার ধারা অক্ষুণ্ণ থাকেনি, তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিতের সঙ্গে জনসাধারণের সমাজিক প্রভেদ। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর এবং যেহেতু বই ছেপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সুবিধা ছিল না, আর জনসাধারণ, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে কিংবা চাষবাস বা মজুরী করে খেত, তাদের সঙ্গে ঐ পণ্ডিতদের মেশবার কোন সুযোগই ছিল না, সেই হেতু সব পণ্ডিতদের অসাধারণ আবিষ্কার বা সিদ্ধান্ত কোনদিনই সাধারণের মনে কোন কৌতূহল জাগ্রত করতে পারেনি। এক সহস্র বৎসর কিংবা আরও পরে মানুষের জ্ঞান-পিপাসু মন আলেকজান্দ্রিয়া বা অন্যান্য শহরের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন লাইব্রেরীর অন্ধকার কক্ষের মধ্যে জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথির পাতা থেকে এই সময়কার জ্ঞানসাধনার ফল টেনে বার করেছিল এবং তাঁরা অতদিন আগেও কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়েছিল, অথচ সমসাময়িক মানুষদের সেই সব বিন্দুমাত্রও চমক লাগাতে পারেনি। আর তা পারেনি বলেই, মানুষের নিত্যকার জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে তা লাগেনি বলেই, মানুষ সহজেই সে কথা ভুলে গিয়েছিল।

মৌর্য্যবংশ ও প্রজাপতি অশোক

আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন মগধ বা বর্ত্তমান বিহারে নন্দবংশ নামক এক রাজবংশ রাজত্ব করছিলেন। কথিত আছে এই বংশেরই এক ছেলে চন্দ্রগুপ্ত পালিয়ে গিয়ে গোপনে

আলেকজান্দারের সেনা-দলে যোগ দেন এবং গ্রীকদের সামরিক বিদ্যা আয়ত্ত করে দেশে ফিরে আসেন। সীমান্ত-প্রদেশের রাজার সাহায্যে তিনি প্রথমে পাঞ্জাব, পরে যুক্তপ্রদেশ ও মগধ অধিকার করেন এবং নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে নিজে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নাম নিয়ে মগধের সিংহাসনে বসেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পরে সেলিউকাসেরও যুদ্ধ হয় আর তার ফলে সেলিউকাসকে ভারতবর্ষের রাজ্যখণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হয়। চন্দ্রগুপ্ত বহুদূর পর্য্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কথিত আছে যে চাণক্য নামে তাঁর যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁরই পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত ঐ অসাধারণ সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন।

মৌর্য্যবংশের দ্বিতীয় সম্রাট, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারকে কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য বলা যায় না। কিন্তু তাঁর ছেলে সম্রাট অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাটদের নামের তালিকায় বোধ করি চিরকালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে থাকবেন। এত বড় রাজা আর এত বড় মানুষ, কোন কালে কোন দেশের সিংহাসনে বসেনি।

অশোকের এ খ্যাতি তাঁর অসংখ্য যুদ্ধ-জয় বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য নয়, যদিও তাঁর সাম্রাজ্য গান্ধার বা আফগানিস্থান থেকে বর্ত্তমান মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোক রাজা হবার পর মাত্র একবারই যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন কলিঙ্গ-রাজের বিরুদ্ধে। সে যুদ্ধে অশোকই জয়লাভ করেন বটে কিন্তু যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এবং শোচনীয় হত্যাকাণ্ড দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করান যে, অকারণে, শুধু রাজ্য-বিস্তারের জন্য, যুদ্ধ আর তিনি করবেন না।

এর কিছুদিন পরেই অশোক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং শীগ্‌গিরই তাঁর নিষ্ঠা ও সংযমের জন্য বৌদ্ধদের মধ্যে অগ্রণী বলে গণ্য হন। আগেই বলেছি যে, তখন

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের শোচনীয় বিকৃতি ঘটেছিল সুতরাং অশোক শুধু নিজেই এই নূতন ধর্ম্ম নিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, প্রজা-সাধারণের কল্যাণের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। অশোকের চেষ্টা ও যত্নে একদিকে সিংহল পর্য্যন্ত এবং ওদিকে ক্রমে সুদূর চীন জাপান এমন কি পারস্য পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করল। তিনি যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যজয় আর করেন নি বটে কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা যে বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন, বিনা রক্তপাতে অতবড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনাও বোধহয় কেউ করতে পারেন নি কোনদিন।

অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অসংখ্য বিহার বা মঠ এবং শিক্ষা প্রচারের জন্য বৌদ্ধ শ্রমণদের অধীনে বহু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বড় বড় রাজপথ তৈরী করিয়ে তার পাশে পাশে ফলের গাছ বসিয়েছিলেন। জলকষ্ট নিবারণের জন্য অসংখ্য কূপ খনন করানো, এবং রাজকীয় তত্ত্বাবধানে ওষধির বাগান রক্ষা করার পরিকল্পনাও বোধ হয় প্রথমে তিনিই করেন। এ ছাড়া অসংখ্য ফল ও ফুলের বাগান তৈরী করিয়েছিলেন প্রজাদের ব্যবহারের জন্য, এ ব্যবস্থাও ঐ প্রথম। আতুরদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়েছিলেন যে কত তার সংখ্যা নেই। অনার্য্য প্রজা এবং স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান, গয়া, সারনাথ, কুশীনগর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় মন্দির এবং স্তূপ নির্ম্মাণ করান; প্রজারা যাতে সর্ব্বদা ধর্ম্মের আদর্শ চোখের সামনে রাখতে পারে সেজন্য বহু শিলালিপি ও তাম্র-শাসন লেখাবারও ব্যবস্থা করেন এবং সেগুলি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করে রেখে দেন। এ ছাড়া ধর্ম্মগ্রন্থগুলির সংস্কারের জন্য এবং ধর্ম্মের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে-সব বিকৃতি দেখা দিয়েছিল তা দূর করবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

কিন্তু অশোকের পর তাঁর আরব্ধ কাজ চালাবার আর কোনও লোক না থাকায় তাঁর মহৎ-কল্পনা সম্পূর্ণ রূপ পাবার আগেই নষ্ট হয়ে গেল। মৌর্য্যবংশে আর একজনও উপযুক্ত রাজা ছিল না, ফলে অশোকের সাম্রাজ্যও শীগ্‌গিরই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। ব্রাহ্মণরা অশোকের সময় অত্যন্ত দ'মে ছিলেন। তাঁরা এইবার সুযোগ পেয়ে একটু একটু করে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম আরও কয়েক শতাব্দী ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সমান গৌরবই অধিকার করে ছিল। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হ'তে হ'তে কদর্য্য হয়ে উঠল, দেশ থেকে তার সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে গেল। আবার হিন্দুধর্ম্ম অদ্বিতীয় হয়ে উঠল—কিন্তু এবার আর ঋষিদের পবিত্রকল্পনা-প্রসূত হিন্দুধর্ম্ম নয়; সহস্র সংস্কারের আবর্জ্জনায় পূর্ণ, জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কতকগুলি ক্ষমতাপ্রিয় লোভী ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানে জর্জ্জরিত হিন্দুধর্ম্ম !

বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে টিক্‌ল না বটে কিন্তু তাতে অশোকের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আজও সারা পৃথিবীর লোক এই অদ্ভুত শক্তিশালী, অদ্বিতীয় রাজর্ষির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। অশোকের পর দিগ্বিজয়ী বীর অনেকে সম্রাট হয়েছেন বটে কিন্তু রাজার এতগুলি গুণের অধিকারী তাঁদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। ভারতের ইতিহাস বড় করুণ ইতিহাস; অন্তর্ব্বিরোধ, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাচারের এই কলঙ্কিত ইতিহাসের মধ্যে অশোকের রাজত্বকালের ক'টি বৎসর ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল, ভাস্বর ও অদ্বিতীয় হয়ে থাক্‌বে।

চীনের ধর্ম্মগুরু

চীনের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ব্বেই কিছু বলেছি। এবার তাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা কিছু বলা দরকার। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন চীনে পৌঁছল তখন সেখানে যে দু'জন ধর্ম্মগুরুর বাণী বা উপদেশ সাধারণের মধ্যে পূজা পাচ্ছিল তা হচ্ছে কন্‌ফ্যুসিয়াস ও লাও-ৎসির। এঁরা দু'জনেই হলেন খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ প্রায় বুদ্ধের সমসাময়িক। তার আগে এদের মধ্যে যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তা অন্যান্য আদিম সভ্য দেশেরই অনুরূপ। অসংখ্য দেবতা বা উপদেবতার উদ্দেশে বলি ও নানারকম পূজা, এই ছিল সে ধর্ম্মাচরণের মোটামুটি কথা। পুরোহিতরা ছিলেন খানিকটা পূজারী ও খানিকটা ভবিষ্যদ্বক্তা, আর সম্রাটেরা ছিলেন সকলের ওপরে, ঈশ্বর-পুত্র।

কন্‌ফ্যুসিয়াস যখন জন্ম-গ্রহণ করেন তখন চৌ-বংশের অন্তিম অবস্থা। অসংখ্য, প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার, ছোট ছোট রাজ্য এবং গুটিকতক ছোট ছোট সাম্রাজ্য তখন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনবরত পরস্পরের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে; সে বিরোধের ফলে সাধারণের জীবন বিড়ম্বিত, ক্ষতবিক্ষত। দেশের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে চীনের মহামানব আচার্য্য কন্‌ফ্যুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে এবং নিজেও পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। হয়ত তাঁর জীবন সুখেই কাটাতে পারতেন, মানুষের জীবন নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাঁর চলত। কিন্তু যে মহৎ ব্রত নিয়ে তিনি জন্মেছেন তার প্রেরণা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই চঞ্চল করে তুলল। তিনি দেশের অরাজকতা ও অনাচার দেখে ব্যথিত হয়ে উঠলেন এবং একাগ্রমনে সেই অনাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে প্রত্যেক

মানুষ যদি তার জীবনের সামনে মহৎ আদর্শকে রেখে চিত্তসংযম এবং স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করে, তাহ'লে দেশের যা কিছু অমঙ্গল অচিরে দূর হয়ে যাবে। পবিত্র ও সংযত আদর্শে মানুষ গড়ে উঠলে মানুষের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রও ভাল হ'তে বাধ্য। তখন কন্‌ফ্যুসিয়াসের যা শিক্ষা তা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা ও মনুষ্য-জীবনের মহত্তর পরিণতির শিক্ষা। তিনি পরকালের কথা রেখে ইহকালের জীবনযাত্রার কথাই বেশী করে বলেছেন, জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিকে কঠিন নিয়মে বেঁধে দিয়ে গেছেন।

এই সুকঠোর চিত্তশুদ্ধির শিক্ষা, নিয়মের অনুশাসনে বাঁধা সুসংযত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার শিক্ষা, মানুষ যে সহজে গ্রহণ করেনি তা বলাই বাহুল্য। কন্‌ফ্যুসিয়াস এক দেশ থেকে দেশান্তরে, এক রাজার সভা থেকে অপর রাজসভায় বৃথাই ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁর বাণী বহন করে, এমন একজন শক্তিমান্ শিষ্যও তিনি পাননি যার দ্বারা সহজে সে বাণী প্রচারিত হয়। পরিণত বয়সে তিনি যখন মারা যান তখন মনে সেই ক্ষোভ নিয়েই তিনি অপর লোকে যাত্রা করেন—পারলুম না, কিছুই করতে পারলুম না মানুষের! কিন্তু যা সত্য তা নাকি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, তাই কন্‌ফ্যুসিয়াসের উপদেশও নষ্ট হয়নি, চীনের লোকেরা ক্রমে ক্রমে তাকে গ্রহণ করলে, নিজেদের জীবনে তাকে প্রতিফলিত করে তার মহত্ত্ব সপ্রমাণ করলে। যে আদর্শ ব্যর্থ হ'ল মনে করে বৃদ্ধ কন্‌ফ্যুসিয়াসের পরিতাপের সীমা ছিল না, এমন দিনও এল যে সমগ্র উত্তর চীনের সমস্ত লোক সেই আদর্শকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সত্য বলে মেনে নিলে!

লাও-ৎসির শিক্ষা কিন্তু কন্‌ফ্যুসিয়াসের মত সরল এবং সহজ শিক্ষা নয়। চৌ-রাজদের এই ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাগারিকও মানুষের দুঃখ দূর করবার উদ্দেশ্যেই তাঁর মত প্রচার করতে শুরু করেন।

কিন্তু সে ধর্ম্মমত শুধু সুনির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রার উপদেশ নয়, তা জটিল তা পারলৌকিক রহস্যের সঙ্গে জড়িত। সেইজন্যই, যদিও দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ লোকই তাঁর শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেছিল, তবু তা শীগ্‌গিরই বিকৃত এবং নানা কুসংস্কার ও ভ্রষ্টাচারে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাও-বাদীরা (লাও-ৎসির মতাবলম্বীরা) শেষ যুগের বৌদ্ধদের মতই তাদের সুসংস্কৃত ধর্ম্মমতকে মন্দির, সন্ন্যাসী, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি রহস্যময় জটিলতার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাওবাদ, পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্ম (যা একটা চীনের প্রধান ধর্ম্ম হয়ে উঠেছিল) এবং নবাগত ক্রীশ্চান ধর্ম্ম, এই তিনটি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রবল বন্যার পরেও আজ পর্য্যন্ত কন্‌ফ্যুসিয়াসের আদর্শ প্রত্যেক চীনবাসীর অন্তরে একটি অটল শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোম সাম্রাজ্যের পুরাবৃত্ত

রোম! পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে এই নামটি কি অচ্ছেদ্য বন্ধনেই না জড়িয়ে আছে! সেই রোম—একদা 'কাঁপিত প্রতাপে যার মহী-সিন্ধু-ব্যোম!' গর্ব্বান্ধ মানুষকে শিক্ষা দেবার সময় কবি যার কথা উল্লেখ করে সাবধান করে দিয়েছেন, 'কিবা ছিল রোমরাজ্য, এখন কোথায়?' সেই রোমের কথাই এবার বলব।

রোম শহরটা যে ইটালীতে তা বোধ হয় সকলকারই জানা আছে। এই উপদ্বীপটি বহুদিন পর্য্যন্ত, এখন থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্য্যন্ত, বলতে গেলে জঙ্গল হয়েই পড়ে ছিল। সামান্য দু'একটি বসতি এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল—এই মাত্র। এরপর আর্য্যদের একদল উত্তর দিকটায় কিছু কিছু বসবাস শুরু করলে, দক্ষিণ দিকেও ছোট ছোট গ্রীক জনপদ গড়ে উঠল, কিন্তু আসল দেশটায় আর্য্যরা হাত দিতে পারল না। এট্রুস্কান জাতি বলা হয় যাদের—মানে, ঠিক আর্য্যও নয়, অথচ অনার্য্য বলতে আমরা যা বুঝি তাও নয়—এমনি এক শ্রেণীর লোকই উপদ্বীপটি জুড়ে বাস করছিল; এবং অন্যান্য সব জায়গাতে যেমন আর্য্যরাই অনার্য্যদের জয় করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছিল এখানে তার উলটোই ঘটল। এট্রুস্কানরাই ছোটখাট আর্য্যদলগুলিকে পরাজিত এবং অধীনস্থ করে নিলে। আমরা যখন থেকে রোমের খবর পাই, তখনকার ইতিহাস খোঁজ করলে দেখা যায়, এট্রুস্কান রাজাদের অধীনে কতকগুলি এক ভাষা-ভাষী (লাটিন বলত ওরা) অথচ বিভিন্ন দলের মানুষ টাইবার নদীর ধারে বাণিজ্য-ঘাঁটির মত সামান্য একটা শহর পত্তন করে বাস করতে শুরু করেছে। সে বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী কিংবা আরও আগের কথা।

কিন্তু ঐ এট্রুস্কান রাজাদের অধীনে রোমের লোকেরা বেশী দিন রইল না। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে তাদের তাড়িয়ে রোমে সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। কিন্তু সে সাধারণ-তন্ত্র ঠিক জনসাধারণের গঠিত শাসন-তন্ত্র নয়, কতকটা গ্রীসের মতই বড়লোকদের সাধারণ-তন্ত্র। যাঁরা শাসন করতেন তাঁদের বলা হ'ত প্যাট্রিসিয়ান্ আর সাধারণ প্রজাদের বলা হ'ত প্লিবিয়ান। বলা বাহুল্য যে, প্লিবিয়ানরা এ ব্যবস্থাটা কখনই ঠিক প্রাণের সঙ্গে অনুমোদন করেনি, সুতরাং বহুকাল ধরে দুই দলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ চলবার পর খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায়। প্লিবিয়ানদেরও প্যাট্রিসিয়ানদের মত শাসনতন্ত্রে অধিকার থাকবে, এই সাব্যস্ত হ'ল।

ইতিমধ্যেই কিন্তু রোমানরা রোমের বাইরেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। তাদের প্রথম লক্ষ্য হ'ল এট্রুস্কানদের নির্ম্মূল করা, কিন্তু বহুদিন ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রথমটা তা পারেনি। যাই হোক—শেষ পর্য্যন্ত ওদের 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' হ'ল—উত্তর দেশ থেকে দুর্দ্দান্ত গল্‌রা এসে এট্রুস্কানদের দোরে দিলে হানা, ওদের ত হারালেই, রোমের দোরগোড়া পর্য্যন্ত এসে অনেকদিন ধরে ওদের নাস্তানাবুদ করে আবার একদিন চলে গেল। কিন্তু রোমের তাতে কোন অসুবিধাই হ'ল না, বরং এই বিপদের সুযোগ নিয়ে গল্‌দের আক্রমণের ধাক্কা সামলাবার আগেই ওরা এট্রুস্কানদের ওপর চড়াও হ'ল। এবারের আঘাত আর এট্রুস্কানরা সামলাতে পারলে না, হেরে ত গেলই রোমানদের কাছে, কিছুদিনের মধ্যেই ওরা এমন ভাবে বিজয়ীদের সঙ্গে মিশে গেল যে এট্রুস্কানদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রইল না।

এই হ'ল রোমের রাজ্য-বিস্তারের সূত্রপাত। তখনই ওরা কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি, উত্তরে গল্‌রা ছিলই, দক্ষিণেও খুব

নিরাপদ ছিল না; ছোট ছোট যে সব গ্রীক জনপদগুলি গড়ে উঠেছিল তারা রোমের এই রাজ্যবিস্তারে খুব যে খুশী হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য। তারা গোলমাল শুরু করলে। আর তাদের সে গোলমালে ইন্ধন জোগানোর লোকের অভাব হ'ল না।

তখন আলেকজান্দার মারা গেছেন, আর তাঁর বিপুল সাম্রাজ্য কতকগুলি 'শবলুব্ধ গৃধ্র' সেনানায়ক মিলে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন, পাইরাস তাঁর নাম, তখনও সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন ছাড়তে পারেন নি, তিনিই দলবল নিয়ে রোমানদের রাজ্য আক্রমণ করলেন। দক্ষিণের ছোট ছোট গ্রীক জনপদগুলিও তাঁকে সাহায্য করলে; পাইরাসের ইচ্ছা ছিল বোধহয় যে, ওদের সাহায্যে বড় রাজ্যখণ্ডটি হস্তগত করে নিয়ে শেষে ওগুলিও উদরসাৎ করবেন। পাইরাসের সেদিকে জোরও ছিল খুব; তাঁর সৈন্যরা শিক্ষিত, রণসজ্জাও প্রচুর—তিনি মনের আনন্দে রোম আক্রমণ করলেন এবং উপর্য্যুপরি দুটি যুদ্ধেই (২৮০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ) ওদের হারিয়ে দিলেন।

রোমানরা, সত্য কথা বলতে কি, গল্‌দেরই ভয় করেছিল বেশী। তাই উত্তর দিক থেকে আত্মরক্ষা করার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছিল। সেদিকে এমনভাবে দুর্গ পরিখা প্রভৃতি তৈরী করেছিল যে সেখান দিয়ে কারুর আসা খুবই শক্ত। কিন্তু বিপদটা এল দক্ষিণ দিক থেকেই, আর সে বড় সোজা বিপদ নয়। পাইরাস দুটি বড় যুদ্ধে ওদের রীতিমত দমিয়ে দিয়ে একেবারে সেই উত্তর দিকে কোণ-ঠাসা করে ফেললেন এবং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে সিসিলি জয়ে মন দিলেন।

কিন্তু দৈব রোমানদের সহায়। কার্থেজের লোকেরা (কার্থেজ ছিল ফিনিসিয়ান বণিকদের প্রধান ঘাঁটি, তখনকার দিনে কার্থেজের মত শহর খুব অল্পই ছিল) পাইরাসের এই হঠাৎ বড়লোক হওয়াটা

৭

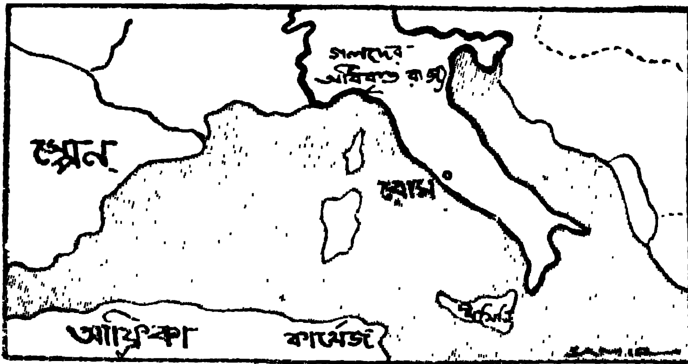
আদৌ পছন্দ করলে না। কারণ ব্যাপারটা তাদের খুবই কাছাকাছি, পাইরাসকে ক্ষমতা বিস্তার করতে দিলে তিনি যে সহজে থামবেন না, তা তারা জানত। তারা একদল লোক পাঠালে রোমানদের সাহায্য করতে এবং এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যের ফলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আবার পাইরাসকে ধরলে চেপে। অন্য যেখান থেকে পাইরাস সাহায্য আশা করেছিলেন, তাও যাতে না পৌঁছয় সেই জন্যে কার্থেজিনিয়ানরা জলপথ পাহারা দিতে লাগল ; এধার থেকে সাহায্য বন্ধ হ'ল আর ওধার থেকে রোমানরা করলে আক্রমণ, পাইরাস সে ধাক্কা সামলাতে পারলেন না, নেপ্‌ল্‌স্‌-এর কাছাকাছি একটা জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হয়ে পাইরাস ভীষণ ভাবে হেরে গেলেন।

শুধু তাই নয়—বিপদের ওপর বিপদ এসে পাইরাসকে জখম করলে! ডাঙায় রোমানরা আর জলে কার্থেজিনিয়ান—এই দুটিকে সামলাতেই বেচারার প্রাণান্ত হচ্ছিল, তার ওপর আবার খবর এসে পৌঁছল, গল্‌রা এসে তাঁর নিজের দেশে হানা দিয়েছে! ইটালীর মধ্যে দিয়ে আসা কষ্টকর দেখে ওরা বর্ত্তমান আলবানিয়ার পথ দিয়ে এসে পাইরাসের দেশ এপিরাস আক্রমণ করেছে। অগত্যা পাইরাসকে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ছাড়তে হ'ল, তিনি চিরকালের মত ইতালী ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন।

কার্থেজের পতন

এইবার আবার রোমানরা একটু একটু করে হাত-পা ছড়াতে শুরু করলে কিন্তু প্রথম মুখেই একটা বিঘ্ন দেখা দিলে। রোম রাজ্যের ধারে মেসিনা বলে একরত্তি একটা গ্রীক শহর ছিল। একদল জলদস্যু হঠাৎ একদিন ঐ শহরটি করলে দখল, আর

তাদেরই রক্ষা করতে এসে কার্থেজের লোকেরা জলদস্যুদের তাড়িয়ে মেসিনাতে একদল সৈন্য রেখে চলে গেল। জলদস্যুরা এই ব্যাপারে মর্ম্মান্তিক চটে গিয়ে প্রতিশোধ-বাসনায় রোমানদের দ্বারস্থ হ'ল। রোমও বোধহয় তখন কার্থেজের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য একটা ছুতো খুঁজছিল, তারা এক কথাতেই ওদের অভয় দিয়ে বসল। তখনকার দিনে কাজটা খুবই দুঃসাহসের হয়েছিল সন্দেহ নেই, কারণ কার্থেজের শক্তি তখন প্রচণ্ড, জবর-দস্ত্! কিন্তু রোমানরা তা'তে দমল না। তারাই গায়ে পড়ে কার্থেজকে করলে আক্রমণ।



রোম ও কার্থেজের মধ্যে এই যুদ্ধ বহুদিন ধরে চলেছিল। মধ্যে বছর কতক করে ফাঁক, আবার দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ, এই ভাবে তিন দফায় তবে যুদ্ধের শেষ হয়। এই যুদ্ধগুলিই ইতিহাসে পিউনিক যুদ্ধ বলে বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হ'ল ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে। জলদস্যুদের অভয় দেওয়ার উপলক্ষ্যেই যুদ্ধটা বাধল বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, রোমানদের তার জন্য কোন মাথাব্যথা নেই, তারা নিজেরাই সিসিলি দ্বীপটা দখল করতে চায়। অবশ্য কাজটা অত

সহজ নয়; সেটার জন্য সমুদ্র পেরিয়ে আসা দরকার আর সমুদ্রে তখন কার্থেজের নৌ-বহরই প্রবল। তখনকার দিনে কার্থেজের জাহাজগুলোই ছিল সবচেয়ে বড় এবং অসংখ্য। রোমানদের ত নৌবহর ছিল না বললেই হয়। কিন্তু যে জাতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তাদের উদ্যমও বেড়ে ওঠে আশ্চর্য্য রকম। রোমানরা বলতে গেলে ওদেরই একটা ভাঙা জাহাজ দেখে, রাতারাতি জাহাজ তৈরি করতে শুরু করলে এবং নিজেরা জাহাজ চালাবার কৌশলটা ভাল রকম জানত না বলে গ্রীক নাবিকদের মোটা মাইনের লোভ দেখিয়ে ডেকে আনলে।

শুরু হ'ল লড়াই। কার্থেজের জাহাজগুলো প্রথম রোমানদের জাহাজ দেখে একটু হাসলে। ভাবলে যে, এদের ঠাণ্ডা করতে কতটুকুই বা সময় লাগবে। কারণ ওদের জাহাজের বিপুল আয়তনের তুলনায় রোমের জাহাজগুলোকে ভেলার মতই দেখাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করতে নেমে দেখা গেল যে, সব সময়ে বড় চেহারাটাই কাজে লাগে না; রোমের জাহাজগুলোকে চেপে গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কার্থেজের জাহাজগুলো যেমন এগিয়ে গেল, রোমানরা একরকম লোহার আঁকশি ওদের জাহাজে আটকে টপাটপ উঠে পড়ল এবং হাতাহাতি যুদ্ধ করে ওদের অনায়াসে হারিয়ে দিলে। এর অনেক দিন পরে, বহু শতাব্দী পরে, স্পেনের নৌবহর ঠিক এই ভুলই করেছিল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়, এবং তাদেরও ঠিক এই ভাবেই লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছিল। তবুও মানুষ বার বার ভুলে যায় যে, সংখ্যা নয়, আয়তন নয়, যুদ্ধে যা জয়ী হয় তা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি, তার প্রতিভা!

২৬০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে এবং তার চার বছর পরে, দুটি বড় বড় যুদ্ধেই কার্থেজীনিয়ানরা সাংঘাতিক ভাবে হেরে গেল। তারপরও যদিবা



প্রাচীন মিশরের লিখন-পদ্ধতি



হানিবল

কোনমতে ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় রোমানদের ঠেকিয়ে রেখেছিল, শেষপর্য্যন্ত ইগাটিয়ান দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে কার্থেজের শেষ নৌবহরটি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে যেতে আর মাথা তুলতে পারলে না। সাইরাকিউজের ছোট্ট রাজ্যখণ্ডটি ছাড়া সমস্ত সিসিলি রোমানদের ছেড়ে দিয়ে ওদের সন্ধি করতে হ'ল।

এর পর বাইশ বছর উভয় পক্ষই চুপচাপ ছিল। তার একটা কারণ হ'ল এই যে ওধারে গল্‌দের সঙ্গে আবার রোমের একটু গণ্ডগোল বেধেছিল। যাই হোক্ সে গণ্ডগোল একটু থামতেই রোমানরা আবার এমন অত্যাচার শুরু করলে কার্থেজের ওপর যে, মরামানুষেরও অসহ্য বোধ হয়। কার্থেজিনিয়ানরাও আর সহ্য করতে পারলে না, হানিবল নামক এক তরুণ সেনাপতির অধিনায়কত্বে আবার যুদ্ধযাত্রা করলে। তখন স্পেন কার্থেজের অধীন ছিল, হানিবল সেই স্পেনের পথেই রোমানদের তদানীন্তন সীমানা লঙ্ঘন করে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত ডিঙিয়ে পথে গল্‌দের সঙ্গে সন্ধি করে একেবারে ইটালীর দোরে গিয়ে হানা দিলেন।

হানিবল ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ বীর এবং সুনিপুণ সেনানায়ক; পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন বিখ্যাত সেনানায়কের সঙ্গেই একত্রে ওঁর নাম করা যায়। আজও লোকে বিখ্যাত সেনাপতিদের নাম করতে গেলে জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়নের সঙ্গে হানিবলের নাম করে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, এবারে রোমানদের বিপদটা বড় কম বাধল না। মাঠে লাঙ্গল চযলে ঘাসগুলোর যেমন অবস্থা হয়, হানিবল যেখানে গেলেন রোমান সৈন্যদেরও ঠিক সেই অবস্থা হ'ল। একটার পর একটা যুদ্ধে হানিবল জিততে লাগলেন; রোমানদের মধ্যে দিকে দিকে এই বার্ত্তা প্রচারিত হয়ে গেল যে, হানিবলের হাতে এবার আর কারুর রক্ষা নেই, লোকটা সাক্ষাৎ মৃত্যু!

কিন্তু হানিবল যখন বিজয়গর্ব্বে ওদের রাজধানী রোমের দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করবার জন্য একদল রোমান পিছন থেকে ওঁকে আক্রমণ করলে এবং স্পেনের সঙ্গে ওঁর দলের যোগসূত্র ছিন্ন করে দিলে। এধারে যখন এই বিপদ তখন দেশ থেকে সংবাদ এল যে সেখানে নুমিডিয়ার লোকেরা বিদ্রোহ করেছে, সেখানকার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। অগত্যা হানিবলকে ফিরে আসতে হ'ল। কিন্তু রোমানরাও এ সুযোগ ছাড়লে না, তারাও পেছনে পেছনে তেড়ে এসে সাগর ডিঙিয়ে আফ্রিকায় পৌঁছল এবং কার্থেজ আক্রমণ করলে। নুমিডিয়ার বিদ্রোহী প্রজারাও রোমানদের সঙ্গে যোগ দিলে; মিলিত এই দুই বাহিনীর হাতেই বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতি হানিবলের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ পরাজয় ঘটল।

বলা বাহুল্য এর পর আর কার্থেজের যুদ্ধ করবার উৎসাহ রইল না, অত্যন্ত অপমানকর সর্ত্তে রোমের সঙ্গে সন্ধি করতে হ'ল। স্পেনের সমস্তটাই রোমকে ছেড়ে দিতে হ'ল, সামান্য খানকতক ছোট ছোট জাহাজ ছাড়া সমস্ত নৌবহর ওদের হাতে চলে গেল এবং তা ছাড়াও বিপুল টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, আরও লিখে দিতে হ'ল যে, রোমের বিনা অনুমতিতে কার্থেজ আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগ দিতে পারবে না এবং হানিবলকে রোমানদের হাতে সঁপে দিতে হবে।

সব সর্ত্তেই কার্থেজকে রাজী হ'তে হ'ল, কারণ আর উপায়ও কিছু ছিল না। কিন্তু শেষের এই সবচেয়ে বড় অপমান থেকে হানিবলই কার্থেজকে বাঁচালেন, তিনি গোপনে এশিয়ায় পালিয়ে গেলেন। অবশ্য তাতেও বিশেষ সুবিধা হ'ল না, রোমানদের প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বেচারীকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যাই করতে হ'ল! এমনই হয় বোধহয়! বহু লক্ষ লোকের

প্রাণনাশের ফলে যে সব বড় সেনাপতিদের খ্যাতি গড়ে ওঠে, শেষ পরিণাম বোধহয় তাদের সকলেরই এই রকম। হানিবল বিষ খেলেন, সিজার বন্ধুদের হাতে নিহত হলেন এবং নেপোলিয়ানকে সেণ্টহেলেনার কারাগারে অন্তিম নিশ্বাস ফেলতে হ'ল।

এর পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল দুই পক্ষই শান্ত ছিল। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ধাক্কা সামলাতেই কার্থেজের তখন প্রাণান্ত হচ্ছিল, তা ছাড়া ওর তখন ডানাকাটা পাখীর অবস্থা, কোন সম্বলই নেই। রোমও এই অবসরে অন্যদিকে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল; 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' গ্রীস অধিকার ক'রে, এশিয়া মাইনর দিয়ে এসে লিডিয়া জয় ক'রে, মিশরে এসে টলেমিদের দোরে হানা দিলে এবং ঐসব দুর্ব্বল রাজ্যগুলিকে 'আশ্রিত রাজ্য' আখ্যা দিয়ে অভয় দিলে। অর্থাৎ একেবারে গ্রাস করা হ'ল না, শুধু চারে রাখা হ'ল।

এধারে কার্থেজ আবার একটু একটু করে মাথা তুলতে শুরু করেছিল। কিন্তু রোমানরা এবার ওদের অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেবার সংকল্প করলে, এবং হানিবলের পতনের প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর পরে আবার কার্থেজ আক্রমণ করলে। কার্থেজ বহুদিন ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঐ ক'টি লোক, সহায়-সম্বল-হীন, তারা আর কতদিন রোমের অজেয় বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবে? শেষ পর্য্যন্ত আত্ম-সমর্পণ করতেই হ'ল। এর পরে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চলল তার বর্ণনা না করাই ভাল; ঐ হত্যাকাণ্ডের পরও শেষ পর্য্যন্ত যে ক'টি লোক বেঁচে ছিল তাদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রী করে দেওয়া হ'ল এবং সমস্ত শহরটি পুড়িয়ে, ভেঙে, শেষ অবধি চষে সমভূম করে দেওয়া হ'ল। এই শেষ যুদ্ধই তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই কার্থেজের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল। শুধু কার্থেজ কেন, বলতে গেলে সমস্ত সেমিটিক জাতিগুলিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, শুধু শিব-

রাত্রির সল্‌তের মত এক কোণে টিকে রইল জুডিয়া, তাদের বাইবেল আর তাদের সংস্কার নিয়ে। এককালে যে সেমিটিক জাতির কয়েকটি দল পৃথিবীর ঐ বিশেষ অংশে তাদের প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করেছিল, তার সাক্ষ্য-স্বরূপ আজ মাত্র ঐ কয়েকটি ইহুদীই পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছে—যদিও জুডিয়ার রাজ্য তারা বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি, রোমানদের হাতেই শেষ অবধি সঁপে দিতে হয়েছিল।

জুলিয়াস সিজার

রোমের শাসনব্যবস্থা যে কতকটা সাধারণ-তন্ত্র ছিল, তা আগেই বলেছি। কিন্তু সেটা গোড়াতে শুধু অভিজাত সম্প্রদায়েরই মিলিত শাসনতন্ত্র ছিল, পরে অনেক ঝগড়াঝাঁটির পর তা'তে প্রজা-সাধারণকেও যোগ দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা হওয়ার পর সত্য-সত্যই কিছুদিন ধরে ওদের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকটি প্রজার যোগ ছিল। কিন্তু সেটা বেশীদিন থাকা সম্ভব হ'ল না। রোমের রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ও ব্যবস্থা অচল হয়ে উঠল। কেন তাই বলছি।

ওদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল নাগরিক, একটি নগরকে কেন্দ্র ক'রে ছোট একটি রাষ্ট্র; যেমন গ্রীকদের ছিল, ছোট ছোট নগর আর তার পাশে খানিকটা পর্য্যন্ত চাষবাসের জমি নিয়ে এক একটি রাষ্ট্র। তাদের এ ব্যবস্থায় অসুবিধা হয় নি। কারণ গ্রীকদের লোকসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সংখ্যাও বেড়েছিল, কোন এক বিশেষ রাজ্য আয়তনে বাড়েনি। ওরা কোন দিনই একত্রে, একটা রাষ্ট্রতন্ত্রের শাসনাধীনে বাস করতে রাজী হয়নি। রোমানদের ব্যাপারটা হ'ল কিন্তু অন্যরকম ওদের ঐ বিশেষ নাগরিক রাষ্ট্রটিই

চারিদিকে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল, এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে অনবরতই প্রজার সংখ্যা বেড়ে চলল।

এতে অসুবিধা হ'ল ঢের। রোমানদের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য সভা ছিল দুটি। এক হ'ল সেনেট, অপেক্ষাকৃত ধনী ক্ষমতাবান এবং বীরদের দিয়ে ঐ সভাটি গঠিত; আর একটি হ'ল নিতান্তই প্রজা-সভা, তা'তে রোমের সমস্ত নাগরিকই যোগ দেবেন এবং রাজ্যশাসনের ব্যবস্থায় মতামত জানাবেন এই ছিল নিয়ম। এই সভা প্রয়োজনমত আহ্বানের অধিকার থাকত কনসাল বা সেনসার অর্থাৎ লাটসাহেব-জাতীয় কর্ম্মচারীদের হাতে। ব্যবস্থাটা কতকটা বিলাতের বর্ত্তমান পার্লামেন্টের মত, না? যেমন জমিদারসভা বা হাউস্ অব্ লর্ডস্, আর প্রজাসভা বা হাউস্ অব্ কমন্স্। কিন্তু সে দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও দুটোর মধ্যে মস্ত একটা তফাৎ রয়ে গেছে। বিলেতের প্রজাসভার সদস্যরা সমস্ত প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির সভা, আর রোমানদের প্রজাসভা ছিল সমস্ত প্রজাদের সভা। এ ব্যবস্থায় ততদিন কোন অসুবিধাই হয় নি, যতদিন রোমের রাজ্যসীমানা ছিল রোম থেকে কুড়ি মাইলের মধ্যেই, কিন্তু যখন দিক হ'তে দিগন্তরে এগিয়ে গেল রোমের বিজয়-বাহিনী, একটার পর একটা দেশ হ'ল ওদের পদানত তখনই বাধল বিপদ। রোমানরা ওদের সকলকেই নাগরিক অধিকার দিল বটে কিন্তু রোমের সাধারণ প্রজাসভায় উপস্থিত হয়ে সে অধিকারটা সাব্যস্ত করে কে? তখনকার দিনে সুদূর এশিয়া-মাইনর কিংবা আফ্রিকা এমন কি স্পেন বা উত্তর ইটালী থেকেও রোমের প্রজাসভায় ভোট দেবার জন্য আসবে এমন কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। কাজেই এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল—তাই ফলল; অর্থাৎ প্রজাসভা রইল নামেই। সাধারণের

ভোট নেবার একটা প্রহসন মাত্র চলতে লাগল, প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা হয়ে উঠল সেনেটই।

অথচ নির্ব্বাচিত-প্রতিনিধি-মূলক শাসনতন্ত্রের কথাটা রোমের লোকেরা ভাবতেও পারলে না! এইখানে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথাটা তুললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের লোকেরা করতে পেরেছিল। 'পঞ্চায়েৎ' এখন আমরা যাকে বলি, নির্ব্বাচিত পাঁচজন প্রধান দিয়ে গঠিত শাসন-ব্যবস্থা, এ বস্তুটি এখানে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছিল। খুব সম্ভব আর্য্যরা এদেশে আসবার পরই এই ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠে, তবে দ্রবিড়দের মধ্যেও গ্রামে গ্রামে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয়। প্রত্যেক গ্রাম বা প্রত্যেক নগর ঐ সব পঞ্চায়েৎরা শাসন করত এবং যুদ্ধবিগ্রহ বা পররাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যখন রাজা বা দলপতি বা সমাজপতি বা ঐ রকম কাউকে খাড়া করা দরকার হয়ে পড়ল, তখনও বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ রাজা বা দলপতি নির্ব্বাচিতই হ'তেন। তাঁকে সর্ব্বদা প্রজাসাধারণের অনুমোদিত আইন মেনে চলতে হ'ত এবং অন্যায় আচরণ করলে তারা তাঁকে সরিয়ে দিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না। এর উদাহরণ আমরা রামায়ণ মহাভারতের যুগে ভূরি ভূরি পাই। তারপর যখন রাজাদের একাধিপত্য একটু একটু করে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখনও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ভার ছিল ঐ সব পঞ্চায়েৎ বা প্রতিনিধি-সভার ওপরই। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আমলে ত পাটলীপুত্রে রীতিমত পৌরসভা বা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখতে পাই!

তা ছাড়া, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে সেদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু রাজাকেই ধর্ম্মের অনুশাসন, জ্ঞানী বা পণ্ডিতদের

লিখিত বিধান কিছু কিছু মেনে চলতে হ'ত। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁরা কখনই পান নি! আর তা পান নি বলেই বোধহয় ওধারে যখন ব্যাবিলোন, মিশর, পারস্য, কার্থেজ প্রভৃতির প্রাচীন সভ্যতা একে একে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাচ্ছে, তখন ভারতবর্ষের লোকেরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে দ্রুত এবং স্থায়ী উন্নতি করে চলেছে। তারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করছে জ্যামিতির সাহায্যে, উচ্চস্তরের অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করছে বীজগণিতে, এবং মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করে দেশের ঐশ্বর্য্যসম্ভার বাড়িয়ে তুলছে! কার্থেজের আজ চিহ্ন নেই, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়ে আজও সারা পৃথিবীর লোক জ্ঞানসঞ্চয় করছে। যে সময় সম্রাট অশোকের দূত, পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র ডিঙিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে শান্তির বাণী, জ্ঞানের বাণী, ধর্ম্মের বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই রোম আর কার্থেজ পরস্পরকে যেন মরণ-কামড়ে আঁকড়ে ধরেছে: দিগ্বিজয়ের নামে বীভৎস মৃত্যু বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে।

রোমের সাধারণতন্ত্র অচল হওয়ার আরও একটা কারণ জন্মাল ঐ রাজ্যবিস্তার থেকেই। আগে সবাই ছিল স্বাধীন, সকলেই চাষবাস করে খেত। যুদ্ধের সময় দরকার হ'লে সকলেই অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধে যেত, আবার লড়াই থেমে গেলে ফিরে এসে চাষবাস শুরু করত। কিন্তু আত্মরক্ষার যুদ্ধ থেমে গিয়ে যখন রাজ্যবিস্তারের যুদ্ধ শুরু হ'ল তখনই বাধল গোলমাল। বিজিত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য এল, এল অসংখ্য ক্রীতদাস। সেগুলো যাদের ভাগে বেশী পড়েছিল, তারা যুদ্ধে গেলেও এধারে তাদের কোন ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু সাধারণ লোকে ঘরসংসার ছেড়ে বহুদিন ধরে বিদেশে যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত। আর

ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটু আরামপ্রিয়ও হয়ে উঠল বোধহয়— তারা শেষ পর্য্যন্ত 'বেগার' দিতে অস্বীকার করলে। তাই নুমিডিয়ার রাজা জুগার্থা যখন রোমানদের আধিপত্যর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তখন রোমকে দস্তুর-মত বেগ পেতে হ'ল। অবশেষে তারা দিশে না পেয়ে মেরিয়াস নামক একজন সেনাপতিকে ডেকে কন্‌সাল করে দিলে এবং তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দিলে ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য। এই মেরিয়াসই প্রথম রোমে মাইনে-করা সৈন্যের প্রচলন করলেন।

এতে তাঁর সুবিধা হ'ল ঢের, কারণ মাইনে-করা সৈন্যদের ওপর জুলুম চলে বেশী, কাজও পাওয়া যায় ভাল। তাদের তিনি শীগ্‌গিরই শিখিয়ে তৈরী করে নিলেন এবং ভূমধ্যসাগর ডিঙিয়ে আফ্রিকায় গিয়ে নুমিডিয়ার বাহিনীকে হারিয়ে জুগার্থাকে বন্দী করে রোমে নিয়ে এলেন। তাঁর কাজ ফুরোল বটে কিন্তু তিনি আর তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না; সৈন্যেরা তাঁর হাতে, তাঁর যথেচ্ছাচারকে বাধা দেবে কে?

প্রকৃতপক্ষে এর পর থেকেই শাসনক্ষমতা সেনেটের হাত থেকে বেরিয়ে সেনাপতিদের হাতে চলে গেল। বড় সেনানায়করাই ভাগাভাগি করে শাসন করতেন। এই ভাবে যেতে যেতে সহসা দেখা গেল একজন সেনানায়ক তাঁর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে নিজে সমস্ত রোমসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র এবং অদ্বিতীয় অধিনায়ক হয়ে উঠেছেন—তিনি আর কেউ নন, বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতি জুলিয়াস সিজার।

জুলিয়াস সিজারের আবির্ভাব সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এক অঘটন বললেও অত্যুক্তি হয় না; বাস্তবিক এত খ্যাতি আর কোন সেনানায়ক কখনও পেয়েছেন কি না সন্দেহ। নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, লোকের মুখে মুখে ঐ নাম আজও অমর হয়ে আছে!

সিজার প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেন গল্‌দের যুদ্ধে। এখন যে স্থানটি ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম, সিজারের সময়ে ঐ অবধি রোমের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়, এমন কি তিনি জার্ম্মানী পর্য্যন্তও এগিয়ে গিয়েছিলেন। ইংলণ্ডেও তিনিই প্রথম যুদ্ধযাত্রা করেন, যদিও সেখানে রাজ্যস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই সময়টা চারিদিকেই রোমের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছিল। পম্পি এবং ক্রেসাস, আর তুজন বিখ্যাত সেনাপতিও তখন এশিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত রোমের বাহিনীকে বিজয়গর্ব্বে পথ দেখিয়ে চলেছেন।

রোমের সেনেট তখনও একটা ছিল এবং তখনও পর্য্যন্ত তু'চার জন সাধারণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করছিলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসন করছিলেন ঐ তিনজনই। সিজারের সৌভাগ্যক্রমে ক্রেসাস পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেলেন এবং পম্পি, সেনেটের তরফ থেকে সিজারের যথেচ্ছাচারের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতে, তাঁর হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন। এইভাবে রোমের সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতা, এই প্রথম, একজনের হাতে চলে গেল।

পম্পির পতনের পর সিজার সেনেটকে দিয়ে আজীবন নিজের 'ডিক্টেটার' বা সর্ব্বময় কর্ত্তার পদটি অনুমোদন করিয়ে নিলেন। কেউ কেউ সোজাসুজি তাঁকে রাজা বা সম্রাটরূপে অভিষেক করার কথাও তুলেছিল বটে কিন্তু সিজার দেশবাসীর মনের অবস্থা বুঝে সহসা সে প্রস্তাবে রাজী হলেন না, যদিও শেষ পর্য্যন্ত নিজে সিংহাসন এবং রাজদণ্ড ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। রাজা হবার সখটা তাঁর আরও বেড়ে গেল মিশরে গিয়ে। তখন টলেমি বংশের ক্লিওপেট্রা মিশরের সাম্রাজ্ঞী (বিখ্যাত সুন্দরী ক্লিওপেট্রা, যাঁর নাম আমরা সবাই মধ্যে মধ্যে করি!)। মিশরের লোকদের ধারণা ছিল যে, রাজা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, সুতরাং

ক্লিওপেট্রাকেও ওরা দেবী বলে মনে করত। তাঁকে দেখে এসে সিজারের মনে হ'ল যে তিনিও ঐরকম অবতার গোছের একটা কিছু, এবং দেশের লোকের উচিত সেই ভাবেই তাঁকে পূজো করা। তিনি সেই ধরণের ব্যবস্থা কিছু কিছু করেছিলেনও, কিন্তু সে আশা মেটবার পূর্ব্বেই বেচারীকে ইহলোক থেকে চলে যেতে হ'ল।

তাঁর লক্ষ্যটা যে রাজপদবীর দিকে এটা এতদিনে সকলেই বুঝেছিল। তখনও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা সকলের যায়নি; সুতরাং এর প্রতিবিধানের জন্য সেনেটের কয়েকজন সভ্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন এবং একদিন তিনি যখন সেনেটেই যাচ্ছেন তখন ফোরাম বা সভাগৃহের প্রবেশ-পথে কয়েকজন সভ্য মিলে তাঁকে হত্যা করলেন।

কথিত আছে, তাদের মধ্যে তাঁর পরম বন্ধু ব্রুটাসও ছিলেন; তাঁকে দেখে সিজার মৃত্যুর পূর্ব্বে করুণকণ্ঠে শুধু একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, "ব্রুটাস, তুমিও?" সিজারের সেই অন্তিম বিস্ময়ের বাণী যুগ যুগ ধরে চরম বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আজও লোকের মুখে মুখে চলে আসছে, আজও আমরা একান্ত নিকটজনের কাছ থেকে কঠিন আঘাত পেলে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করি, "ব্রুটাস, তুমিও?"

রোমের সম্রাট-বংশ

যে রাজতন্ত্রকে দূর করবার জন্য রোমানরা সিজারকে হত্যা করলে সে রাজতন্ত্রকে কিন্তু ওরা শেষ পর্য্যন্ত দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। সিজার গেলেন কিন্তু সিজারের প্রতিপত্তির ছবি লোকের মন থেকে মুছে গেল না। আবার ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। শেষকালে সিজারেরই ভাই-পো অক্টেভিয়ান তাঁর

অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিয়ে একদা সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসলেন; অক্টেভিয়ান চতুর লোক ছিলেন, তিনি রাজা হবার কথা একবারও মুখে আনলেন না, সমস্ত ক্ষমতা হাতে পেয়েও সেনেটকে বললেন, 'তোমরাই সব, আমি ত ভৃত্য মাত্র!' সেনেট তার জবাবে অক্টেভিয়ানের মাথার ওপর রাজচ্ছত্র মেলে ধরলে। অর্থাৎ অক্টেভিয়ান 'অগস্টাস্ সিজার' নাম নিয়ে রোমের প্রথম সম্রাট-পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

এর পরে রীতিমত রাজতন্ত্রই চলল। সম্রাটের পর সম্রাট এলেন, এলেন ক্লডিয়াস, এলেন ক্যালিগুলা, এলেন নীরো—আরও কত কে! এধারে যেমন রোমের রাজ্যসীমাও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হতে লাগল, এই সব সম্রাটদের যথেচ্ছাচারও বেড়ে চলল। আর সাম্রাজ্যও ত বড় সোজা নয়! ওদিকে ইংলণ্ড, আফ্রিকা এবং এদিকে ইউফ্রেটিসের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিপুল রাজ্য; এতে যদি ঐ সব সিজারদের মনে ক্ষমতার নেশা লেগেই থাকে ত বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু চাণক্য বলেছেন, 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্'—অতি যা-কিছু সবই খারাপ। এ ক্ষেত্রেও সে নীতির ব্যতিক্রম ঘটল না।

এতবড় রাজ্য সুদূর রোম থেকে শাসন করা যেমন কঠিন হয়ে উঠল, ওধারে এতবড় রাজ্যের মালিকদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের উপকরণ অপরিমিত হয়ে পড়ায় তাঁদেরও দ্রুত অধঃপতন ঘটতে লাগল। চারিদিকেই অসন্তোষ, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা। আর বহুদূর বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যের যাঁরা একচ্ছত্র মালিক সেই সিজারদের মাথা গেল গুলিয়ে, তাঁরা দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়লেন। ক্যালিগুলা, নীরো প্রভৃতির বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শুনলে মরামানুষেরও বোধহয় রক্ত গরম হয়ে ওঠে। শাসন নেই, রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা নেই, রাজনীতি পর্য্যন্ত নেই—শুধু পাপ, বিলাস

আর উন্মত্ত যথেচ্ছাচারিতা ; এতে রাজ্য আর ক'দিন থাকে ? বিরাট রোম সাম্রাজ্যেরও ভাঙন ধরতে শুরু হ'ল।

অগস্টাসের সময় থেকে তিনশ' বছরের মধ্যেই রোমের বিপুল প্রতিপত্তি সমস্ত ভেঙে চুরে খান্ খান্ হয়ে গেল।

কুষাণ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য যাযাবর দল

রোম যখন পৃথিবীর পশ্চিম দিকে বিপুল সাম্রাজ্য বিস্তার করে প্রবল প্রতাপে শাসন করছে, তখন প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর দুটি বড় সাম্রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই। তার মধ্যে চীন সাম্রাজ্যই প্রধান। চীনের প্রতাপ এই সময়টায় বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। কাস্পিয়ানের ওপার পর্য্যন্ত যখন রোম তার পতাকা তুলেছে তখন এপারেও চীনের জয়ধ্বজা উড়ছে দেখা যায়। যদিও এ দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন আত্মীয়তা স্থাপিত হয় নি।

চীনের সাম্রাজ্যও খুব অখণ্ড শান্তিভোগ করতে পারে নি। মধ্য এশিয়া থেকেই নানা দলের মানুষ সময়ে সময়ে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আর নানা সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা আমরা আগেই দেখেছি, এবং সে মধ্য এশিয়া তখনও বন্ধ্যা হয়নি। তখনও তার যাযাবর সন্তানেরা সংখ্যা ও দলে বেড়েই চলেছে। বাড়ছে অথচ খাদ্য নেই। উত্তরে তখন বসবাস করার কোন উপায় নেই, এখন যে সব জায়গাগুলোকে আমরা সাইবেরিয়া, রাশিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি বলি, এশিয়া ও ইউরোপের সেই উত্তর অঞ্চলে তখনও মরুভূমি। তখনও এত শীত সেখানে যে কোন ফসল হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং ঐ সব যাযাবররা পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে ছড়িয়ে

পড়তে চেষ্টা করল; এদের সে আক্রমণের আঘাত ছিল প্রচণ্ড। বহু দিন ধরে বহু দল এমনি করে ছড়িয়েছে চারিদিকে; আমরা ঐ সব এক একটা দলকে এক একটা নাম দিয়েছি, শক, হূণ, মোগল, কুষাণ ইত্যাদি—যদিচ মূল এদের প্রায় একই।

কিন্তু তখন ওধারে চীন সাম্রাজ্য অত্যন্ত প্রবল। তারা এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটা বিরাট পাঁচিলও তুলেছিল, তা-ছাড়া তাদের পরাক্রমও ছিল ঢের, সেখানে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না। চীনের লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালীকে উন্নততর করে তুলতে লাগল; জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলায় সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। এ-ক্ষেত্রে একটা কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে কাঠের ওপর উল্টোভাবে অক্ষর খোদাই করে হরফ ছাপবার প্রণালী অত আগেই চীন প্রথম আবিষ্কার করেছিল—যদিও তার বহু শতাব্দী পরে তার রীতিমত প্রচলন শুরু হয়; আবার চীনে প্রচলিত হবারও কয়েক-শ' বছর পরে বিদ্যাটা ইউরোপে যায়।

চীনেও যেমন কিছু করা গেল না, রোম সাম্রাজ্যেরও বিশেষ কোন ক্ষতি করা এদের দ্বারা সম্ভব হ'ল না; খালি একদল যাদের আমরা পার্থিয়ান বলে এর আগে উল্লেখ করেছি, তারা মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের সিংহাসন দখল করে এক বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করলে; রোমের সেনাপতি ক্রেসাস্ ও পম্পি এদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেন। আর সব চেয়ে বেশী আঘাত যাকে সহ্য করতে হ'ল সে হচ্ছে ভারতবর্ষ। প্রথমে এল শক, তারা এখানে এসে এদের সঙ্গে মিশে যাবার পরই আর এক দল এল, তারা হ'ল কুষাণ। এই কুষাণরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, আফগানিস্থান এবং মধ্য এশিয়ার খানিকটা পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে; এদের মধ্যে সম্রাট কনিষ্ক খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর

নাম আমাদের এতই শোনা আছে যে বিস্তৃতভাবে তাঁর কাহিনী বলবার দরকার নেই। এদের রাজধানী ছিল পূর্ব্বে কাবুলের কাছাকাছি, পরে পুরুষপুর বা পেশোয়ারে স্থানান্তরিত হয়।

কুষাণরা যখন এদেশে এল, তখন মৌর্য্যবংশের পতন হয়েছে। তারপর সুঙ্গ, কাণ্ব প্রভৃতি দু'একটি রাজবংশ দেখা দিয়েছে বটে, তবে তাদের এমন বিক্রম ছিল না যে এদের বাধা দেয়। এর অনেক দিন পরে গুপ্তবংশ আবার প্রবল হয়ে ওঠে; কিন্তু তখন কুষাণরা এ দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেছে, তারা আর নবাগত যাযাবর দস্যু নেই! গুপ্তদের আমলে যে আর এক দল যাযাবর ভারতের পশ্চিম সীমাতে হানা দিয়ে ভীষণ অত্যাচার করে, তারা হ'ল হূণ—কিন্তু গুপ্তদের জন্যই বোধ হয়, তারা কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

এই সমস্ত ঘটনা যখন আর্য্যাবর্ত্ত বা উত্তর-ভারতে ঘটছিল তখন দাক্ষিণাত্য কিন্তু বেশ নিরাপদেই ছিল; কারণ তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্য ছিল সুদূর, বহু নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে ওদেশে যেতে হ'ত, তা-ছাড়া ওটা এতই গরম দেশ যে মধ্য-এশিয়ার ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে যারা আসত, তারা ওদেশে যাবার কথা ভাবতেও পারত না। সেই জন্যই, উত্তর-ভারত যখন নবাগতদের অত্যাচারে ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত, দক্ষিণ ভারত তখন নিরাপদে সাত সমুদ্র ডিঙিয়ে দূর দূরান্তরে, এমন কি সুদূর ইউরোপেও বাণিজ্য-তরী পাঠাচ্ছে। সেই জন্যই দ্রবিড় ও আর্য্যদের মিলিত সংস্কৃতি, যাকে আমরা হিন্দু সংস্কৃতি বলতে পারি, তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও ঐ দাক্ষিণাত্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

এই সব নবাগতদের মধ্যে কুষাণ-সাম্রাজ্যের দ্বারা আমাদের কিছু উপকারও হয়েছে। কুষাণ রাজারা শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন, আর তারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তার সঙ্গে কিছু

কিছু ভারতীয় সংস্কৃতি বা সভ্যতাও, সমগ্র চীনে এমন কি সুদূর কোরিয়ার পথ বেয়ে জাপান পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল।

শুধু তাই নয়, ইরাণ দেশের তদানীন্তন গ্রীক সভ্যতার যে কিছু কিছু ছাপ আমাদের দেশে প্রাচীন কালে দেখতে পাওয়া যেতো তার জন্যও বোধ হয় এই কুষাণরাই দায়ী। তারা এদেশের জিনিস যেমন ওদেশে বয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি ফিরিয়েও এনেছে কিছু কিছু।

কোরিয়া ও জাপান

এই দু'টি দেশের কথা আমরা এর আগে কিছু বলতে পারিনি তার কারণ দু'টি দেশেরই পূর্ব্বেকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমাদের জানা নেই। তার পরেও যে বিশেষ কিছু বলবার আছে তা নেই, তার কারণ এদের শিক্ষা সংস্কৃতি যা কিছু সবই চীনের কাছ থেকে পাওয়া। শান্-বংশের পতনের পর যখন চৌ-বংশ চীনে রাজত্ব করতে শুরু করলেন, সেই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের প্রায় বারোশ' বছর আগে, কাই-ৎসি নামক এক সেনানায়ক চৌ-বংশের ওপর রাগ করে হাজার পাঁচেক লোকসুদ্ধ সুদূর কোরিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তখন ঐ-দেশটাকেই ওরা সব চেয়ে পূর্ব্বে অবস্থিত বলে মনে করত, আর সেই জন্যই দেশটার নাম দিয়েছিল ওরা—'চো-সেন' বা 'প্রভাতকালীন শান্তির দেশ'।

এঁরা বহুদিন ধরে ঐখানে বাস করেন। কাই-ৎসির বংশধরেরাই ন-শ' বছর ধরে ওখানে রাজত্ব করেন। মধ্যে মধ্যে চীন থেকে দু'একদল লোক আসত বসবাস করতে, এরাও তাতে আপত্তি করত না, কারণ তখনও জায়গা পড়ে ছিল ঢের। শেষকালে শি-হোয়াং-টি যখন চীনের সম্রাট হলেন তখন আরও বহু লোক

এখানে এসে পড়ল। এ লোকটির নাম আমরা আগেই করেছি—ইনি চীনের সম্রাটদের মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। এঁর পরাক্রমও ছিল যেমন, পাগলামিও ছিল তদ্রূপ। এঁর হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে, তিনি যখন এত বড় লোক, শুধু তাঁর কথা জানলেই চলবে, তাঁর পূর্ব্বে পৃথিবীতে আর কে জন্মেছিল বা কী হয়েছিল তা নিয়ে কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ব্যস্—যে কথা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজেকে 'প্রথম সম্রাট' বলে জাহির করলেন, তাঁর আমল থেকেই বর্ষ গণনা শুরু হ'ল। এবং অতীতের যা কিছু স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য সমস্ত পুরনো পুঁথি, ছবি প্রভৃতি পুড়িয়ে ও নষ্ট করে ফেলবার হুকুম তিনি দিলেন।

যাই হোক্—এঁরই প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে যারা পালিয়ে কোরিয়ায় এল, তারা এসেই প্রাচীন রাজবংশকে দূর করে দিলে। এর পর বহুদিন পর্য্যন্ত কোরিয়া কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ছিল। পরে চীনের সম্রাটেরাই কোরিয়ার খানিকটা দখল করে নেন। এবং তার বহুদিন পরে, খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর পরে কোরিয়া ওয়াং কীয়েন নামক একজন রাজার অধীনে স্বাধীন এবং অখণ্ড রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য সে স্বাধীনতা বেচারীদের এখন আর নেই।

এইত গেল কোরিয়ার কথা। জাপানের ইতিহাস আরও আধুনিক। যখন থেকে ওদের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে খৃষ্টজন্মেরও প্রায় দু'শ বছর পরে। জিঙ্গো বলে এক সম্রাজ্ঞী সে সময় য়্যামাতো বা জাপানে রাজত্ব করতেন, যদিও ওদের বিশ্বাস যে পৌরাণিক যুগেও ওদের অস্তিত্ব ছিল (সেটাও, হিসেব মত বুদ্ধের সময়ে) এবং ওদের প্রথম রাজার নাম হ'ল জিম্মু টেন্নো আর তিনি হলেন সাক্ষাৎ সূর্য্যবংশীয়। এখনকার যিনি জাপানের সম্রাট তিনিও ঐ জিম্মুর তথা সূর্য্যেরই বংশধর। তখন

থেকে এখনও পর্য্যন্ত ঐ বংশের ধারা সমানে চলে আসছে। প্রাচ্যে এ বিশ্বাসটা আরও অনেকেরই ছিল, আমাদেরও রামচন্দ্র সূর্য্যবংশে এবং যুধিষ্ঠির চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে হিন্দুদের বিশ্বাস।

জাপানের আদিম অধিবাসীদের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না, খুব সম্ভব একদা কোরিয়ার মারফৎ চীনেরই কিছু কিছু লোক ওখানে গিয়ে ধীরে ধীরে বসবাস করতে শুরু করেছিল এবং পরে মালয় শ্যাম প্রভৃতি দেশ থেকে কেউ কেউ যায়। তবে এখনও আইনুস্ ব'লে উত্তর জাপানে একদল লোক দেখা যায়, যারা এই দক্ষিণ জাপানের মোঙ্গল অধিবাসীদের থেকে আকৃতি-প্রকৃতিতে কিছু ভিন্ন। ওদের বিশ্বাস এই আইনুস্‌রাই জাপানের আদিম অধিবাসী। তবে লোক যেখান থেকেই যাক্—শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু ওরা কোরিয়া তথা চীনের কাছ থেকেই যে পেয়েছিল তাতে আর কোন সংশয় নেই। খৃষ্টজন্মের প্রায় চারশ' বছর পরে চীনে-অক্ষর দেখে ওরা লিখতে শেখে এবং আরও দেড়শ' বছর পরে কোরিয়ার এক রাজা বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠান ওদের আত্মার উদ্ধারের জন্যে। তার আগে যে ধর্ম্ম ওদের দেশে প্রচলিত ছিল তার নাম হ'ল শিণ্টো।

ওদের সব কিছুই চীনের কাছ থেকে পাওয়া—চীনেরই রাজধানী সি-আন্-ফু দেখে ওরা 'নারা' নামে প্রকাণ্ড একটা রাজধানী করে, যদিও তার কিছুদিন পরে কিয়েতো এবং তারও অনেক পরে টোকিওতে রাজধানী চলে আসে। আগে এদের দেশটা কয়েকটা গোষ্ঠী বা দল মিলে ভাগাভাগি করে শাসন করত, যদিও মিকাডো বা সম্রাট একজন বরাবরই ছিলেন ; কিন্তু অষ্টম খৃষ্টাব্দে কাকাতোমি নামে একজন চীনের শাসন-ব্যবস্থার অনুসরণে আগাগোড়া জাপানের সমস্ত শাসন-ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন করেন এবং তারই ফলে সম্রাটের প্রতাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা

বলে রাখি; এখন যেমন আমাদের সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের পূর্ব্বে পরীক্ষা নেওয়া হয়, এই ব্যবস্থা চীনে বহুশত বৎসর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এ আর কোন দেশ কখনও ভাবেনি, এমন কি জাপান অন্য সব ব্যবস্থা চীন থেকে নিলেও, এ প্রথাটা নেয়নি।

জাপানের জাপান নামটা এল এক অদ্ভুত উপায়ে; এখন নিজেদের ভাষায় ওদের নাম হ'ল নিপ্পন বা সূর্য্যোদয়ের দেশ। এ নামটা ওদের দিয়েছিল চীনেরাই। কিন্তু মার্কোপোলো বলে একজন ইটালীয়ান চীন ভ্রমণ করে যখন দেশে ফিরে যান তখন তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে জাপানের উল্লেখ করেছিলেন 'সিপাংগো' বলে—আর তাই থেকেই ইউরোপের লোকেরা 'জাপান' নামটা তৈরী করে নিয়েছে।

যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব

এতক্ষণ আমরা বারবার খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ বা খৃষ্টাব্দ বলে সময়ের বিশেষ বিভাগকে উল্লেখ করেছি। যাঁকে উপলক্ষ্য করে এই বৎসর-গণনা শুরু হয়েছিল এইবার সেই যীশুখৃষ্টের কথা কিছু বলব। বৎসর গণনার হিসাব আরও অনেক আছে; আমাদের শকাব্দ, সম্বৎ, মুসলমানদের হিজিরা ইত্যাদি আরও কত, কিন্তু আজ সারা পৃথিবীতে খৃষ্টাব্দই বেশী প্রচলিত, এবং সেইজন্য ঐটের উল্লেখ করলেই আমরা সহজে বুঝতে পারি। তার কারণ আর কিছুই নয়, পৃথিবীর মধ্যে যে সব জাতি আজ বেশী প্রতাপশালী, ক্ষমতায় ও ঐশ্বর্য্যে যারা বেশী বলবান, তারা প্রায় সকলেই খৃষ্টান। শাসকদের বর্ষ-গণনাই শাসিতরা মেনে নিয়েছে।

এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর আগে, রোমের প্রথম সম্রাট অগস্টাস্ সিজারের আমলে সলোমন ও ডেভিডেরই এক বংশধরের

ঘরে 'পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা' যীশু জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ জাতিতে ইনি ইহুদীই ছিলেন।

আমরা যখন থেকে যীশুর কথা শুনতে পাই, তখন ওঁর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স। তার আগে তিনি কোথায় ছিলেন, কি করেছেন সে বিষয়ে কিছুই জানা নেই, তখনকার দিনের সমস্ত ইতিহাসই ঝাপসা হয়ে আছে। যেটুকু তাঁর সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি তা তাঁর বাণী বা সুসমাচার লেখক তাঁর চারজন শিষ্যের লিখিত কাহিনীমারফৎ। এই চারজনের লেখা কাহিনীই বাইবেলের দ্বিতীয়ভাগ বা নিউ টেস্টামেণ্ট বলে বিখ্যাত। কিন্তু ভক্তিতে এবং লোক-পরম্পরায় এই সব ইতিহাসের অনেকখানিই যে বিকৃত হয়ে যায় তা আমরা সবাই জানি, সুতরাং এর কতটা যে বিশ্বাসযোগ্য আর কতটা যে নয় তা ঠিক করে বলা কঠিন।

বাইবেল যদিচ ইহুদীদের একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ, এবং যীশুর এই উপদেশগুলি বাইবেলেরই দ্বিতীয় খণ্ড বলে বিখ্যাত, তবু ইহুদীরা এই নতুন বাইবেলকে কোন দিনই স্বীকার করতে পারেনি। ওদের বাইবেলে একজন ত্রাণকর্ত্তা বা মেসায়ার জন্ম নেবার কথা ছিল বটে, কিন্তু যীশুই যে সেই মেসায়া একথা ওরা মানে না। তার কারণ ওদের সেই মেসায়ার ওপর যে আশা-ভরসা ছিল, যীশু তা সব ভেঙে চুরমার করে দিলেন। ওদের বিশ্বাস ছিল, হয়ত এখনও বা আছে, যে ওরাই হ'ল মানুষের মধ্যে ভগবানের সব চেয়ে প্রিয় এবং ভগবান ওদেরই সুখ-সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেবেন।

কিন্তু যীশুখৃষ্ট যখন সহসা একদা জুডিয়াতে আবির্ভূত হয়ে ধর্ম্মপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি বললেন যে, তা হয় না; সব মানুষই ঈশ্বরের চোখে সমান, তিনি কোন কারণেই কারুর ওপর অবিচার করতে পারেন না। যীশু যখন এলেন, তখন ইহুদীদের সমাজ নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে—তিনি

এসেই সেই সমস্ত প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। যা কিছু আবর্জ্জনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা যত প্রাচীনই হোক—যীশু বললেন, তা সমস্ত ভেঙে চুরে নতুন করে সমাজ, নতুন করে মানুষের আইন গড়ে তুলতে হবে।

যীশুও বুদ্ধের মত সর্ব্বজীবে দয়া ও অহিংসা প্রচার করেন; তাতে করে কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে তিনি প্রথম জীবনে তিব্বত ও ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করে গিয়েছিলেন। অবশ্য তার এমন কোন প্রমাণ নেই। ভারতবর্ষে না এসেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তাঁর ওপর পড়া কিছু বিচিত্র নয়। কারণ তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাইরেও প্রচারিত হ'তে শুরু হয়েছে।

ইহুদীদের ধর্ম্মগুরু বা পুরোহিতের দল এই ব্যাপারে দারুণ চটে গেলেন। যীশু এসে তাঁদের মন্দিরে বলিদানের জন্য বেঁধে রাখা জীবজন্তুদের ছেড়ে দিলেন, বাটা বা সুদ নেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং প্রবল কণ্ঠে ধনী ও অত্যাচারী পুরোহিতদের কার্য্যের নিন্দা শুরু করলেন। তিনি বললেন, ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম ছাড়া ভগবানকে পাবার উপায় নেই; এবং বড়লোক নয়, পূজারী নয়—যে নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পাপ হবে, একমাত্র সে-ই এ জীবনের শেষে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবে, অমৃতের অধিকারী হবে।

দেখতে দেখতে নিঃস্ব, দুর্ব্বল, অথচ তেজস্বী এই মানুষটির শিষ্য-সংখ্যা বেড়ে গেল। জেলে ছুটে এল তার জাল ফেলে, ধোপা এল তার কাপড় কাচার পাটা ফেলে। দলে দলে পীড়িত, দুর্ব্বল মানুষ নানাদিক থেকে ছুটে এল, শুধু মাত্র যীশুর মুখের দিকে চেয়েই যেন তারা মনে বল পেল, তাদের দেহ সুস্থ হয়ে উঠল। পাপী-তাপী সকলকেই তিনি শ্রীচৈতন্যের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাদের কানে কানে পরমমন্ত্র শোনালেন—আমরা সকলেই সেই পরম-পিতার সন্তান, সুতরাং সকলেই আমরা ভাই-বোন।

পুরোহিতরা যখন দেখলেন যে এই একটি মাত্র মানুষের জন্য তাঁদের পরলোকের আশা এবং ইহলোকের প্রতিপত্তি সব যায় তখন তাঁরা জুডিয়ার রোমান শাসনকর্তার শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু তখনকার দিনে রোমানরা প্রজাদের ধর্ম্মমত নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না, সেই জন্য যীশুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হ'ল; তিনি নাকি নিজেকে ইহুদীদের রাজা বলে প্রচার করেন এবং তাতে করে প্রতাপশালী রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যীশুরই দ্বাদশজন পরম ভক্তের মধ্যে একজন, জুডাস্, মাত্র ত্রিশটি টাকা ঘুষ খেয়ে যীশুকে ধরিয়ে দিলেন। এবং তার ফলে বিচারে যীশুর ক্রস্‌বিদ্ধ হয়ে মরবার আদেশ হ'ল।

যীশু এ বিচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করলেন না। তাঁকে দিয়েই সেই ভারী ক্রস-কাঠটি বইয়ে নিয়ে গিয়ে সাধারণ দুজন ডাকাতের সঙ্গে তাঁকে ক্রসে চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি ক্রসে ওঠবার সময় শুধু ঈশ্বরের কাছে তাঁর নিগ্রহকারীদের হয়েই ক্ষমা প্রার্থনা করে মিনতি জানালেন, "প্রভু, এরা জানে না যে এরা কী অন্যায় করছে, তুমি এদের ক্ষমা করো।"

ওঁকে শুধু ওরা ক্রসে বিঁধেই ক্ষান্ত হ'ল না, মাথাতে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিলে। যীশুর দেহ খুবই দুর্ব্বল ছিল, তিনি বেশীক্ষণ সে দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না, একবার ঊর্দ্ধে নীল আকাশের দিকে চেয়ে আর্ত্তস্বরে বলে উঠলেন, "প্রভু, এই দুঃসময়ে কি তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে?" তারপরই চিরকালের মত পরম শান্তিতে চোখ মুদলেন।

যীশু মরবার পর প্রথমটা মনে হয়েছিল যে তাঁর ধর্ম্মও বুঝি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে। কারণ যাঁরা তাঁর প্রধান শিষ্য, পিটার প্রভৃতি তাঁর বাণী ত তখন প্রচার করতে সাহসই করেননি, এমন কি তাঁর শিষ্য বলেও নিজেদের পরিচয় দিতে চাইতেন না।

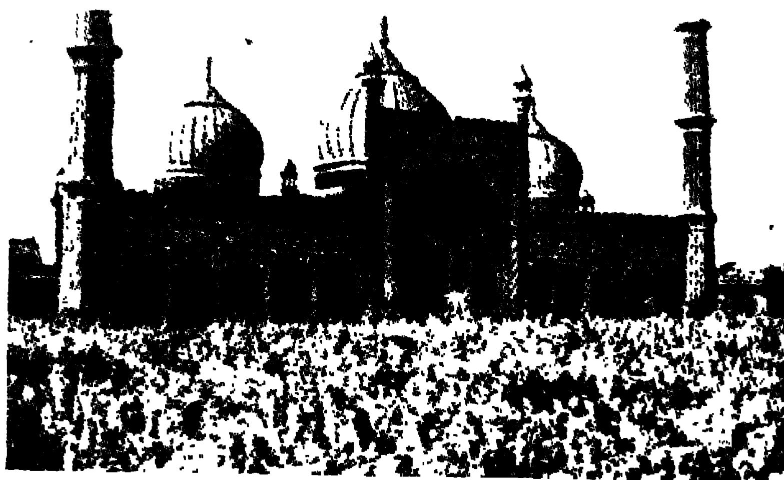
কিন্তু যীশু মরার অনেক দিন পরে সাধু পল আবার তাঁর উপদেশ প্রচার করতে শুরু করলেন। সে উপদেশ শোনবার জন্যও দেশ থেকে লোকে ছুটে আসতে লাগল, শোনাবার জন্যও দেশ থেকে দেশান্তরে লোক ঘুরে বেড়াতে লাগল। যীশুর সেই উপদেশ, তাঁর দেওয়া 'অভয় মন্ত্র' 'অশোক মন্ত্র' মৃত্যুজয়ী হয়ে আবার ফিরে এল।

প্রথমটা রোমানরা এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান নি। কিন্তু পরে তাঁরা এই নতুন শক্তিশালী দলটি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। এদের দমন করবার জন্য নানা ব্যবস্থা চলতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই এদের দমানো গেল না। তখন খৃষ্টানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দরিদ্র লোক, কিন্তু তারা মৃত্যুকে ভয় করলে না। দলে দলে আগুনে, ক্রুসে, বন্য জন্তুদের মুখে প্রাণ হারাতে লাগল, তবুও ক্রীশ্চানদের সংখ্যা কমল না। শেষে খৃষ্ট মরবার প্রায় তিনশ' বছর পরে সিজার কন্‌স্টান্টাইন নিজেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ঐ ধর্ম্ম অবাধে প্রচারিত হ'তে লাগল।

আরও একবার আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলুম যে, যার মধ্যে সত্য আছে তা বাহ্যত যত দুর্ব্বলই হোক্— গায়ের জোরে তাকে মারা যায় না। নইলে অত কাণ্ড করা সত্ত্বেও খৃষ্টের বাণীই পৃথিবীর মধ্যে আজ সর্ব্বাধিক প্রচারিত হ'ত না, এবং যে ক্রুসে চড়িয়ে তাঁকে মারা হয়েছিল, সেই ক্রুসের চিহ্নই আজ সমস্ত ক্রীশ্চানদের ধর্ম্মচিহ্ন হয়ে উঠত না।



যীশুখৃষ্টের সমাধি-মন্দির—জেরুসালেম



জুম্মা মস্‌জিদ—দিল্লী

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খৃষ্টের পরে ও মহম্মদের পূর্ব্বে

কন্‌স্টান্টাইন যখন খৃষ্টানদের ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন তখনই সাম্রাজ্যের ভিত্তি জীর্ণ হয়ে এসেছে। সীমানাটা তখনও নামে মাত্র আছে বটে কিন্তু সে সীমানা রক্ষা করা রীতিমত কঠিন হয়ে উঠেছে, সীমানা বৃদ্ধি করা ত একেবারেই অসম্ভব। উত্তর দিক থেকে 'ফ্রাঙ্কস্' প্রভৃতি জার্ম্মাণীর অর্দ্ধ-বর্ব্বর অধিবাসীরা রাইন নদীর অপর পার পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছে, এবং নদী পার হবারও চেষ্টাচরিত্র করছে; আর এধারে বর্ত্তমান রাশিয়া, রুমানিয়া ও হাঙ্গারীর তদানীন্তন অধিবাসী গথ্ ও ভ্যাণ্ডাল্‌রা তাদের পেছনে হূণদের ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে আসতে চাইছে। এশিয়ার অবস্থাও ভাল নয়—সেখানে পারস্যের সাসানিড সম্রাটরা, যাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই কিছু বলেছি, ক্রমশ প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে। তাদের যে বেশীদিন সীমানার বাইরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না এ কথাটাও যেন তখনই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তবু কন্‌স্টান্‌টাইনই প্রাণপণ চেষ্টায় চতুর্দ্দিকের এই সব শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সাম্রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। রোম থেকে সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব অংশটা অনেক দূর পড়ে বলে তিনি বর্ত্তমান কন্‌স্টান্‌টিনোপলে রাজধানী তুলে আনবার উদ্দেশ্যে শহর তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে শহর সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। তিনি মরবার পূর্ব্বে ভ্যাণ্ডালরা তাঁর অনুমতি নিয়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাস করতে শুরু করেছিল এবং তিনি মরবার পর গথ্‌রা জোর করে এসে বর্ত্তমান বুলগেরিয়ায় বাস করতে লাগল। এরা দুটি দলই রোমের

সম্রাটকে মেনে নিতে রাজী হ'ল বটে কিন্তু আসলে ওরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়েই রইল। এবং ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস্ যখন মারা গেলেন তখন তাঁর দুই ছেলেকে উপলক্ষ্য করে ঐ দুটি দল বিপুল রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগ করে নিলে। গথ্রা দখল করলে কন্স্টান্টিনোপল আর ভ্যাণ্ডালরা নিলে রোম। এই দুই সাম্রাজ্যের অধিকারী হিসাবে সম্রাট-বংশীয়েরাই রইলেন বটে কিন্তু ক্ষমতা আর এঁদের হাতে রইল না, সেটা ঐ দু'দলের হাতে চলে গেল।

এর পর কিছুদিন ঐ ভাবেই চলল। নানা ভবঘুরে দল এসে এই সময়টায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নাক ঢোকাতে শুরু করেছিল। সাধারণ প্রজাদের সেই সময়টায় যে দুরবস্থা তা আর না বলাই ভাল। চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা, চারিদিকেই অরাজকতা। কিন্তু প্রজাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল যখন আটিলা নামক দুর্দ্দান্ত এক দলপতির নায়কত্বে হূণেরা একেবারে রোম সাম্রাজ্যের বুকে এসে হানা দিলে। এই হূণদের কথা আগেই একবার উল্লেখ করেছি, এরা ভারতবর্ষেও কম অত্যাচার করেনি।

মধ্য এশিয়ার যে সব যাযাবর দল খাদ্যের অভাবে বা প্রাকৃতিক উৎপাতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এরাও তাদেরই একদল। মোঙ্গোলিয়া বা তার কাছাকাছি স্থানে এদের উৎপত্তি, মোঙ্গোলদের মতই এদের চেহারা, রংটা কিছু সাদাটে (অন্তত ভারতবর্ষে যে দল এসেছিল তাদের শ্বেত হূণ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এরা ইউরোপের অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানে ধীরে ধীরে ছড়াতে আরম্ভ করেছে দেখতে পাই। সে সময় এদের সঙ্গে তদানীন্তন সভ্যসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু পরে একটু একটু করে এরা লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এদের তাড়া খেয়ে ভ্যাণ্ডালরা আর গথ্রা রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলে, যদিচ তাতেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি হূণরা প্রবল বিক্রমে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে।

এই সময়টা ওরা চারিদিকেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ওদের যে হাতপা ছড়াবার বেশী জায়গা তখন ছিল না, তা আগেই বলেছি। কারণ এধারে চীন আর ওধারে সাসানিড সাম্রাজ্যের তখন এত প্রতাপ যে সেদিকে বিশেষ সুবিধা করা যায়নি। এক ইউরোপ আর ভারতবর্ষ। সুতরাং ওধারে রোমসাম্রাজ্য যখন আটিলার উপদ্রবে অস্থির হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষে এদেরই আর একদল এসে উপস্থিত হয়েছে।

এখানে তখন গুপ্ত সম্রাটদের যুগ চলেছে, যদিও গুপ্তবংশে তখনই যথেষ্ট ভাঙন লেগেছে। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত যে বারো বৎসর রাজত্ব করেন (৪৫৫—৪৬৬ খৃষ্টাব্দ) সেই বারো বৎসরই তাঁকে হূণদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশে যে কয়জন সম্রাট হয়েছিলেন তাঁরা কেউই হূণদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, তারা ভারতের বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিল। শেষকালে মালবের রাজা যশোধর্ম্মনের হাতে এদের সর্ব্বশেষ পরাজয় ঘটে (৫৩০ খৃঃ)।

হূণরা যে সময়ে ভারতবর্ষের দোরে দেখা দিয়েছে সেই সময় এদের আর এক দল, আটিলা নামক এক দুর্দ্দান্ত দলপতির পতাকাতলে সমবেত হয়ে রোমসাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। সাধারণত যাযাবর দল বলতে আমরা যা বুঝি, আটিলার দল ঠিক তা ছিল না। এদের দলকে এরা রীতিমত যোদ্ধা-সৈন্যদলে পরিণত করতে পেরেছিল এবং এদের ক্ষমতাও বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিল; যদিও এতবড় ক্ষমতাকে এরা চিরস্থায়ী কোন কাজে লাগাতে পারেনি। তখন দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্ কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সম্রাট; আটিলা দিন-কতক তাঁকে জ্বালাতন করে হঠাৎ পশ্চিম

সাম্রাজ্যের দিকে মন দিলে এবং যদিও গল্, গথ ও রোমানদের মিলিত শক্তির কাছে ভীষণ এক যুদ্ধে আটিলা হেরে গেল (কথিত আছে যে এই যুদ্ধে প্রায় তিনলক্ষ লোক নিহত হয়েছিল্) তবুও সে বৎসর এবং তার পরের বৎসরে পশ্চিম সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত শহরগুলিই লুঠ ক'রে, জ্বালিয়ে প্রায় ধ্বংস ক'রে ছেড়ে দিলে।

এর কিছুদিন পরেই আটিলা মারা যায় ((৪৫৩ খৃঃ) আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই হূণদের ক্ষমতা লোপ পায়। আটিলার মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই আমরা হূণ্ বলে কোন বিশেষ জাতকে আর ইউরোপে দেখতে পাই না, যারা রইল তারা আর্য্য-ক্রীশ্চান অধিবাসীদের সঙ্গেই ধীরে ধীরে মিশে গেল।

হূণেরা গেল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমসাম্রাজ্যও গেল। আটিলার মৃত্যুর পর বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় দশজন পর পর রোমের সম্রাট হন এবং তারপরে একেবারেই সম্রাট-বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কার্থেজ থেকে একদল ভ্যাণ্ডাল এসে রোম ধ্বংস করে সম্রাট পদবী তুলে দিলে, আর পঞ্চম শতাব্দীর শেষে থিওডোরিক নামে একজন গথ্ রোম দখল করে নিজেকে রোমের রাজা বলে ঘোষণা করলে।

এই সময়টায় ইউরোপের যে সব অংশের ছবি আমরা পাই, সর্ব্বত্রই দেখি শুধু অরাজকতা। ছোট ছোট দল, তাদের ডাকাতের দল বললেই বোধ হয় সত্যভাষণ করা হয়, তাদেরই দলপতিরা নিজেদের রাজা বা ডিউক বা ঐ রকম কিছু একটা উপাধি দিয়ে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করছে এবং পরস্পরকে আক্রমণ ও লুঠতরাজ করে দিন কাটাচ্ছে। শাসন নেই, আইন নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য বা প্রজাসাধারণের সমৃদ্ধির কোন চিহ্নই নেই। এই যখন রোম-সাম্রাজ্যের অবস্থা, তখন রোমে ধীরে ধীরে আর একটি ক্ষমতা একটু একটু করে প্রাধান্য লাভ করছে দেখতে পাই—এবং তার

পদবী যদিও সম্রাট নয় তবু কার্য্যত তা সম্রাটের চেয়ে ছোট নয় কোন দিকেই, সে পদবী হ'ল ধর্ম্মগুরু বা পোপের। রোমসাম্রাজ্যের প্রতাপ ওদিকে যখন অস্তাচলের দিকে এগিয়ে চলেছে, এদিকে তখন ক্রীশ্চান-ধর্ম্ম সারা ইউরোপে একটু একটু করে প্রাধান্য লাভ করছে, এবং যেহেতু রোমই তখন সমস্ত ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর, সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী, সেহেতু রোমের বিশপ বা প্রধান পুরোহিতই যে এই নবজাগ্রত ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু হবেন তাতে আর সন্দেহ কি।

একটা কথা এইখানে বলে রাখি, কন্‌স্টান্‌টিনোপল-সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম যদিচ ক্রীশ্চান ছিল কিন্তু রোমের পোপ এই ধর্ম্মকে মোটেই দেখতে পারতেন না। রোমের ক্রীশ্চানরা কথা বলত লাটিনে আর কন্‌স্টান্‌টিনোপল বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের লোকেরা বলত গ্রীকে; এবং ওদের পুঁথিপত্রও ঐ তুটো বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ করা ছিল। এ ছাড়া ওদের ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু বৈষম্য ছিল বোধ হয়। এই সব নানা কারণে এদের তু'দলে মোটেই বনে নি এবং রোমের দলের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়ায়, বাইজান্টাইন চার্চ্চের দল কোণ-ঠাসা হয়ে শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি বটে কিন্তু রোমসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হবার পরেই কিছুদিন এরা বেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ৫২৭ খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান্ বলে এঁদের একজন সম্রাট নিজের সাম্রাজ্য-সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। ভ্যাণ্ডালদের কাছ থেকে আফ্রিকার রাজ্যখণ্ড এবং ইটালীর অনেকখানি কেড়ে নিয়ে ইনি রোমসাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব কিছু কিছু ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। এ ছাড়াও এঁর বহু কীর্ত্তি-কলাপ ছিল, তার মধ্যে কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার গির্জ্জা

এবং আইনের বইয়ের পাতায় জাস্টিনিয়ানের 'ল' বা আইন আজও এঁর সে সব কীর্ত্তিকলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পারস্যের সাসানিড সাম্রাজ্য—তা আমরা আগেই বলেছি। এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ যা এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ ভূ-খণ্ড ছিল, একদা শ্মশানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল শুধু এই দুই দলের ঝগড়া-ঝাঁটিতেই। এদের ধর্ম্মও ছিল আলাদা। জোরাওস্টার বা জরথুস্ত্র প্রচলিত ধর্ম্মই ছিল পারস্যের বহু পুরাতন ধর্ম্ম, এবং সাসানিড সম্রাটরাও ঐ ধর্ম্মই মেনে নিয়েছিলেন। অগ্নি ছিলেন এদের উপাস্য দেবতা। পরে মুসলমান ধর্ম্মের প্লাবনে সাসানিড সাম্রাজ্য ভেসে গিয়েছিল বটে, তবুও কয়েক দল অগ্নি-উপাসক ওখান থেকে পালিয়ে এসে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়ে আজও সে ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পারস্য থেকে এসেছিল বলেই বোধহয় আমরা এদের বলি পার্সী। বোম্বে অঞ্চলে এখনও অনেক পার্সী বা অগ্নি-উপাসক বাস করেন।

বাইজান্টাইন ও সাসানিড এই দুটি সাম্রাজ্যই বহুদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে এবং বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনমতে টিকে ছিল কিন্তু নবাগত মুসলমান শক্তির প্রতাপ এরা কেউই সহ্য করতে পারলে না, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুটিই মুসলমানদের করায়ত্ত হ'ল। কিন্তু সে কথা পরে বলছি।

হজরত মহম্মদ ও মুসলমান ধর্ম্ম

এতক্ষণ আমরা আরবের কথা একটিও বলিনি, যদিও এই দেশটি ইতিহাস-বিখ্যাত মেসোপটেমিয়া, পারস্য এবং মিশরের মধ্যে তার বিপুল দেহ প্রসারিত করে বরাবরই নিঃশব্দে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা

করছিল। তার প্রধান কারণ এই দেশটির অধিকাংশই মানববাসের অযোগ্য বালুময় মরুভূমি, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে এক-আধ টুক্‌রো ফালির মত যা উর্ব্বর ভূমি পড়ে ছিল তাতে লোকালয় গড়ে উঠলেও সেই সব জনপদের অধিবাসীরা সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে বিরাট একটা কিছু কল্পনা করাও তাদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। এবং এদের অধিবাসীরাও ছিল (এখনও কিছু কিছু আছে) কতকটা যাযাবর গোছের, যারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্বচ্ছন্দে নিজেদের সংসার উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে, লুঠ-তরাজই যাদের প্রধান পেশা, এবং প্রাণের মায়া যাদের খুব কম ; এ বস্তুটি এরা অনায়াসে দিতেও পারে, নিতেও পারে। এদেরই নাম হ'ল বেতুঈন—কবি যাদের স্বাধীন উন্মুক্ত অবাধগতি দেখে ক্ষোভ-বিজড়িত বাসনা জানিয়েছেন, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেতুঈন !"

এই আরবেরই পশ্চিমকূলে লোহিতসাগরের তীরে যে এক ফালি উর্ব্বর জমি আছে ঈমেন বলে, সেই 'ঈমেন' থেকে সিরিয়া যাবার পথে একদা মক্কা ও মদিনা বলে দুটি শহর গড়ে উঠেছিল। ঠিক শহর বললে অতিভাষণ করা হয়, মাঝারি গোছের দুটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এদের অধিবাসীরা নিতান্তই গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করত, না ছিল কোন রকমের উচ্চাশা, না ছিল বড় হবার বিশেষ কোন চেষ্টা।

এ-হেন মক্কা শহরেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত সভ্য জগতে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

মহম্মদ যখন জন্মগ্রহণ করলেন মক্কা তার পূর্ব্ব থেকেই আরব-বাসীদের তীর্থস্থান। কিন্তু বেতুঈনরা তখন ছিল পৌত্তলিক, আর তাদের সেই অসংখ্য দেবদেবীর প্রতীক-স্বরূপ চতুষ্কোণ কৃষ্ণপ্রস্ত

বেদিকা 'কাবা' ছিল তাদের প্রধান পূজার বস্তু। এই 'কাবা' দর্শন করতে বহু দূর থেকে বহু লোক আসত, আর সেই উপলক্ষ্যে মক্কার লোকের দু-এক পয়সাও হ'ত। মহম্মদও এই পৌত্তলিকদের ঘরেই জন্মেছিলেন এবং প্রথম জীবনে খুব সম্ভব তা নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামান নি। পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি অল্প স্বল্প ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তারপর খাদিজা নাম্নী এক বিধবাকে বিবাহ করে মক্কাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন!

তিনি বিবাহ করে সংসার পাতলেও বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকদের মত তিনিও স্থির হয়ে সংসারে মন দিতে পারলেন না; যে বিরাট দায়িত্ব নিয়ে তিনি জন্মেছেন, তারই প্রেরণা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিতে লাগল। কথিত আছে, সুপ্ত কর্ম্মশক্তির বেদনায় তিনি একা ছুটে ছুটে যেতেন মরুভূমির মধ্যে, পাহাড়ের ওপরে; এবং সেই নির্জ্জনে বসে ভাববার চেষ্টা করতেন—কিসের এ অমোঘ আকর্ষণ, যা কিছুতে তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না! অবশেষে একটু একটু করে তাঁর জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রথম বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'পেয়েছি, হে বিশ্ববাসী, সেই পরম সত্য!' বহু দেবদেবীর পূজা করা যাদের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাদেরই ডেকে সেই বিস্ময়কর বার্ত্তা শোনালেন, 'ঈশ্বর এক এবং আমি তাঁর কাছ থেকেই এই সংবাদ বহন করে এনেছি, আমি ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যদ্রষ্টা!'

কিন্তু এই অতি-সাধারণ মানুষটির ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের মধ্যে সেদিন মক্কার লোকেরা সেই বজ্র-নির্ঘোষ-বাণীকে চিনতে পারেনি, যে বাণী সুপ্ত, অবজ্ঞাত, মুষ্টিমেয় মরুবাসীকে একদিন বিশ্বজয়ের শক্তি এনে দিয়েছিল, যে বাণী অকিঞ্চিৎকর তৃণ-মুষ্টির মধ্যে বিশ্বদাহনকারী আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল! তারা প্রথমটা করলে অবজ্ঞা, পরে

যখন দেখলে যে তাদের তীর্থযাত্রী-দলে ভাঙন ধরবার সম্ভাবনা, তখন অর্ব্বাচীন বোধে শাসন করতে প্রবৃত্ত হ'ল।

বেচারী মহম্মদ! তখন তাঁর কীই-বা সহায়-সম্বল; বোধ হয় আঙুলে গুণে শেষ করা যায়, এই ক'টি তাঁর শিষ্য। তবুও তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ওদের চোখ-রাঙানীতে ভয় পাননি, নির্ভয়ে নিজের সত্যধর্ম্ম প্রচার করে চলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠল, এমন কি তাঁর প্রাণ-সংশয়-সম্ভাবনা দেখা দিল তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না; কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় সেই পরম মুহূর্ত্তে, মদিনা থেকে এল ওঁর আহ্বান! তারা চায় তাঁর সত্যধর্ম্ম, তারা চায় সত্যদ্রষ্টা ঋষিকে! মহম্মদ এ সুযোগ ছাড়লেন না; ৬২২ খৃষ্টাব্দে (মুসলমানরা যে বৎসর থেকে তাদের 'হিজিরা' বা বর্ষ গণনা করে) তিনি মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাত্রা করলেন। সেদিন তাঁকে চুপি চুপি সকলের অজ্ঞাতে মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেদিন যাত্রা করেছিলেন তিনি আবার বিজয়-গৌরবে সেইখানেই ফিরে আসবার জন্য, 'পুনরাগমনায় চ'!

মদিনাতে গিয়ে যখন মহম্মদ নিজের ধর্ম্মপ্রচার করতে শুরু করলেন তখন মক্কার লোকেরা প্রমাদ গণলে, কারণ সিরিয়া থেকে মক্কা আসবার পথে পড়ে মদিনা শহর, তীর্থযাত্রীরা যদি পথেই মহম্মদের মত গ্রহণ করে তাহলে মক্কার আয় একেবারেই কমে যায়। সুতরাং স্থির হ'ল যে, বলপ্রয়োগ করেও অন্তত মহম্মদকে নিরস্ত করতে হবে; দু'একটি ছোট-খাট বিরোধের পর মক্কার এক বিপুল বাহিনী, বোধহয় হাজার-দশেক সৈন্য, মদিনার নগর-তোরণের বাহিরে উপস্থিত হ'ল; কিন্তু দৈব মহম্মদের সহায়, সে যুদ্ধেও তিনি জয়লাভ করলেন। মক্কার লোকেরা বিরোধের আশা একেবারেই ছেড়ে দিল এবং ৬২৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আবার বিজয়ী-

রূপে মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কার অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করলে; যদিচ 'কাবা' এখনও তীর্থস্থানরূপেই গণ্য হচ্ছে!

এইবার মহম্মদ দিকে দিকে তাঁর বাহিনী প্রেরণ করলেন এই নবীন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য; সমস্ত আরব, এমন কি আরবের বাইরে সুদূর চীন, কন্‌স্টান্‌টিনোপল এবং পারস্যের রাজধানীতেও দূত গেল এই অদ্ভুত বার্ত্তা বহন করে—"হে বিশ্ববাসী, তোমরা শোন এবং সতর্ক হও। এই সমস্ত বিশ্বের মালিক সেই এক পরমেশ্বর, আর মহম্মদ তাঁর বাণীর বাহক, ঈশ্বরপ্রেরিত দূত! অবিলম্বে এই পরম সত্য প্রাণে অনুভব করো এবং এই সত্যকেই অবলম্বন করো।"

সুদূর আরবের মরুভূমির মধ্যে যাযাবর বেদুঈনের শহর মক্কা ও মদিনা, তারই সামান্য এক অধিবাসী পৃথিবীর প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটদের কাছে আদেশ করে পাঠালেন তাঁর সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করতে; কল্পনা করতেও বিস্ময় লাগে। কিন্তু যতখানি আত্মপ্রত্যয়, ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং মানসিক বলিষ্ঠতা থাকলে তবে মানুষ এই রকম স্পর্দ্ধা প্রকাশ করতে পারে, ঠিক ততখানিই মহম্মদের ছিল বলে তাঁর পক্ষে ঐ মুষ্টিমেয় বেদুঈন দলকে পৃথিবীর অজেয় শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, মুসলমানদের বিশ্বাস সেগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকেই প্রত্যাদেশরূপে তাঁর পাওয়া এবং সেইগুলিই কোরাণ নামক ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে। খৃষ্টানদের যেমন বাইবেল, মুসলমানদেরও তেমনি কোরাণ—মহাগ্রন্থ। কোরাণের মধ্যে সব চেয়ে বড় যে বস্তুটি আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে তার সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বাণী; জাতি নেই, সম্প্রদায় নেই, ধনী-দরিদ্র কোন ভেদাভেদ নেই, মুসলমান সবাই সমান, সকলেই সেই পরমেশ্বরের পুত্র; তাঁর চোখেও যেমন সকলে সমান,

প্রত্যেক মুসলমানের কাছেও প্রত্যেক মুসলমান তেমনি। এই মহাবাণীই একদা অতগুলি মানুষকে অদ্ভুত একতা-সূত্রে গেঁথে এক অপরাজেয় বাহিনীতে পরিণত করতে পেরেছিল!

মাত্র বাষট্টি বৎসর বয়সে, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রসার

মহম্মদ মারা যাওয়ার পর মুসলমান সমাজের ধর্ম্মগুরু হ'লেন মহম্মদের প্রিয় শিষ্য এবং সহচর খলিফা আবুবকর। ইনি মহম্মদের সমস্ত কথাই অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতেন এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠাও ছিল এঁর অসাধারণ। মহম্মদের যে স্বপ্ন ছিল পৃথিবীব্যাপী মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার, তার কল্পনা আবুবকরের কাছে একবারও অসম্ভব বলে বোধ হ'ল না, তিনি নিতান্ত মুষ্টিমেয় আরব সৈন্য নিয়েই দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ও রকম ভক্তি বা বিশ্বাস থাকলে বোধহয় কোন কাজই অসম্ভব নয়, তাই আবুবকরের কাছেও ঐ সুদূর কল্পনা অসম্ভব রইল না, তিনি অসাধ্য-সাধনই করলেন। সব প্রথম গেল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য; ইয়ারমুকের যুদ্ধে, মহম্মদের মৃত্যুর মাত্র দু'বৎসর পরেই, সম্রাট হিরাক্লিয়াস্ ভীষণ ভাবে মুসলমান বাহিনীর কাছে হেরে গেলেন, এবং তার পর বলতে গেলে বিনা বাধায় তাঁর এশিয়া ও মিশরের সমস্ত রাজ্য-খণ্ডগুলি মুসলমানদের করতল-গত হ'ল। তার পর গেল পারস্য। পারস্যের সম্রাটের কাছে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন হজরত মহম্মদের দূত গিয়েছিল তাঁর চিঠি নিয়ে, তখন সম্রাট তাঁর চিঠি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দূতকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সম্রাটেরই বিপুল শক্তি নগণ্য মুসলমান সৈন্যের কাছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। মুসলমানরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্বে চীনসাম্রাজ্যের সীমান্ত

পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে মিশর, স্পেন ও ফ্রান্সের অর্দ্ধেক অবধি নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে ফেললে।

এই বিপুল সাম্রাজ্য এরা বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি বটে, কিন্তু এতে করে মুসলমানদের লাভ হ'ল ঢের। যেখানে যেখানে এরা গেল সে সব স্থানেই বহুদিন ধরে যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটল। হিন্দুদের কাছ থেকে শিখলে এরা অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শন, গ্রীক সভ্যতা থেকে পেলে এরা বিজ্ঞান, চীনের কাছ থেকে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি শিখে নিলে, এবং ইহুদী, পার্সী, বৌদ্ধ প্রভৃতির কাছ থেকে নূতন নূতন চিন্তার খোরাক ও তত্ত্বালোচনার ধারা ইত্যাদি লাভ করে এই অর্দ্ধ-বর্ব্বর যাযাবর দল মহম্মদের সময় থেকে দু'শ বৎসরের মধ্যেই সভ্য, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল জাতিতে পরিণত হ'ল।

যে সব বীজ এই উর্ব্বর ভূমিতে এসে পড়ল তা যে কত শীগ্‌গির অঙ্কুরিত এবং ফলে ফুলে কিশলয়ে সুশোভিত হয়ে উঠল তা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়। গ্রীক বিজ্ঞানালোচনার পদ্ধতি যা বহুদিন ধরে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল, তা মুসলমানদের হাতে পড়ে যেন নতুন করে জন্মলাভ করলে। অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে এরা অদ্ভুত রকম উন্নতি লাভ করে। এখন যেটাকে আমরা ইংরেজী সংখ্যা বলে জানি, সেটার মূলে হ'ল আরবী সংখ্যা। তার আগে চলত রোমানদের ব্যবহৃত সংখ্যা (যেমন ৯ঃ রোমান IX ; আরবী = 9)। এখনও কোন কোন ঘড়িতে তার ব্যবহার দেখতে পাই। শূন্য দিয়ে সংখ্যা নির্ণয় করা, তাও ঐ আরবরাই প্রথম ইউরোপীয়ানদের শেখায়। উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বীজগণিত বা আলজেবরা যার নাম, তার জন্যও ইউরোপ আরবের কাছে ঋণী। এ ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা Experiment করতে এরাই প্রথম

শুরু করে। আরবের এ্যালকেমিস্ট্রাই বর্ত্তমান ইউরোপীয়ান বৈজ্ঞানিকদের পথ-প্রদর্শক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তারা প্রাচীন সভ্যজাতিদের কাছ থেকে আরও একটি জিনিস যা সংগ্রহ করলে তা হচ্ছে বিলাস। প্রথম যে সব খলিফারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তরবারি ধারণ করেছিলেন তাঁরা দেশের পর দেশ জয় করলেও নিজেদের জীবনযাত্রার ধরণকে এতটুকু বদ্‌লাননি। কিন্তু সে আদর্শ থেকে পরবর্ত্তী সেনানায়করা শীগ্‌গিরই ভ্রষ্ট হলেন। এল আরাম, এল ঐশ্বর্য্য; বড়-বড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হ'ল, দেশ-দেশান্তর থেকে নানাবিধ বিলাসের উপকরণ এসে উপস্থিত হ'ল। তার ওপর দেখা দিল নানারকম মতভেদ, নানারকম দল। আগে কালিফ বা খলিফারা ছিলেন একান্তভাবেই ধর্ম্মগুরু; ওমর, আবুবকর, আলি প্রভৃতি সেই আদর্শ-ই বজায় রেখেছিলেন; তারপর দেখা গেল যে, খলিফারা মধ্যযুগের পোপদের মত আধা-ধর্ম্মগুরু এবং আধা-সম্রাট হয়ে উঠেছেন; আরও কিছুদিন পরে তাঁরা সোজাসুজি সম্রাটই হয়ে উঠলেন। ফলে অখণ্ড মুসলমান-সাম্রাজ্যের ওপর ওঁদের প্রভুত্ব আর রইলো না, মুসলমান-অধিকৃত বিস্তীর্ণ ভূভাগ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে বিভিন্ন রাজ্য ও সাম্রাজ্যে ভাগ হয়ে গেল।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রসার বন্ধ হ'ল মহম্মদের মৃত্যুর মাত্র একশত বৎসর পরে ফ্রান্সের যুদ্ধে। ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট শার্লিমেনের পিতামহ সেনাপতি চার্লস্ মার্টেলের হাত থেকে আরব সেনাদল যে পরাজয় পেল তারপর থেকেই বিশ্বব্যাপী মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা একেবারে চলে গেল। অথচ ঐ বিশেষ যুদ্ধটিতে আরবরা জয়লাভ করলে আজ ইউরোপের ইতিহাস বোধ হয় সম্পূর্ণ অন্যরকম করে লিখতে হ'ত! কারণ তখন ইউরোপে আর এমন কেউ ছিল না যে এদের বাধা দিতে পারত।

মুসলমানরাও যে আর সে চেষ্টা করতে পারলে না, তার কারণ আগেই বলেছি; ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করার যে উদ্দীপনা, সেটা তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পেরিয়ে স্পেনের মধ্য দিয়ে নতুন সাহায্য পাঠানো সম্ভব হ'ল না, আর ওখানকার মুসলমানরা পিরেনিস পর্ব্বতমালার এধার পর্য্যন্ত যে রাজ্য বিস্তার করেছিল তাই সামলাতেই তখন বিব্রত। আরও অসুবিধা হ'ল, ওমায়েদ খলিফাদের হাত থেকে আব্বাসীদের হাতে যখন খলিফার পদ ও ক্ষমতা এসে পড়ল। বিখ্যাত হারুণ-অল-রসিদ, যাঁর নাম আমরা বহু রূপকথা ও উপাখ্যানের মধ্যে শুনতে পাই, তিনিও এই সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। এঁরা বোগদাদে রাজধানী তুলে আনলেন, ফলে ইউরোপ থেকে সেটা আরও দূর হয়ে পড়ল। তাছাড়া এঁদের বোধ হয় সে উচ্চাশাও ছিল না। তা না হ'লে আফ্রিকায় স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, স্পেন প্রভৃতি সবই খলিফার হস্তচ্যুত হয়ে গেল, সেগুলোকে পুনরায় হস্তগত করবার জন্য তেমন কোন চেষ্টা করলেন না কেন? অথচ আব্বাসী খলিফাদের সময় বোগদাদের সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও শক্তির খ্যাতিতে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। হারুণ-অল-রসিদের দরবারে সুদূর চীন থেকে এবং ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমেনের সভা থেকে নিয়মিত ভাবে রাজদূত আসত এমন কথাও শোনা যায়।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রসারের সময় প্রাচ্যভূখণ্ড

মুসলমানধর্ম্ম যখন একটু একটু করে পৃথিবীর বুকে প্রসারিত হ'তে শুরু হ'ল তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কি অবস্থা, এইবার একটু দেখা যাক। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বলাটা হয়ত ঠিক হবে না, কারণ আমরা বলব বিশেষ করে প্রাচ্যভূখণ্ডেরই

কথা। ইউরোপের কথা আগেই বলেছি, আমেরিকা ত তখন আমাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত, আর বিপুল আফ্রিকার উত্তরদিকের দুই-একটি দেশ ছাড়া সমস্তটাই বনজঙ্গল এবং হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। মানুষ যারা বাস করত, তাদের কথা ইতিহাসে লেখা যায় না, তারা একান্তভাবে প্রকৃতির সন্তান।

তাহ'লে প্রথমেই চীনের কথা ধরা যাক্। কারণ মানব-ইতিহাসে চীনই বরাবর অগ্রগণ্য, এতবড় গৌরবময় ইতিহাস বোধ হয় আর কারুর নেই। মহম্মদ যখন জন্মান তখন চীনে তাং-বংশ রাজত্ব করছেন। এই তাং-বংশের রাজত্বকালেই চীন খ্যাতি ও ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ-শিখরে উঠেছিল। অন্তত রাজ্যসীমা যে তার এই সময় সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। পশ্চিমে কাস্পিয়ানের পূর্ব্ব তীর থেকে শুরু করে বর্ত্তমান পারস্যের সীমানা ছুঁয়ে অর্দ্ধেক আফগানিস্থান, হিন্দুকুশ, তিব্বত পেরিয়ে পূর্ব্ব-দক্ষিণে সুদূর কাম্বোডিয়া এবং আনাম পর্য্যন্ত তখন যদি কেউ বেড়িয়ে আসত, তা হ'লেও তাকে চীন সাম্রাজ্যের বাইরে পা দিতে হ'ত না। রোমানদের এক সময় ধারণা ছিল যে সারা পৃথিবীটাই বুঝি তাদের আয়ত্তের ভেতরে, কিন্তু রোমসাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিস্তৃতির সময়েও তারা এতবড় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

তাং-বংশের আমলে শুধু যে চীন আয়তনেই বেড়েছিল তা নয়, তার আভ্যন্তরীণ উন্নতিও যথেষ্ট হয়েছিল। মানবসভ্যতার দু'টি প্রধান অঙ্গ, ছাপা ও কাগজ, যে চীনেরই দান তা এর আগে বলেছি। তাং-বংশেরই আমলে কাগজ তৈরি এবং কাঠের অক্ষরের সাহায্যে ছাপার চলন শুরু হয়। এ ছাড়া বর্ত্তমানে রাজ্যশাসনের পক্ষে যা অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে, সেই বারুদও ঐ সময় চীনেরা আবিষ্কার করে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, 'সেন্সাস্' বা লোক-গণনা, যার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য সভ্য দেশ এই সেদিন

মাত্র উপলব্ধি করেছে, চীনে তা শুরু হয়েছে প্রায় আঠারশ' বছর আগে, ১৫৬ খৃষ্টাব্দে! সমস্ত দরকারী কথাই ওরা আর সকলের অনেক আগে ভেবেছিল, আশ্চর্য্য!

হ্যাঁ, আর একটি কথা অবান্তর হ'লেও এখানে বলি, যে-চায়ের পেয়ালা না হ'লে আজ আমাদের একটি বেলাও চলে না, সেই চা খেতে শুরু করে চীনেরাই প্রথম এবং তা ঐ তাং-দের আমলেই!

তাং-বংশের সম্রাট তাই-ৎসুং যখন রাজত্ব করছেন তখন চীনে আর দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের কাছ থেকে এক দূত আসে তাঁর নবপ্রচারিত ধর্ম্মের বাণী বহন করে এবং ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে আসে খৃষ্টান্ ধর্ম্মপ্রচারকের দল। সম্রাট উভয় দলকেই সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয় দলকেই নিজেদের ধর্ম্মপ্রচারের অনুমতি দিলেন। বললেন, আমাদের এ স্বর্গীয় রাজ্যে ত কিছুরই অভাব নেই, তোমরা থাক এবং পারো ত তোমাদের ধর্ম্ম প্রচার করো, আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই!

তাঁরই অনুমতিক্রমে ক্যাণ্টনে যে মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়েছিল, তা আজও টিকে আছে, এবং খুব সম্ভব আজ সেইটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রাচীন মসজিদ্।

তাই-ৎসুং-এর রাজত্বকালেই বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। ইনি দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং বহুদিন ধরে এখানকার নানা দেশ ঘুরে বেড়াবার পর দেশে ফিরে গিয়ে তাং-সম্রাটের নির্দ্দেশ-ক্রমে এক দীর্ঘ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেছিলেন। তাঁর সে গ্রন্থ শুধু বিস্ময়কর ভ্রমণ-কাহিনী নয়, পৃথিবীর ইতিহাসের সে এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং তখনকার দিনের

ভারতবাসীদের রীতি-নীতি অনেকখানিই জানা যায় তাঁর ঐ ভ্রমণ-বিবরণ থেকে।

হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন ৬২৯ খৃষ্টাব্দে। আসবার পথে তাঁকে 'গোবি'র ভয়ঙ্কর মরুভূমি পার হয়ে আসতে হয়েছিল; বলা বাহুল্য, তাতে করে বহু বারই তাঁর জীবন-সংশয় ঘটেছিল। এই সময় গোবির ধারে একটি জনপদ-সমষ্টির বর্ণনা করেছেন হিউয়েন সাঙ, যার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেকখানিই যোগ ছিল, যদিচ সে গৌরবের এখন আর চিহ্নমাত্র নেই! এই রাজ্যটি এককালে খুবই বিখ্যাত ছিল, এর সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে; কিন্তু আজ তা বালুকাস্তূপের অন্তরালে একেবারেই মিলিয়ে গেছে।

ওখানে কিছুদিন থেকে উত্তর-পশ্চিমের পথ বেয়ে হিউয়েন সাঙ যখন ভারতবর্ষে পৌঁছলেন তখন কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধন ভারতের সম্রাট। ইনিই ভারতবর্ষের শেষ উল্লেখযোগ্য হিন্দু সম্রাট। হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে বহুদিন কাটান, সেই সময়ে এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু অধ্যয়নও করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁর সঙ্গে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পরিচয় হয়েছিল। সেই জন্য এঁর বিবরণ থেকে সম্রাট-কবি হর্ষবর্দ্ধনের অনেক কথাই জানা যায়। সম্রাট আগে শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে খুব অনুরক্ত হন, কিন্তু তবু তিনি প্রয়াগে হিন্দুদের মাঘমেলাতে আসতেন এবং মুক্তহস্তে, নিঃস্ব না হওয়া পর্য্যন্ত দান করে যেতেন। কথিত আছে, তাঁর রাজ-ভাণ্ডার ত শূন্য হয়ে যেতই, নিজের রাজপরিচ্ছদ পর্য্যন্ত দান করে ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করতেন।

হর্ষবর্দ্ধনের আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা দেখে হিউয়েন সাঙ খুশী হয়েছিলেন; তিনি তাঁর গ্রন্থে, ভারতীয় শাসনপদ্ধতির, ভারতের লোক এবং তাদের আচার-ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি তদানীন্তন কালের ভারতবাসীদের বর্ণনা করতে

গিয়ে লিখেছেন যে, 'তারা সত্যবাদী, আত্মসম্মান-বিশিষ্ট এবং সরল ছিল। তাদের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর কিন্তু জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল।' হিউয়েন সাঙের এ সুখ্যাতির মূল্য আছে, কারণ যে দেশ থেকে তিনি এসেছিলেন সে দেশ তখন মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানে।

হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে আরও একটি সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন—সে হচ্ছে তুর্কী-স্থান। খাঁ উপাধিধারী বৌদ্ধ রাজারা তখন তুর্কী-স্থানের শাসক, এবং তখনই তাদের রাজ্য-সীমা বেশ বিস্তৃত। এই তুর্কী-স্থানের লোকেরাই পরে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকখানি ওলট-পালট ঘটিয়েছিল।

হর্ষবর্দ্ধনের সময়েই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দস্তুর মত অবনতি ঘটেছিল, তবু হর্ষবর্দ্ধন কিছুদিন তার মর্য্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারপরই আবার এর দ্রুত অধঃপতন শুরু হ'ল। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে আবার হিন্দুধর্ম্ম এমন করে মাথা তুলল যে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মকে একেবারেই এ দেশ থেকে বিদায় নিতে হ'ল।

এই পর্য্যন্ত গেল ভারতবর্ষের কথা, এইবার একটু বৃহত্তর ভারত বা আনাম-কাম্বোডিয়া প্রভৃতির দিকে তাকানো যাক্।

বৃহত্তর ভারত বলবার কারণ এই যে, মালয়েশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই দ্বীপগুলিতে উত্তরকালে মানবজীবনের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তার মূল উৎস ছিল আমাদের ভারতবর্ষেই। দক্ষিণ ভারতের কয়েক দল লোক বাণিজ্য করতে এই দিকের সমুদ্রে যাতায়াত শুরু করে এবং সুযোগ ও সুবিধা বুঝে এই দ্বীপগুলিতে স্থায়ী বাসা বাঁধে।

এই উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয় প্রায় উনিশ-শ' বছর আগে, এখন আমরা যাকে আনাম বলি, সেইখানে; তখন ওর নাম ছিল

চম্পারাজ্য। তারপর ধীরে ধীরে চারিদিকে এরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে চম্পার রাজধানী পাণ্ডুরঙ্গম্ বড় শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে খুব খ্যাতি লাভ করে এবং সে খ্যাতি বহুদিন পর্য্যন্ত তার ছিল। প্রায় দু-শ' বছর পরে কাম্বোজ মাথা তুলতে পাণ্ডুরঙ্গমের খ্যাতি কিছু কমে যায়। ঐ সময় ইন্দোচীনেও দু'তিনটি বিভিন্ন রাজ্য গড়ে উঠেছিল; এদের কেউ ছিল হিন্দু, কেউ ছিল বৌদ্ধ। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কিছু কিছু ঝগড়াঝাঁটিও যে না বাধত এমন নয়, তবে তা ধর্মের জন্য নয়, প্রধানত বাণিজ্যব্যাপার নিয়েই। এরা বাণিজ্য করতেই প্রথম ওদেশে গিয়ে পড়ে আর তখনও পর্য্যন্ত বাণিজ্যই ছিল ওদের প্রধান উপজীবিকা।

এইভাবে বহুদিন কাটবার পর নবম খৃষ্টাব্দে জয়বর্ম্মন্ নামে এক রাজা ঐ সব ছোট রাজ্যগুলি জয় করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর ছেলে যশোবর্ম্মন্ আংকোরে নূতন যে রাজধানী তৈরি করেন, ঐশ্বর্য্যে ও বিপুলতায় তা এ অঞ্চলের সমস্ত শহরকেই ম্লান করে দিয়েছিল। 'আংকোর থম্' বা 'ওংকার ধাম' এখন আর নেই বটে, কিন্তু এখনও আংকোরবাতের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তার সেই পূর্ব্ব-খ্যাতির কিছু কিছু সাক্ষ্য দিচ্ছে। শতাব্দীর প্রাকৃতিক অত্যাচারে আজ তার অনেক কিছুই ভেঙেচুরে গেছে কিন্তু তবু আজও তা সমস্ত জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

তখনকার দিনের এই সমস্ত শহরগুলিতে বড় বড় মন্দির ও বড় বড় বাড়ী তৈরি করানো হ'ত, যেন পরস্পরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে। এর জন্য দক্ষিণ ভারত থেকেই প্রচুর অর্থ দিয়ে ভাল ভাল স্থপতি এবং শিল্পী আমদানি করা হ'ত, আর তারা বহু বৎসরের পরিশ্রমে এই সব এক একটি বিপুল কীর্ত্তি গড়ে তুলত। এই জন্যই বাঙ্গালী

কবি গর্ব্ব করে বলেছেন,

'স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম কাম্বোজে ওংকার ধাম মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি।'

কাম্বোডিয়ার এই বিপুল সাম্রাজ্য বহুদিন, প্রায় চারশ' বৎসর পর্য্যন্ত, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তারপর এ'কে মানুষ এবং ভগবান একসঙ্গে মারলেন। পূর্ব্বে আনামের লোকেরা এবং উত্তরে চীন বার বার আক্রমণে এ'কে অস্থির করে তুলতে লাগল, তার ওপর পশ্চিম দিকে কিছু কিছু ঘরোয়া বিদ্রোহ ত কিছুদিন ধরে লেগে ছিলই! এতেই ওর ভিত্তি জীর্ণ হয়ে এসেছে, এমন সময় ভগবানের মার এসে পড়ল ওর মাথায়। ওংকার ধাম যার কূলে গড়ে উঠেছিল, সেই মেকং নদীর মুখ গেল বুজে, ফলে সমস্ত নদীর জল পিছু হ'টে, একদা যা ছিল বিশ্ববিখ্যাত শহর, তাকে জলাভূমিতে পরিণত করে দিলে। এ ধাক্কা আর কাম্বোডিয়ার সম্রাটরা সামলাতে পারলেন না; এর পর থেকেই বিপুল কাম্বোডিয়া কখনও বা আনাম, কখনও বা শ্যামের আশ্রিত প্রদেশরূপে গণ্য হ'তে লাগল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে যখন ভারতবাসীরা এই দ্বীপগুলি অধিকার করতে শুরু করে, সেই সময়ে এদেরই এক দল, পহ্লবীরা, গিয়ে সুমাত্রায় বাসা বাঁধে। এরাও খুব উন্নতি করেছিল; মলয় উপদ্বীপ, বোর্ণিও, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, এমন কি সুদূর ফরমোজা পর্য্যন্ত একসময়ে এদের অধিকারে এসেছিল! ইংরেজদের মতই সমুদ্র পেরিয়ে রাজ্য শাসন করতে হ'ত বলে এরাও সমুদ্রের ঘাঁটি আগলানোর ব্যবস্থা করেছিল। ইংরেজদের যা পূর্ব্বদেশের প্রধান ঘাঁটি ছিল সিঙ্গাপুর, সেখানে বন্দর স্থাপন করে ঐ সুমাত্রার লোকেরাই। এই সাম্রাজ্যটিকে ইতিহাসে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়।



দক্ষিণ ভারতের হিন্দু-শিল্প-নিদর্শন

শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যও টিকে ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, তারপর জাভার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিজয়ের পতন হ'ল। শ্রীবিজয়ের সম্রাটরা জাভার পশ্চিমার্দ্ধ জয় করেছিলেন বটে, পূর্ব্ব জাভায় হিন্দু রাজারা কিন্তু বরাবরই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। এঁরা শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ সম্রাটদের ওপর বোধ করি কখনই প্রসন্ন ছিলেন না, ওঁদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে বিপুল বিক্রমে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করলেন। শ্রীবিজয়ের সুন্দর শহরটি জাভার সম্রাটদের হাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ফিউডাল প্রথা ও হোলি রোমান সাম্রাজ্য

রোমসাম্রাজ্যের পতনের সময় ইউরোপের যে কী অরাজক অবস্থা ছিল তা আগেই বলেছি। এই অরাজক অবস্থা থেকে ধন-প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওখানকার জনসাধারণ একটু একটু করে জীবনযাত্রার যে প্রথাটি গড়ে তুললে, সেইটিই 'ফিউডাল সিস্টেম' নামে পরে বিখ্যাত হয়েছিল। সাধারণ প্রজারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একজনকে সর্দ্দারের মত মান্য করত এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তার কাজকর্ম্ম করে দিত কিংবা কিছু কিছু খাজনা দিত। যুদ্ধের সময় ঐ সর্দ্দারের অধীনেই তারা লড়াই করত। এইসব সর্দ্দাররা আবার একজন লর্ড বা ব্যারন বা ডিউক উপাধিধারী জমিদারকে খাজনা দিত এবং যুদ্ধের সময় নিজেদের দলবল নিয়ে গিয়ে ওঁদের পতাকাতলে সমবেত হ'ত। এইসব জমিদারদেরও ওপরে থাকতেন একজন রাজা বা সম্রাট।

প্রথমটা এই প্রথায় সুবিধাই হয়েছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে যখন ব্যারনরা নিজেদের দুর্গ ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন আর অনবরত পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করলেন, তখন এদের নিয়ে রাজা ও সম্রাটদের দস্তুরমত বিব্রত হ'তে হয়েছিল। অনেক সময়ে রাজা ও সম্রাটরা এদের হাতের পুতুল মাত্র হয়ে থাকতেন। যাই হোক—এই ফিউডাল প্রথাটি থেকেই 'হোলি রোমান এম্পায়ার' নামে যে পদার্থটি ইউরোপে তৈরী হয়েছিল, এইবার তার কথা কিছু বলব।

এর আগে যে শার্লিমেনের কথা উল্লেখ করেছি, সেই শার্লিমেনই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটার পত্তন করলেন। এঁর পিতামহ, যাঁর হাতে মুসলমান বাহিনীর প্রথম পরাজয় ঘটেছিল, সেই চার্লস মার্টেল ছিলেন তদানীন্তন ফ্রাঙ্কস্‌দের রাজার কর্ম্মচারী মাত্র। পরে ইনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ওঠেন এবং এঁর ছেলে পেপিন্ সেই রাজবংশের উচ্ছেদ করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন। শার্লিমেন ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন বর্ত্তমান জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, হলাণ্ড, এমন কি হাঙ্গারী পর্য্যন্ত ওঁদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। এতবড় রাজ্যের মালিক হয়ে তাঁর যে প্রথমেই রোম-সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের কথা মনে পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং তিনি গোড়াতেই ইটালী জয় করে রোমের অধীশ্বর হয়ে বসলেন।

ব্যাপারটা হয়ত এখানেই মিটে যেত, কিন্তু গোল বাধল পোপকে নিয়ে। পোপেরা শুধু যে মানুষের পরকালের মালিক হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে রাজী হচ্ছিলেন না, আগেই তার একটু আভাষ দিয়েছি। তদানীন্তন পোপও এই সুযোগটা ছেড়ে দিলেন না, তিনি সেণ্টপিটার্স গির্জ্জেয় শার্লিমেনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সহসা একটা মুকুট ওঁর মাথায় পরিয়ে দিয়ে ওঁকে সিজার বলে ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ, যেন তিনিই ওঁকে সম্রাট করে দিলেন।

পোপের এ চাতুরীতে শার্লিমেন খুশী হননি। তিনি বরং মরবার আগে তাঁর ছেলে লুইকে বলে গিয়েছিলেন যে তিনি যেন পোপকে তাঁর মাথায় মুকুট পরাতে না দেন, পোপের হাত থেকে মুকুট কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে মাথায় পরেন। কিন্তু লুই ছিলেন, যাকে বলে অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু গোছের লোক, তিনি একেবারেই পোপের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। ফলে পোপের ক্ষমতা দিন দিন বেড়েই চলল।

লুই মরবার পর শার্লিমেনের বিরাট সাম্রাজ্য ভেঙে গেল; ফ্রাঙ্কস্‌দের মধ্যেই দু'দল হ'ল। যারা ফরাসী ভাষায় কথা বলত তারা একদল এবং যারা জার্ম্মাণীতে বলত তারা হ'ল অপর দল। এ তফাৎটা অবশ্য একটু একটু করেই গড়ে উঠছিল, এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। জার্ম্মানরা ফরাসীদের অধীনতা কাটিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য বা জমিদারীতে ভাগ হয়ে গেল বটে, কিন্তু সম্রাট পদবীটা ওরাই প্রায় একচেটে করে নিলে। লুই মরবার পর অটো নামে একজনকে ওরা সম্রাট বলে ঘোষণা করলে এবং অটো ইটালীতে এসে পোপের হাত থেকে সম্রাটের মুকুট প'রে গেলেন। এর পর থেকে বহুদিন, কয়েক শতাব্দী ধরেই, এইভাবে মধ্য ইউরোপের একজন সম্রাট নির্ব্বাচিত হ'তে লাগলেন। যাঁর ক্ষমতা বেশী তিনিই সবাইকে ভয় দেখিয়ে সম্রাট হতেন। কিছুদিন পরে হিউক্যাপেটের রাজত্বকালে আর একবার ফ্রান্সের অবস্থা ফেরে বটে, কিন্তু সম্রাট পদবী আর এঁরা পাননি। এর ভেতরে সবচেয়ে মজার কথা হ'ল এই যে, এই সম্রাটদের সঙ্গে যদিও রোমের কোন সম্পর্কই ছিল না, তবু এঁরাই হলেন 'হোলি রোমান্ এম্পারার'!

কিন্তু এঁরা সব নামে রোমান্ সম্রাট হ'লেও পোপরা খুব সহজে এঁদের পোষ মানাতে পারেন নি। পোপরা যে মানুষের ইহকাল আর পরকাল উভয়েরই মালিক হয়ে বসবেন এটা সহজে ইউরোপের রাজা ও সম্রাটরা মেনে নেন নি। দীর্ঘকাল ধরে উভয় পক্ষে এ নিয়ে নানা রকম লড়াই চলেছিল। উভয় পক্ষই ছলে বলে কৌশলে পরস্পরকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্য্যন্ত মধ্যযুগে পোপেরাই অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

পোপেরা একটি অস্ত্রও তৈরী করেছিলেন বড় মজার; তার

নাম হ'ল 'এক্সকমিউনিকেশান' অর্থাৎ অভিশাপ দেওয়া। পোপেরা যাকে 'এক্সকমিউনিকেট' করতেন, কোন গির্জ্জায় তার স্থান হ'ত না, কোন পুরোহিত তার ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে আসতেন না, এমন কি মৃত্যুকালে ভগবানের নাম শোনাবারও একজন লোক পাওয়া যেত না। খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে সত্য সত্যই ইউরোপের সকলে এই সব বিশ্বাস করত। সুতরাং যত বড় শক্তিশালী নৃপতিই হোন না কেন, পোপেরা এককথায় তাঁদের জব্দ করে দিতেন। একবার কোন একজন সম্রাট দৈবাৎ পোপের বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁকে সারাপথ হেঁটে ইটালীতে এসে, বরফের মধ্যে একটি পুরো রাত পোপের প্রাসাদের বাইরে খালিপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাপ চাইতে হয়েছিল! এমন দিনও পোপদের গেছে।

কিন্তু পোপের এ ক্ষমতা যে চিরস্থায়ী হয়নি তা বলাই বাহুল্য। চার্চ্চের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য যত বাড়তে লাগল তত তার লোভও বেড়ে চলল। পোপ ও তাঁর দল-বলেরা ছলে-বলে-কৌশলে ঐ দুটি জিনিস অনবরত গ্রাস করতে শুরু করলেন। তার জন্য কোন পাপেই তাঁরা পশ্চাৎপদ হতেন না। শেষে একদিন যখন জনসাধারণ দেখলে যে দেশের ভাল ভাল জমি যা কিছু সবই কতকগুলি অকাল-কুষ্মাণ্ড পাদরীরা গ্রাস করে বসে আছে এবং তাতেও তাদের লোভ মেটেনি, তখন তারা, এমন কি ধর্ম্মগুরুদের ভয়ও অগ্রাহ্য ক'রে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শুরু করলে।

নর্ম্মানদের আবির্ভাব ও ক্রুসেড্‌স্

পোপের দলের সঙ্গে গ্রীক চার্চ্চের বিবাদের কথা এর আগে বলেছি। পোপ যখন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন তখন গ্রীক চার্চ্চ

কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু পোপ তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন না, তার কারণ কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সাম্রাজ্য চলে গেলেও, বহু ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করেও ঐ রাজ্যের কিছু তখনও টিকে ছিল। কিন্তু খৃষ্টের মরবার প্রায় হাজার খানেক বছর পরে এমন অবস্থা হ'ল যে ওদের ঐ সামান্য রাজ্যটুকুও বাঁচিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়ল। পোপ ত আছেনই, তার ওপর একদিকে নর্ম্মানদের অত্যাচার আর একদিকে মুসলমানদের।

নর্ম্মান বা উত্তুরে লোক বলছি যাদের, তারা হ'ল আসলে বর্ত্তমান নরওয়ের লোক। এর আগে মধ্য এশিয়া থেকেই যে-সব যাযাবররা গিয়ে একদা ওখানে বাসা বেঁধেছিল, তারাই উত্তরকালে শক্তিমান হয়ে আবার দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে পড়ল। একদল রাজা ক্যানিউটের সঙ্গে গিয়ে ইংলণ্ড জয় করলে, একদল ফ্রান্সের উত্তরদিক জয় করে নর্ম্মাণ্ডীতে বসবাস শুরু করলে, এবং আর একদল রুরিকের অধীনে রাশিয়াতে গিয়ে লোকালয়ের পত্তন করলে। ক্যানিউট যখন নরওয়ে, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ডের অধিপতি, তখন এদের কয়েক দল সুদূর আইস্‌ল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড, এমন কি আমেরিকাতে পর্য্যন্ত বিজয়-অভিযান করে। ক্যানিউট মরবার পর তাঁর বংশধররা ইংলণ্ডের সিংহাসন ধরে রাখতে পারেন নি বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর-একদল নর্ম্মানই এসে ইংলণ্ড দখল করে (১০৬৬ খৃঃ)।

এই নর্ম্মানরা ছিল মূলত জলদস্যু গোছের। এরা বেশীর ভাগই জাহাজে চড়ে গিয়ে লুঠতরাজ করে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করত। এইভাবেই এদের একদল গিয়ে একদিন সিসিলি দখল করে ফেললে এবং রোম আক্রমণ করে খানিকটা লুঠতরাজ করে নিলে। এরা, আর রাশিয়ার দিক থেকে আর একদল নর্ম্মান কন্‌স্টান্‌টিনোপলের সম্রাটকে ভীষণ বিব্রত

করে তুললে। ওদিকে এই, আর এশিয়ার দিক থেকে আরও ভয়ঙ্কর বিপদ এগিয়ে এল, সে হ'ল মুসলমানদের নব অভ্যুদয়।

মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয়রূপে খলিফারা তখনও রাজত্ব করছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁদের ক্ষমতা খুবই কমে গেছে। স্পেন ও আফ্রিকা ত আগেই স্বাধীন হয়েছিল, যেটুকু ভূখণ্ডের ওপর নামে এঁদের অধিকার ছিল, তার মধ্যেও প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। গজনীর সুলতান মামুদ, যাঁর পরিচয় ভারতবাসীদের কাছে দিতে যাওয়া বাহুল্য, যাঁর পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত, তিনি ত একরকম খলিফাকে চোখ রাঙিয়েই রেখেছিলেন। আর সবচেয়ে যারা প্রবল হয়ে উঠেছিল তারা হ'ল তুর্কীস্থানের অধিবাসী, সেলজুক্ তুর্কী নামে এরা ইতিহাসে খ্যাত। এরা অপেক্ষাকৃত হালে মুসলমান হয়েছিল, সুতরাং এদের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও রণোন্মাদনা তখনও প্রচুর, এরা পুরোদমেই বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে। এশিয়ার সমস্তটা ত কেড়ে নিলেই, কন্স্টান্টিনোপলই যায় যায় হয়ে উঠল। এই দারুণ বিপদে কন্স্টান্টিনোপলের সম্রাট ভয়ে দিশেহারা হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছেই, যাঁর সঙ্গে বহুকাল ধরে তাঁদের বিবাদ চলছিল এবং মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই যে বিবাদ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল—অর্থাৎ লাটিন চার্চ্চের সর্ব্বময় কর্ত্তা পোপের কাছে!

পোপ গ্রীক চার্চ্চের ওপর নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবার এ সুযোগ ছেড়ে দিলেন না। তিনি ধুয়ো তুলে দিলেন যে, জেরুসালেমে প্রভু যীশুর সমাধিমন্দির অ-খৃষ্টানদের হাতে থাকাই ক্রীশ্চানদের পক্ষে ঘোর কলঙ্কের কথা, তার ওপর ক্রীশ্চান তীর্থযাত্রীরা যেভাবে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে তা সহ্য করা কোন ক্রীশ্চানেরই উচিত নয়। ধর্ম্মের এই দারুণ অবমাননার

বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত ক্রীশ্চানদের ধর্ম্ম-যুদ্ধ বা ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে সমবেত হ'তে অনুরোধ করলেন। দেশে দেশে এই বার্ত্তা নিয়ে লোক গেল ; বিশেষ করে সন্ন্যাসী পিটার নামে এক ব্যক্তি নগ্নপদে চটের পোষাক প'রে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এমন প্রচারকার্য্য চালালেন যে, জনসাধারণ বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠল। যতদিন না জেরুসালেম উদ্ধার হয় ততদিন ক্রীশ্চানদের সমস্ত অন্তর্ব্বিরোধ বন্ধ থাকবে, এই মর্ম্মে পোপ এক আদেশ জারী করলেন এবং কয়েক দল উত্তেজিত লোক দলপতি বা বিশেষ কোন ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়ল (১০৯৬ খৃঃ)। বলা বাহুল্য যে এরা কোন সুবিধেই করতে পারলে না। তার পরের বছর গডফ্রে নামে এক নর্ম্মানের অধিনায়কত্বে আর একটি বিরাট দল জেরুসালেমে যাত্রা করলে ; এরাই বহু চেষ্টা করে ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের পর জেরুসালেম দখল করলে।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জেরুসালেম উদ্ধার হ'ল, সেই মুহূর্ত্তেই আবার গ্রীক চার্চ্চ ও লাটিন চার্চ্চের বিবাদ জেগে উঠল। এই বিবাদ চলতে চলতেই, জেরুসালেম জয়ের সত্তর বৎসর পরে আবার এক মুসলমান বীর ক্রীশ্চানদের শত্রুরূপে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। ইনিই হলেন ইতিহাস-বিখ্যাত সালাদীন, যাঁর বীর্য্য ও ঔদার্য্যের অসংখ্য কাহিনী আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। সালাদীন ছিলেন কুর্দ্দী-স্থানের লোক, নিজের প্রতিভা-বলে মিশরের অধীশ্বর হয়েছিলেন। সালাদীন এক বিপুল বাহিনী সমবেত করে জেরুসালেম আক্রমণ করলেন এবং অনায়াসে ক্রীশ্চানদের হাত থেকে তা কেড়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার এক ক্রুসেডের আয়োজন হ'ল। এবার ইউরোপের বড় বড় রাজা-মহারাজারা নিজেরাই সঙ্গে এলেন। তার মধ্যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা 'সিংহ-হৃদয়' রিচার্ডও ছিলেন। কিন্তু এঁরা সালাদীনের হাত থেকে জেরুসালেম উদ্ধার করতে পারলেন না, বরং নিজেরাই

নানা রকমে বিব্রত হলেন। এর পর আর জেরুসালেম উদ্ধার করা ক্রীশ্চানদের পক্ষে সম্ভবও হয়নি। বহু শতাব্দী পরে একেবারে গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৮ খৃঃ) ইংরেজরা তুর্কীদের কাছ থেকে ঐ শহরটি কেড়ে নিয়েছেন।

অবশ্য তাই বলে আর যে ক্রুসেড হয়নি তা নয়। ১২০২ খৃষ্টাব্দে যে ক্রুসেডাররা যুদ্ধ করতে এল, তারা মোটে জেরুসালেমের দিকেই গেল না। তারা সোজাসুজি কন্‌স্টান্‌টিনোপল আক্রমণ করলে এবং বহু রক্তপাতের পর কন্‌স্টান্‌টিনোপল জয় করে সেখানে পোপের অনুগত এক ব্যক্তিকে সম্রাট রূপে অভিষিক্ত করলে। অর্থাৎ, এতদিন পরে পোপের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। যদিও, এই লাটিন সম্রাটরা বেশীদিন এ সাম্রাজ্য ভোগ করতে পারেন নি, বছর পঞ্চাশ-ষাট পরেই আবার গ্রীক চার্চ্চের দল এসে ওদের তাড়িয়ে কন্‌স্টান্‌টিনোপল দখল করেছিল। এর পর থেকে আরও বহুদিন গ্রীক চার্চ্চের দল এখানে রাজত্ব করে। একেবারে, প্রায় দু-শ' বছর পরে তুর্কীরা এসে ওদের চিরকালের মত কন্‌স্টান্‌টিনোপল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

এই সময়টা পোপেরা বোধ হয় তাঁদের ক্ষমতার চরম শিখরে উঠেছিলেন। বড় বড় রাজা, মহারাজা, সম্রাটের দল পর্য্যন্ত পোপের নামে কাঁপতেন, জনসাধারণের ত কথাই নেই। কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁরা বেশীদিন ভোগ করতে পারলেন না। তাঁরা শুধু যদি রাজা-মহারাজাদেরই শত্রু করতেন তা'হলে জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকত। কিন্তু তাঁরা বড়দেরও যেমন শত্রু করতে লাগলেন, তেমনি বিষাক্ত করে তুলতে লাগলেন দরিদ্র প্রজাদের মন। পাদ্রীর দলের সর্ব্বগ্রাসী লোভ তাদের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করতে লাগল, অথচ প্রতিবাদ করবার উপায় নেই—ওঁদের হাতে আছে ধর্ম্মের অস্ত্র।

কিন্তু তবুও এ যথেচ্ছাচারিতা বেশীদিন চলল না। রাজাদের মধ্যে প্রথম এ ব্যবস্থার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন বোধ হয় সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। পোপ তাঁকেও 'এক্সকমিউনিকেট' করেন, কিন্তু ফ্রেডারিক তা গ্রাহ্যও করেননি বরং সমস্ত রাজাদের সভায় বিস্তৃত পত্র লিখে বেশ করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে পোপ হলেন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মালিক, রাজনৈতিক ব্যাপারে বার বার তাঁর মাথা গলাবার কোন অধিকার নেই। ওপর থেকে যেমন ফ্রেডারিকের প্রতিবাদ এল, জনসাধারণও তেমনি একটু একটু করে এই যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে লাগল। তার মধ্যে ইংরেজ ওয়াইক্লিফ (১৩৮৪), চেক জন্ হাস্ (১৩৯৮) এবং জার্ম্মান মার্টিন লুথার (১৪৮৪-১৫৪৬) প্রভৃতিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত করেছিলেন। এর জন্য এঁদের বা এঁদের দলভুক্তদের কম লাঞ্ছিত হ'তে হয়নি। পোপের দল এই বিদ্রোহদমনের জন্য কোন নিষ্ঠুরতাতেই পশ্চাৎপদ হন নি। কিন্তু তবু লোকের মনে অসন্তোষ বেড়েই চলল।

পোপের বিরুদ্ধেও যেমন লোক মাথা তুললে, রাজাদের স্বেচ্ছাতন্ত্র সম্বন্ধেও একটু একটু করে সজাগ হয়ে উঠল। রাজা হলেন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তিনি যা করবেন তা-ই ন্যায়-সঙ্গত, এমনি একটা বিশ্বাস বহুদিন থেকেই ইউরোপে প্রচলিত ছিল। প্রথম এ বিশ্বাস ভাঙল বোধহয় ইংরেজরা। 'সিংহ-হৃদয়' রিচার্ডের ভাই জন যখন ইংলণ্ডের রাজা তখন তাঁর অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠায় রাজ্যের ব্যারনরা সমবেত হয়ে জোর করে তাঁকে দিয়ে প্রজাদের প্রতি ন্যায়াচরণের এক প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে নেন। এরই নাম হ'ল "ম্যাগ্না কার্টা" বা "মহাসনদ"। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল।

মোঙ্গলদের অভ্যুত্থান

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করতে করতে আমরা বরাবরই দেখেছি যে, যে নব নব প্রাণশক্তি বার বার পৃথিবীর জীবনযাত্রাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে, তার প্রথম বিকাশ হয়েছে মধ্য এশিয়া থেকেই। মানুষ বার বার বিস্মিত হয়েছে ঐ দিকে চেয়েই।

এ ব্যাপার বহুদিন থেকেই চলে আসছে। বহুসহস্র বৎসর থেকে। আর এখনও, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও আর একবার মধ্য এশিয়ার দিকে তাকিয়ে আমাদের চোখ ঝল্‌সে গেল। উত্তর চীনের মোঙ্গোলিয়া দেশ, তখন ওকে মরুভূমি বললেও অত্যুক্তি হ'ত না, তারই চাল-চুলাহীন ছোট ছোট কয়েকদল যাযাবর, অকস্মাৎ একদিন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দণ্ডপাণি হয়ে দাঁড়াল, আর সারা পৃথিবী মাথা হেঁট করে তাদের সে ক্ষমতা স্বীকার করে নিল। যার দ্বারা এ অঘটন ঘটল, তিনি হলেন চেঙ্গিজ খাঁ; ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে সামান্য এক তাতার যাযাবরের ঘরে তিমুচিন্ নামে এই অদ্ভুত মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

খাদ্যের জন্য এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, বাসস্থান অধিকাংশ সময়েই উন্মুক্ত আকাশের নীচে, কোন গৃহ নেই—সুতরাং গৃহের বন্ধনও নেই; মায়া-মমতা কম—এমনি একটা নির্ম্মম আবেষ্টনীর মধ্য থেকে নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে তিমুচিন্ এগিয়ে চললেন সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পাদপীঠের দিকে; শেষকালে একান্ন বৎসর বয়সের সময়, যখন আমরা সংসার থেকে অবসর নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি, সেই পরিণত বয়সে একদা মোঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র হয়ে চেঙ্গিজ খাঁকে দলপতি বলে মেনে নিলে এবং সেই দিন থেকে তাঁকে 'কাগান্" বা মহান্ খাঁ (বা সম্রাট) উপাধি দিয়ে ললাটে বিজয়টিকা এঁকে দিলে। জীবনের অর্দ্ধ-

শতাব্দী কাল কাটিয়ে দেবার পর, যৌবনকে বিদায় দিয়ে সেই হ'ল তাঁর বিজয়-যাত্রার সূত্রপাত।

কিন্তু চেঙ্গিজ যখন তাঁর জয়যাত্রা শুরু করলেন সে সময়কার পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থার কথাটা বোধ হয় এখানে একটু বলা দরকার। চীনে তাং বংশের কথা আগেই বলেছি। তাং বংশের পতনের প্রধান কারণ হ'ল চতুর্দ্দিক থেকে যাযাবরদের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থার অভাব। চীনকে বহুদিন থেকেই এই যাযাবরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, যদিও সেটা আত্মরক্ষার যুদ্ধ তবু তার ফলেই এই সব যাযাবররা উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে বারবার ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাং বংশের শেষ রাজারা এদের যেন আর বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলেন না; তার ওপর প্রজারা অকারণ করভারে প্রপীড়িত হচ্ছিল; তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এঁদের তাকাবার অবসর ছিল না। এমনি একটা সময়ে আর একটি বংশ এল চীনের সিংহাসনে। এরা হ'ল সুং—এদের প্রতিষ্ঠাতার নামও কাওৎসু (৯৬০ খৃঃ)।

এরা এসেও প্রজাদের বিশেষ সুবিধা হ'ল না। দেশ এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছিল যে বোধ হয় তা থেকে কোন সুবন্দোবস্ত করাও শক্ত। তবু একাদশ শতাব্দীতে সুং-দেরই এক মন্ত্রী, ওয়াং-আন্‌শি একটা পঙ্কোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনেক ভাল ভাল কথাই চিন্তা করেছিলেন, এমন কি, যা এতদিনে আমরা একটু একটু করে সবে ভেবে দেখতে শুরু করেছি, তাও তিনি তখন ভেবেছিলেন। কিন্তু তখনও মানুষের মন এতটা আধুনিক ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়নি বলেই হয়ত তারা সে মত গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর সে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন দরিদ্র প্রজাদের খাজনা কমিয়ে ধনীদের আয়ের ওপর বেশী করে কর ধার্য্য করতে (অর্থাৎ অতি-আধুনিক 'আয়-কর'), প্রজাদের

রাজকোষ থেকে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে, তাদের সমস্ত শস্য একটা বাঁধা দামে রাজভাণ্ডার থেকে কিনে নিয়ে সেখান থেকেই বিক্রী করার পদ্ধতি প্রচলন করতে, টাকাতে যারা খাজনা দিতে পারবে না তাদের কাছ থেকে সেই দামের শস্য নিতে এবং সমস্ত রকম 'বেগার' দেওয়া বন্ধ করতে (অর্থাৎ রাজ-সরকারের কাজ করলেও যেন তারা পুরো মজুরীই পায়)।

ব্যবস্থা প্রত্যেকটিই ভাল—কিন্তু সেটা এতদিন পরে আমরা ঠেকে শিখেছি, তখন কেউ তা গ্রহণ করেনি। ফলে সুং-রাও বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। উত্তরে খিতানদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তারা ডেকে আনলে পশ্চিম দিক থেকে কীন্‌দের ; কীন্‌রা এলও বটে, খিতানদেরও দমন করলে সত্য কথা, কিন্তু তারপর আর তারা নড়ল না। তারা সমস্ত উত্তর চীন দখল করলে এবং পিকিং-এ রাজধানী স্থাপন করলে। এ অভিনয় আমাদের দেশেও বারবার ঘটেছে—আর আমাদের মনে হয় যে এ ঘটাই উচিত। যে নির্ব্বোধ জাতি নিজের শত্রু দমন করতে না পেরে বাইরে থেকে পরাক্রান্ত অপর পক্ষকে ডেকে আনে—তাদের এই শাস্তিই অনিবার্য্য। আমাদের রাজা জয়চাঁদও শিহাব্-উদ্দীন ঘুরীকে এবং মহারাণা সংগ্রামসিংহ বাবরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এমনই একটা ভরসাতে, আর তার ফলও তাঁরা পেয়েছিলেন হাতে-হাতেই।

সুং-রা ওখান থেকে পেছিয়ে এসে দক্ষিণ চীনে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন (১১২৭-১১৬০), তারপর মোঙ্গলদের বন্যায় তাঁরা সকলেই ভেসে গেলেন। এই 'দক্ষিণে সুং'-দের আমলে কিন্তু চীনের শিল্প-কলা খুব উন্নত হয়—তখনকার দিনের চীনে-মাটির বাসন দেখে আজও লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

চীনের কথা গেল—ভারতবর্ষে তখন মুসলমান শাসন প্রচলিত

হয়েছে। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর থেকেই উত্তর ভারতে যে অরাজক অবস্থা চলছিল তার মধ্য থেকে কোন একজন রাজার পক্ষেই মাথা তোলা সম্ভব হয়নি। মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য গুপ্ত রাজারা আবার একটু প্রাধান্য লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দাক্ষিণাত্যে এই সময় কয়েকজন হিন্দু-রাজাও খুব প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলেন, তবে তাঁরা উত্তর ভারত নিয়ে কোন কালেই মাথা ঘামান নি। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এবং ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের গন্ধ পেয়ে প্রথম এল আরবরা, সামান্য একটা ছুতোয় সিন্ধু আক্রমণ করলে এবং বছর দুই ধরে চেষ্টা করার পর ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করে ফেললে। কিন্তু সে ঐ সিন্ধু পর্য্যন্তই, আরবরা তার বেশী এগোয়নি কোনদিন। যারা এল, ঐখানেই তারা চিরস্থায়ী বাসা বাঁধলে এবং হিন্দুদের সঙ্গে বেশ মিলে মিশে বাস করতে লাগল। এরা হিন্দুদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে, আর সে শিক্ষা কেউ কেউ সুদূর পশ্চিমে, নিজেদের দেশেও বয়ে নিয়ে যায়। বহু আরব তক্ষশীলায় এসে বিশেষ করে হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যেত, কারণ হিন্দু পদ্ধতিতে শিক্ষিত চিকিৎসকদের সম্মান ওদের দেশে ছিল খুব বেশী।

কিন্তু আসল মুসলমান-বিজয় হ'ল এর পর থেকে বহুদিন পরে। খলিফারা দুর্ব্বল হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিস্তর ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য চারিদিক থেকে মাথা তোলে তা আগেই বলেছি। তার মধ্যে গজনীর রাজারাও অন্যতম। এই গজনীরই এক রাজা সুবুক্তিগীন প্রথম ভারতের দিকে নজর দিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বারবার হানা দিয়ে বিব্রত করে তুললেন। পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে বিপুল এক বাহিনী নিয়ে কাবুলের দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তিনি হলেন পরাজিত। সুবুক্তিগীন আর বেশী দূর আসেন নি বটে, তবে তাঁর

ছেলে সুলতান মামুদ উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হানা দেন এবং বিস্তর ধনরত্ন লুঠতরাজ করে নিয়ে যান। তিনি অবশ্য সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য আসেন নি, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য দেখে তাঁর চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল। আর সেইগুলো যতটা সম্ভব নিজের দেশে চালান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মথুরা শহরের বড় বড় বাড়ী দেখে তিনি বিপুল উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, এবং হিন্দু স্থপতি ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের রাজধানীতে, বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করবার জন্য। এই সুলতান মামুদের সভাতেই ফারদৌসী নামে বিখ্যাত কবি ছিলেন, আর এঁর সঙ্গেই আর একজন বিখ্যাত লোক ভারতবর্ষে আসেন, তিনি হলেন আল্‌বীরুণী। পণ্ডিত আল্‌বীরুণী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত শিক্ষা করেছিলেন। আল্‌বীরুণীর বিবরণ থেকে আমরা তখনকার দিনের অনেক কথাই জানতে পারি।

মামুদেরও প্রায় দেড়শ' বছর পরে শিহাব্‌-উদ্দীন মহম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণ করলেন। ইনিই ভারতবর্ষে প্রথম রাজ্য-স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসেন বললে খুব অত্যুক্তি হয় না। প্রথমটা ইনি দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের কাছে হেরে যান কিন্তু তার পরের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করে দিল্লী অধিকার করেন। এই সময়ে শিহাব্‌-উদ্দীনেরই এক ক্রীতদাস কুত্‌ব্‌-উদ্দীন দিল্লীর শাসনকর্ত্তারূপে এখানে আসেন, পরে নিজেকে ইনি স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা করেন। এই দাসরাজ কুত্‌ব্‌-উদ্দীনেরই পরবর্ত্তী সম্রাট ইল্‌তুৎমিস্‌ হলেন চেঙ্গিজ খাঁর সমসাময়িক।

ভারতবর্ষে দাসরাজরা রাজত্ব করছেন, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় রাজত্ব করছেন তখন খিবার সম্রাটরা (সমরকন্দ্‌ ছিল এঁদের রাজধানী), আর তারও পশ্চিম দিকে টিমটিম করছিলেন মহামান্য

খলিফারা, সেলজুক্ তুর্কীদের আশ্রিতরূপে। মিশরে তখনও সালাদীনের বংশধররা বেশ প্রতাপের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও তখনও লুপ্ত হয়নি; আর ইউরোপের ত কথাই নেই—'পৃথিবীর বিস্ময়' সেই দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (যাঁর কথা আগেই বলেছি) তখন হোলি রোমান্ সম্রাট।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে তখন শক্তিশালী রাজা বা সম্রাটের একান্ত অভাব ঘটেনি বরং সংখ্যায় তাঁরা একটু বেশীই ছিলেন। এই সময় এতগুলি সাম্রাজ্য বিজয় করবার বাসনা নিয়ে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যে মানুষটি দেখা দিলেন, একথা আগেও বলেছি, তাঁর বয়স তখন পুরো একান্ন বৎসর। কিন্তু তিনি ছোকরা ছিলেন না বলেই বোধ হয় অন্যান্য তরুণ দিগ্বিজয়ীর মত একধার থেকে যদিচ্ছা রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে পড়েননি, অতি সাবধানে আট-ঘাট বেঁধে তবে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। তিনি নিজে ত সুনিপুণ রণকুশল সেনাপতি ছিলেনই, বহু সাধারণ সেনা-নায়ককে নিজে শিখিয়ে অজেয় সেনাপতিতে পরিণত করেছিলেন।

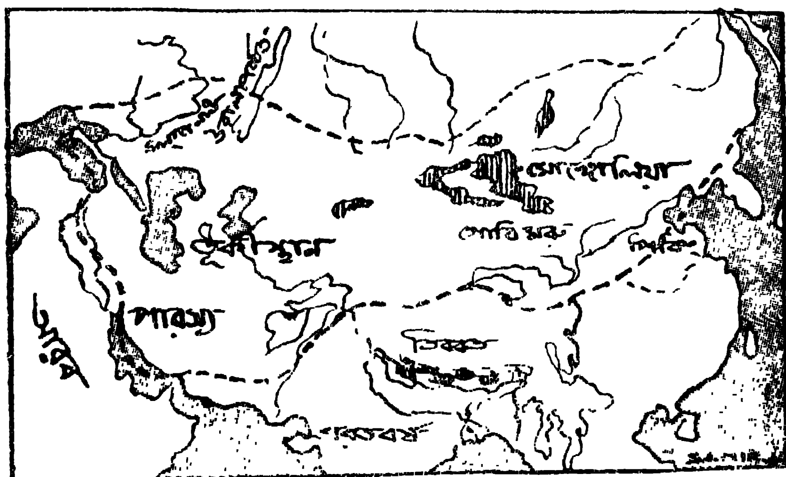
তিনি খুব হুঁশিয়ার হয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন এবং একটার পর একটা রাজ্য তাঁর করতল-গত হ'তে লাগল। অনেকে মনে করেন যে যেহেতু মোঙ্গলরা যাযাবর ছিল, মাঠের মধ্যে চামড়ার তাঁবুতে দিন কাটাত, সেহেতু তারা অসভ্য বর্ব্বর ছিল এবং কেবল মাত্র বিপুল সংখ্যাধিক্যেই এতগুলি লোককে জয় করতে পেরেছিল। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। চেঙ্গিজ খাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণ থেকে আমরা বেশ পরিষ্কার দেখতে পাই যে, শুদ্ধ মাত্র বুদ্ধি-কৌশলেই তাঁর পক্ষে অতগুলি দেশ জয় করা সম্ভব হয়েছিল। চেঙ্গিজ খাঁর মত রণকুশল সেনাপতি পৃথিবীর ইতিহাসে আর একজনও জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।

প্রথমেই তিনি কীন্‌দের দমন করে উত্তর চীন দখল করলেন,

তারপর গোবির পশ্চিমে তাঙ্গুত রাজ্য জয় করে খিবার সাম্রাজ্যে হানা দিলেন। খিবার সাম্রাজ্য নাকি তাঁর প্রথমটা আক্রমণ করবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু খিবার সম্রাটের নির্ব্বুদ্ধিতাতেই তাঁর এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ঘটল। তিনি অপমান করে বসলেন চেঙ্গিজ খাঁকে, আর চেঙ্গিজ খাঁ যখন সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে এলেন তখন আর তাঁর সেই সমৃদ্ধ রাজ্যখণ্ডের চিহ্ন পর্য্যন্ত রইল না। সমরকন্দ, হিরাট, বাল্‌খ্‌, বোখারা প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার ইতিহাস-বিখ্যাত শহরগুলি, তাদের অগণিত প্রাসাদ, অসংখ্য অধিবাসী এবং বহুদিনের সংস্কৃতি নিয়ে দিগ্বিজয়ীর পায়ের তলায়, বলতে গেলে একেবারেই, বিলুপ্ত হয়ে গেল। যে পথ দিয়ে চেঙ্গিজ গেলেন সে পথের চতুর্দ্দিক শ্মশানে পরিণত হ'ল। তবে ভারতের এবং দাসরাজাদের ভাগ্য ভাল যে, খিবার যুবরাজকে অনুসরণ করে ভারতের দ্বারপ্রান্তে এলেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত এদেশে প্রবেশ করেননি। ঐখান থেকে সোজা উত্তরে যাত্রা করলেন এবং সমস্ত রাশিয়া জয় করে আবার ফিরে এসে কঠিন হস্তে তাঙ্গুতের বিদ্রোহ দমনে মন দিলেন। ফলে বাহাত্তর বৎসর বয়সে যখন চেঙ্গিজ খাঁ মারা গেলেন তখন তিনি এধারে কোরিয়া, চীন থেকে শুরু করে ওধারে মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান এবং উত্তরে সমগ্র রাশিয়া মায় হাঙ্গারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিপুল সাম্রাজ্যের মালিক।

তাঁর সে দিগ্বিজয় আলেকজান্দারের মত শুদ্ধমাত্র কয়েকটি যুদ্ধ-জয়েই পর্য্যবসিত হয়নি যে দিগ্বিজয়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার খান্‌-খান্‌ হয়ে যাবে—তাঁর রাজ্যশাসনের দিকেও দস্তুরমত নজর ছিল। তিনি ঐ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে এমন শাসন-শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর ছেলে ওগদাই খাঁ সিংহাসনে এসে বসলেন তখন কোথাও তার একটি টুকরোও খসে

পড়ল না। অথচ শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন যে এই বিরাট পুরুষটি একবর্ণও লেখাপড়া জানতেন না, সমস্ত শাসনকার্য্য চলত মুখে মুখে। অবশ্য যখন তিনি লেখার উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলেন, তখনই তিনি যুবরাজ ও রাজকর্ম্মচারীদের লেখাপড়া শিখতে আদেশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এতবড় সম্রাটের একটা প্রাসাদ পর্য্যন্ত ছিল না, মুক্ত প্রকৃতির সন্তান, তিনি প্রকৃতির



চেঙ্গিজ খাঁর সাম্রাজ্য

মধ্যে থাকতেই ভালবাসতেন। শুধু তিনি নন, তাঁর ছেলে ওগদাই খাঁ পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদ বলতে মূল্যবান-আসবাব-সজ্জিত তাঁবুই বুঝতেন। এঁদের ধর্ম্মও ছিল খুব সহজ, এঁরা আকাশকেই একমাত্র উপাস্য বলে জানতেন। চেঙ্গিজ থেকে দু-তিন পুরুষ পরে যখন সাম্রাজ্য তিন-চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল, তখন এক-এক দল বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করতে শুরু করলে। চীনের মোঙ্গলরা হ'ল বৌদ্ধ, তুর্কীস্থানের মুসলমান এবং ইউরোপে যারা বাস করেছিল তারা খুব সম্ভব হ'ল ক্রীশ্চান।

ওগদাই খাঁ মানুষটি নিজে অপেক্ষাকৃত শান্তি-প্রিয় লোক হ'লেও মোঙ্গলদের দিগ্বিজয়-বাসনা তখনও মেটেনি, সুতরাং তাদের অগ্রগতি অব্যাহতই রাখতে হ'ল। আর বাধাই বা ওদের দেবে কে? মোঙ্গলদের সৈন্যরা যে-কোন ইউরোপীয়ান্ বাহিনীর চেয়েই ঢের বেশী সুশিক্ষিত, তা ছাড়া যুদ্ধে শক্তি অপেক্ষা মস্তিষ্কের মূল্য যে বেশী এ-কথাটাও মোঙ্গলরা ওদের চেয়ে বেশী জানত; আর ওদের সহায় ছিল চীন থেকে সদ্য-আহরিত কামান ও বারুদ। সুতরাং এদের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারলে না, সমস্ত চীন গেল, সমস্ত রুশ, পোল্যাণ্ড সব। পোল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর মিলিত বাহিনী একবার শেষ চেষ্টা করতে গেল কিন্তু ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারলে না (১২৪০-১২৪১)। তবে আশ্চর্য্যের কথা এই যে এ বিজয়ের পরও কিন্তু মোঙ্গলরা আর অগ্রসর হ'ল না, হ'লে বোধ হয় সমস্ত ইউরোপই ওরা নিয়ে নিতে পারত। অতঃপর ওরা হাঙ্গারীর তদানীন্তন অধিবাসীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে সেইখানেই বসবাস করতে শুরু করলে।

ওগদাই খাঁর মৃত্যুর পর মাঙ্গু খাঁ মোঙ্গলদের সম্রাট হলেন। তিনি তাঁর এক ভাই কুবলাই খাঁকে করে দিলেন চীনের শাসনকর্ত্তা, আর এক ভাই হুলাগুকে পাঠালেন তুর্কীস্থানে। এই কুবলাই খাঁ বোধ হয় চেঙ্গিজের পরেই এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বিখ্যাত ব্যক্তি। কুবলাই খাঁর চীন বড় ভাল লেগেছিল; খুব সম্ভব তার নাগরিক সভ্যতা, তার শিক্ষা-দীক্ষাই এই যাযাবরটিকে আকৃষ্ট করেছিল। যাই হোক—তিনি পিকিনে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সম্পূর্ণভাবে চীনের শাসনেই মন দিলেন। চীনও এই লোকটিকে ঘরের লোকের মত ভাবত সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে চীনে বসবাস করতে লাগলেন। মাঙ্গু খাঁ জীবিত থাকতেই তিনি 'চীনের সম্রাট্' এই পদবী নেন।

হুলাগু এধারে পারস্য আর সিরিয়া মোঙ্গল-সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। বাগ্‌দাদ হয়ত বেঁচে যেত কিন্তু তদানীন্তন খলিফার নির্ব্বুদ্ধিতায় তাও গেল। তাঁর ধৃষ্টতায় চটে গিয়ে হুলাগু বাগ্‌দাদ আক্রমণ করলেন এবং দীর্ঘদিন অবরোধের পর শহর দখল করে তা ধ্বংসের হুকুম দিলেন। আরব্যরজনীর বাগ্‌দাদ, হারুন-অল-রসিদের অতিসাধের বাগ্‌দাদ, দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি-বিজড়িত বাগ্‌দাদের আর চিহ্ন পর্য্যন্ত রইল না।

কিন্তু মাঙ্গু খাঁর মৃত্যুর পরই অখণ্ড মোঙ্গল-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। কুবলাই চীন নিয়েই ব্যস্ত রইলেন, সাম্রাজ্যের দিকে চাইবার তাঁর ইচ্ছাও ছিল না, অবসরও ছিল না। ফলে চারিদিকেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা মাথা তুলতে লাগল। আরও কিছুদিন পরে এদের ক্ষমতা একেবারেই লোপ পেয়ে গেল। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে কুবলাই-প্রতিষ্ঠিত য়ুয়ান বংশ রাজ্যচ্যুত হয়ে চীনে মিং বংশের প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং ১৪৮০ অব্দে গ্র্যাণ্ড ডিউক অফ মস্কো মোঙ্গলদের অধীনতা অস্বীকার করে নিজেই রাশিয়ায় স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন।

কুবলাই-এর মৃত্যুর পর একবার মাত্র আমরা মোঙ্গলদের নাম শুনতে পাই। চেঙ্গিজেরই এক বংশধর তৈমুর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সহসা মাথা তুলে দাঁড়ান এবং বংশের পূর্ব্ব গৌরব কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে আনেন। তৈমুর দিল্লী থেকে শুরু করে সিরিয়া পর্য্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু তৈমুরের মৃত্যুর পরেই আবার 'যথাপূর্ব্ব'! তারপর, তৈমুরের বহুদিন পরে, ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে, এদেরই বংশের এক গৃহহারা সন্তান, বাবর, নিজের দলবল নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে একদা ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হন এবং আফগান (বা পাঠান) রাজা ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে মুঘল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের আকবর ও

আওরংজেব পৃথিবী-বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। এঁদেরই আমলে মুসলমানরা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করতে সক্ষম হন। মুঘলরা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের সম্রাট পদবী বহন করেছিলেন, একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা সে মর্য্যাদা এঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেন।

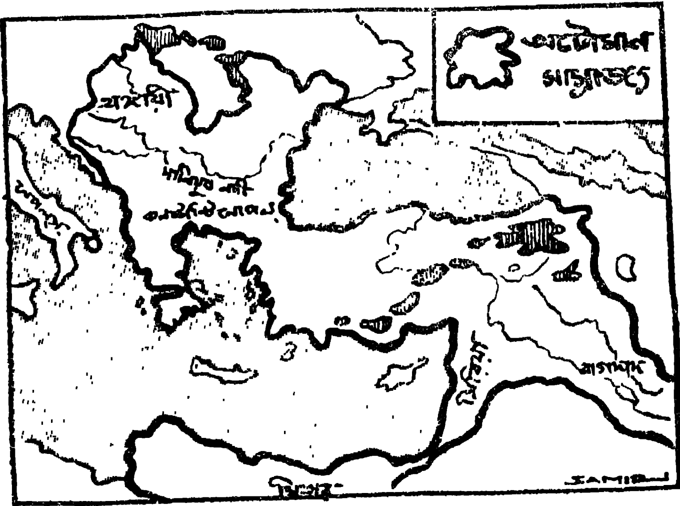
অটোমান্ সাম্রাজ্য

মোঙ্গলদের অভ্যুত্থানে পৃথিবী এবং বিশেষ করে ইউরোপের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। মোঙ্গলরা যখন তুর্কীস্থানে হানা দিয়েছিল তখন একদল তুর্কী ওখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এশিয়া মাইনরে আশ্রয় নেয়। তখন বোধ হয় ওদের বিশেষ কোন আখ্যা ছিল না, পরে নাম দেওয়া হয় অটোমান তুর্কী। যাই হোক্—তখন এ ঘটনা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি, সবাই নিশ্চিন্ত ছিল। তারপর অকস্মাৎ এই দলটি রাজ্য জয়ে প্রবৃত্ত হ'ল। এশিয়া-মাইনরে নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে এরা দার্দ্দেনেলিস্ পার হয়ে ইউরোপে এসে উপস্থিত হ'ল। গ্রীসের খানিকটা দখল করে বর্ত্তমান সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার প্রায় সমস্তটাই এরা জয় করে নেয়। কন্স্টান্টিনোপলের সম্রাটরা তখনও টিকে ছিলেন, কিন্তু ১৪৫৩ অব্দে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তাও দখল করে নিলেন। অর্থাৎ এতদিনের রোমসাম্রাজ্যের শেষ স্মৃতিটুকুও পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হ'ল।

এই ঘটনায় প্রথমটা ইউরোপে খুব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এক-আধ জন ক্রুসেডের প্রস্তাবও করেছিলেন, কিন্তু পরে সকলকারই মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তখন কোন শক্তিই এদের ঘাঁটাতে সাহস করলে না। শুধু তাই নয়, এরা প্রাচীন খলিফা

পদবীও অধিকার করলে এবং এই সেদিন পর্য্যন্ত খলিফা পদবী এদেরই ছিল।

তার পর থেকে এরা দ্রুত উন্নতির দিকেই চলতে লাগল। একটু একটু করে ষোড়শ শতাব্দীতে ওধারে হাঙ্গারী এবং এধারে বাগ্‌দাদ, মিশর ও প্রায় সমস্ত উত্তর আফ্রিকা এরা অধিকার করে নিলে। এই সময়ে এদের নৌবল-ও হয়ে উঠেছিল প্রবল, সমস্ত ভূমধ্যসাগর তখন বলতে গেলে এদের অধিকারে ছিল। সে সময় সকলে মনে করেছিল যে তুর্কীরা বোধ হয় সমস্ত ইউরোপই দখল



করবে, আর সে সম্ভাবনা খুব সুদূরও ছিল না। এরা একবার ভিয়েনার দোর পর্য্যন্ত হানাও দিয়েছিল; কোন মতে প্রচুর ঘুষ দিয়ে তবে সম্রাট অব্যাহতি পান। অবশ্য এধারে যখন এই অগ্রগতি চলেছে, ওধারে তখন আর একটি বহুদিনের অধিকার মুসলমানদের হাত থেকে খসে পড়ল, সে হল স্পেন; পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার চেষ্টায় স্পেনের সর্ব্বশেষ মুসলমান অধিকারটুকুও ক্রীশ্চানদের হস্তগত হয়।

ভিয়েনার দোর থেকে ফিরে আসার পর তুর্কারা ইউরোপে আর অগ্রসর হ'তে পারেনি। তাই বলে ওদের সেখান থেকে কেউ হটাতেও পারেনি। একেবারে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীকরা প্রথম এদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ছ' বৎসর ধরে প্রাণপণে যুদ্ধ করে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ তখন চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেউ ওদের সাহায্য করতে আসেনি। ছ' বৎসর পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া গ্রীসের দিকে যোগ দেয় এবং আরও বৎসর-দুই যুদ্ধ করার পর আদ্রিয়ানোপল্‌-এর সন্ধি-সর্ত্তানুসারে গ্রীস, রুমানিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশগুলি তুর্কী-সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই থেকেই গ্রীসে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

এর পরেও ইউরোপ থেকে তুর্কীকে তাড়াবার বহু চেষ্টা করা হয়। এমন কি এই সেদিন, অর্থাৎ ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের পর পর্য্যন্ত ; কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয়নি।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

এইখানে আর একটি কথা না বললে মোঙ্গলদের আমলের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মোঙ্গলরা যখন ইউরোপের দোরে গিয়ে হানা দিয়েছে তখনও ইউরোপের লোকেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাদের জানা-শোনার বাইরে যে এত বড় বড় দেশ আছে, এত বিস্তৃত এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য আছে, বা (সব চেয়ে যেটা বড় কথা) সে দেশগুলি যে তাদের চেয়ে ঢের বেশী সভ্য ও শিক্ষিত, সে কথা তারা কল্পনাই করতে পারত না ; প্রথম যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের পরিচয় করিয়ে দিলে সে হচ্ছে এক ইটালিয়ান ভবঘুরে—মার্কো পোলো তার নাম।

মোঙ্গলরা বিদেশীর প্রতি যে খুব সদয় ব্যবহার করত একথা

আগেই বলেছি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে বোধ হয় তাদের দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে তথ্য ও জ্ঞান লাভের ইচ্ছা। যাই হোক তারা বিদেশী বণিকদের খুব সাদর অভ্যর্থনা করে এবং তাদের পণ্যের খুব ভাল দাম দেয়—এই কথাটা প্রচারিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর দেশ-বিদেশ থেকে বহু শিল্প ও বিলাসের দ্রব্য এসে তাদের রাজসভায় জড়ো হ'ত। এমনিই একটা লোভে আকৃষ্ট হয়ে একদা সুদূর ভেনিস থেকে তুই ভাই, মাফিও পোলো ও নিকোলো পোলো, বাণিজ্য করতে মোঙ্গল-সম্রাটের দরবারে এসে হাজির হ'ল।

সম্রাট এদেরও সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। এদের মুখে ক্রীশ্চান ধর্ম্মের বিবরণ শুনে খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের পোপকে আমার অভিবাদন জানিয়ে ব'লো যে তিনি যেন অবিলম্বে একশ'-টি পণ্ডিত আমার দরবারে পাঠিয়ে দেন যারা তোমাদের ধর্ম্মের ব্যাপারটা আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারবে! পোলো-রা মহোৎসাহে দেশে ফিরে এল কিন্তু দেশের আর পোপের তখন এমনি অবস্থা যে একশ' কেন একটি পণ্ডিতও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। বছর তুই পরে হতাশ হয়ে আবার যখন ওরা চীনে ফিরে এল, তখন মাত্র তিনজন লোক ওদের সঙ্গে সঙ্গে এল—জন-তুই ছোট-দরের পাদ্রী আর নিকোলোর ছেলে মার্কো।

কিন্তু যে দীর্ঘ এবং বিপদসঙ্কুল পথ পার হয়ে এই দলটিকে আসতে হয়েছিল তার কথা শুনলে আজও রোমাঞ্চ হয়। সমুদ্র পার হয়ে এশিয়া মাইনরে প'ড়ে, প্যালেস্টাইন, আর্ম্মিনিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্যের মধ্য দিয়ে এসে তুর্কীস্থানের বালখ খাসগড় হয়ে গোবির মরুভূমি পেরিয়ে তবে পিকিন। এ পথ অতিক্রম করা বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার দিনেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তখনকার ত কথাই নেই! এই পথে পিকিন পৌঁছতে দলটির

সাড়ে তিন বৎসর সময় লেগেছিল। তাও সম্ভব হয়েছিল সঙ্গে কুবলাই খাঁর নামাঙ্কিত স্বর্ণ-মোহর ছিল ব'লে। সেটা যেখানে দেখানো হয়েছে সেইখানেই যতটা সম্ভব সুখ-সুবিধা পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা সুবিধে এদের খুব হয়েছিল। এই দীর্ঘ দিন ধরে পথ অতিক্রম করতে এরা শুধু যে বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছিল তা নয়, বিভিন্ন দেশের ভাষা ও আচার-ব্যবহারও আয়ত্ত করতে পেরেছিল। মার্কো ত আসতে আসতে মোঙ্গল ও চীনে-ভাষা এমন সুন্দর শিখে ফেললে যে কুবলাই খাঁ খুশী হয়ে ওকে রাজদপ্তরে তৎক্ষণাৎ এক চাকরীই দিয়ে দিলেন।

মার্কো প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ ছিল ব'লে শীগ্গিরই কুবলাই খাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তিনি ওকে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত করে পাঠাতে লাগলেন। চীনেরাও ওকে যেন আপনজন বলে গ্রহণ করলে। কিন্তু বিপদ হ'ল এইখানেই, কারণ যখন এরা দেশে ফিরে যেতে চাইল তখন কুবলাই আর ওকে ছাড়তে চাইলেন না। অবশেষে দীর্ঘ সতের বৎসর পরে দৈবক্রমে ওদের ছুটি মিলল। পারস্যের মোঙ্গল সম্রাটের জন্য মহিষী চাই, কুবলাই বিশ্বাস করে আর কাউকে সে কাজের ভার দিতে পারলেন না, মার্কোদেরই রাজকন্যার অভিভাবক করে পাঠালেন। আসবার সময় ওরা আর পুরোনো পথে ফিরল না, সুমাত্রা, জাভা, দক্ষিণ ভারত হয়ে পারস্যে পৌঁছল, তারপর সেখান থেকে জল-পথে ওরা দেশে পৌঁছল, দেশত্যাগ করার চব্বিশ বৎসর পরে, ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে।

মার্কো যখন ফেরে তখনও সুমাত্রায় শ্রীবিজয় সম্রাটরা রাজত্ব করছেন, দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্য রাজারা। মার্কো প্রাচ্য দেশের বিরাট কাণ্ড-কারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার বন্দরে বন্দরে অসংখ্য বাণিজ্যতরী, তার মাঠে মাঠে সোনার ফসল, তার কারখানায় কারখানায় বহুমূল্য জরির কাপড়, রেশম, শাল ওর চোখ ধাঁধিয়ে

দিয়েছিল। তাদের বিস্ময়কর যুদ্ধকৌশল, তাদের সুশৃঙ্খল রাজ্য-শাসন প্রণালী দেখে ও বিস্মিত না হয়ে পারেনি। আর সর্বোপরি তাদের বিপুল ঐশ্বর্য্য!

কিন্তু মার্কোরা যখন ফিরে এসে দেশের লোককে এইসব কথা বলতে গেল তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলে না। ওদের সব কথাই 'গাঁজা' বলে উড়িয়ে দিত, যদি না মার্কোরা তাদের চোখের সামনে চীন থেকে আনা হীরে-জহরৎ মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিত! কিন্তু বেচারীরা! কী ক'রে তারা বিশ্বাস করবে যে তাদের দেশে যখন 'ডাক' যাওয়ার কথা লোকে শোনেইনি, তখন কুবলাই খাঁর দেশে দৈনিক চারশ' মাইল হিসাবে সরকারী ডাক যাতায়াত করে। সুদূর দক্ষিণ-ভারতে এমন একজন মহিলা আছেন যিনি তাদের দেশের যে কোন সম্রাটের চেয়ে বেশী দক্ষতার সঙ্গে বিপুল এক রাজ্য শাসন করেন। তারা যখন ভিজে কাঠে ফুঁ পেড়ে পেড়ে অস্থির তখন চীনের লোকেরা মাটি খুঁড়ে কয়লা বার করে জ্বালায়।

মার্কো দেশে ফেরার বৎসর কতক পরে জেনোয়ার সঙ্গে ভেনিসের এক যুদ্ধ হয়। সেই সম্পর্কে মার্কো কিছুদিন জেনোয়ার কারাগারে বন্দী ছিল। সেইখানে বসেই সে তার অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ-বিবরণ লেখে। এই বইটি বেরোবার পর ইউরোপের লোকেরা সহসা সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠল। তাদের চোখ জ্বলে উঠল লোভে, তাদের কল্পনা ছুটল সেই অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য্যের দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে, বুকে তাদের রক্ত উঠল নেচে—এক সুবিপুল সম্ভাবনায়!

দশম পরিচ্ছেদ

ইউরোপের নব জাগরণ

মোঙ্গলরা যখন ইউরোপের দোরে হানা দিয়েছে তখন ইউরোপকে ভদ্রতার খাতিরে যদি বা বর্ব্বরদের দেশ না-ই বলা যায়, অন্তত এটা স্বীকার করতেই হবে যে তখনও তার প্রাণশক্তি ছিল সুপ্ত, তার চৈতন্য ছিল জড়ত্ব-যুক্ত। তবে প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকেই অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই, ওদের নবজাগরণ শুরু হ'ল। এর প্রথম কারণ হ'ল বোধ হয় ফিউডাল প্রথার আংশিক দমন। এই প্রথা ইউরোপের তদানীন্তন সমস্ত সভ্য দেশগুলিকেই কুরে কুরে খাচ্ছিল। এই সময় থেকেই রাজারা একটু একটু করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যারনদের যথেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে শুরু করেছিলেন। এর ফলে, আগে ব্যারনদের মধ্যে অনবরত যে ছোট-ছোট বিরোধ লেগে থাকত তার অবসান হওয়াতে, দেশের প্রজাসাধারণের নিরাপত্তাও কিছু পরিমাণে ফিরে এল, আর প্রজারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেল। তাতে শুধু যে তাদের দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পেল তা নয়, বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠে সেখানে নানা দেশের লোক আসতে শুরু হ'ল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানও সেই সঙ্গে কিছু কিছু ঘটল।

এর যেটা সর্ব্ব-প্রথম ফল, সেটা হচ্ছে শিক্ষার বৃদ্ধি—দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। ইউরোপের দক্ষিণ দেশগুলির সঙ্গে আরবদেরই বেশী মেলামেশা হ'তে লাগল, ফলে তাদের মারফৎ প্রাচ্যদেশের দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক কিছুই এরা পেলে। আর একটা যা পেলে, তা হচ্ছে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের

চর্চ্চা। আরবের কাছ থেকেই এই ব্যাপারটি যে ইউরোপের লোকেরা শেখে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ্যারিস্টটলের শিক্ষা ত এরা ভুলেই গিয়েছিল, সেটাও নতুন করে এল ওদের কাছ থেকেই। অবশ্য এর মূলে রোজার বেকন ব'লে এক ভদ্রলোকের চেষ্টাই বেশী কাজ করেছে। তিনিই প্রথম সমস্ত কুসংস্কার ও প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন (ত্রয়োদশ শতাব্দী), তিনিই প্রথম ইউরোপের লোকদের শুনিয়েছিলেন, 'তোমরা নিজেরা একটু একটু ভাবতে শেখ, এই পৃথিবীর দিকে একবার খোলা-চোখ মেলে চাও, অমন করে চোখ বুজে রাজপথ চ'লো না!'

ইউরোপের শিক্ষা-বিস্তারের পথ যে বস্তুটির জন্য আরও সুগম হ'ল সে হচ্ছে কাগজ। এ জিনিসটিও আনলে আরবরা। আগেই বলেছি কাগজ প্রথম তৈরী করতে শেখে চীনের লোকেরা—সে সেই দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা! ৮৫১ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দের মুসলমান অধিবাসীরা একটা খণ্ডযুদ্ধে কয়েকজন চীনাকে বন্দী করে, দৈবক্রমে তারা কাগজ তৈরির কাজই করত। এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যাটা ছড়িয়ে পড়ল, মুসলমানদের কাছ থেকে শিখলে ইউরোপীয়ানরা। ইটালিয়ানরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজ তৈরী করতে শুরু করলে, কিন্তু তখনও এর দাম পড়ত অনেক বেশী; প্রকৃত-পক্ষে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পড়তায় তৈরি হ'তে শুরু হ'ল ওখানে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে।

কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই এল ছাপাখানা, সে-ও ঐ 'চীনে'দের দৌলতেই! কাঠের উপর উল্টো করে হরপ খোদাই করে তার ছাপ তুললেই যে অক্ষরের সোজা ছাপ পাওয়া যাবে এই সহজ কথাটা ঐ শান্ত মানুষগুলির মাথাতেই আসে। ইউরোপের মধ্যে গুটেনবার্গ বলে একজন জার্ম্মান প্রথম এই জিনিসটির প্রচার করেন,

তাঁর কাছ থেকে শেখে ইংলণ্ড। সে এই সেদিনের কথা, ইংলণ্ডে তখন রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড রাজত্ব করছেন। এই দুটির দৌলতেই শিক্ষা জনসাধারণের পক্ষে সহজ-প্রাপ্য হয়েছিল।

কিন্তু তবু ইউরোপ জাগেনি। তার প্রধান কারণ লাটিন চার্চ্চের অদ্ভুত কুসংস্কার। কত রকমের কু-প্রথা, বিধিনিষেধ এবং অন্ধবিশ্বাস যে এরা পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল তা আমরা, অর্থাৎ হিন্দুরা, আমাদের এই অতি বড় অধঃপতনের দিনেও ভাবতে পারি না। পৃথিবী গোল একথা বললে তখন কারাদণ্ড হ'ত, নতুন কোন দার্শনিক মত প্রচার করতে গেলে হ'ত প্রাণদণ্ড। ক্যাথলিক চার্চ্চের এই সব জঞ্জাল-স্তূপের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার প্রভৃতি যাঁরা অভিযান করেছিলেন তাঁদের সুবিধা হয়েছিল ছাপাখানার সাহায্য পেয়ে, তাঁদের মত দ্রুত তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া, মুদ্রিত হওয়ায় বাইবেলও সহজলভ্য হয়ে উঠল। এ বস্তুটি এতদিন পাদ্রীদের মুখ থেকেই, তাঁদের মনের মত ব্যাখ্যা সুদ্ধ শুনতে হ'ত ; এইবার তারা নিজেরা পড়ে নিজেরা বুঝতে শুরু করলে।

আরও এরা পৃথিবী সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠল, মোঙ্গলরা ইউরোপ জয় করার পরে। পূর্ব্বেই বলেছি যে মোঙ্গলদের দরবারে বহু দেশের লোক আসত, সম্রাটেরা সমস্ত বিদেশীকেই সাদরে তাঁদের সভায় অভ্যর্থনা করতেন। তার কারণ তাঁরা সমস্ত-কিছুর চেয়ে জ্ঞানচর্চ্চাকেই সম্মান করতেন বেশী, এবং পৃথিবীর নানা দেশের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে যে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তাও এঁরা জানতেন। এঁদের সভায় ভারতবর্ষ থেকে যেত পণ্ডিত, চীন ইটালী ও পারস্যদেশ থেকে আসত শিল্পী, আরব থেকে বৈজ্ঞানিক—আর বণিক ত প্রায় সমস্ত জানা-দেশ থেকেই আসত। বলা বাহুল্য যে ইউরোপ থেকেও বহু লোক যেত। এবং এদের

সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইউরোপের লোকেরা তাদের ঐ সঙ্কীর্ণ দেশটুকুর বাইরেও যে বিশাল পৃথিবী পড়ে আছে সে কথাটা প্রথম বুঝতে পারল। তাছাড়া তাদের এই সদ্যোজাগ্রত কল্পনাকে আরও গভীরভাবে নাড়া দিলে বোধ হয় মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বিবরণ। প্রাচ্য দেশের ঐশ্বর্য্য ও শক্তি, বিলাস ও বিপুলতা সম্বন্ধে এমন চমৎকার ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল যে তারা চঞ্চল না হয়ে পারলে না।

মার্কো পোলো এইভাবে যাদের 'মাথা খারাপ' করে দিলে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, জেনোয়ার এক নাবিক, আজও ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইনিই হলেন ক্রীস্টোফার কলম্বাস, যিনি আমেরিকার আবিষ্কারক বলে বিখ্যাত। মার্কো পোলোর প্রায় দু'শ বছর পরে, বইটি পড়ে ইনি উৎসুক হয়ে উঠলেন পৃথিবীটা ঘুরে দেখার জন্য, এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যাবার নতুন এক রাস্তা বার করবার উদ্দেশ্যে ইনি এক রাজার সভা থেকে অন্য রাজার সভায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সাহায্যের আশায়। বলা বাহুল্য যে প্রথমটায় কেউই এঁকে আমল দেননি, শেষে স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার সাহায্য পেয়ে ইনি বেরিয়ে পড়লেন জাহাজ ও দলবল নিয়ে এবং আড়াইমাস ধরে সমুদ্রযাত্রার পর একটা জমি দেখতে পেলেন। যে স্থানে তিনি পৌঁছলেন সেটা হল আসলে আমেরিকার পূর্ব্বে একটা দ্বীপ। কিন্তু কলম্বাস ভেবেছিলেন, সেইটিই ভারতবর্ষ, এবং সেই বিশ্বাসেই তিনি সেখান থেকে নিদর্শন-স্বরূপ জিনিসপত্র ও লোকজন ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন স্পেনের রাজসভায়। শুনলে অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কলম্বাসের ঐ ধারণাই ছিল। এবং সেই ভুলটিকেই চিরস্মরণীয় করে আজও ঐ সমস্ত দ্বীপগুলিকে ওয়েস্টইণ্ডীজ বা পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়, আর আমেরিকার আদিম

অধিবাসীদের বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান'! তখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পৃথিবীর অর্দ্ধেকটাই ছিল তাদের কাছে অজ্ঞাত, পূর্ব্বাংশের সঙ্গে ছিল তারা সর্ব্বপ্রকারে সম্বন্ধ-বিহীন।

কলম্বাসের এই অসামান্য সাফল্যে অনেকেই ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠল, বিশেষ করে পর্ত্তুগাল। সুতরাং কিছুদিন পরেই ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে একদল পর্ত্তুগীজ আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে ঘুরে ভারতবর্ষে এসে হাজির হ'ল, এবং তাদের অধিনায়ক স্বরূপ ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটের রাজা জামোরিনের কাছ থেকে বাণিজ্য করবার অনুমতি চেয়ে নিলে। কিন্তু ভারতবাসীরা এ ভদ্রতার ভাল প্রতিফল পায় নি। পর্ত্তুগীজরা শীগ্‌গিরই 'নিজমূর্ত্তি' ধরে, এবং এদের অত্যাচার ও অনাচারের সহস্র কাহিনীতে আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে। তবে খুব সম্ভব সেইজন্যই এদের এখানে সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভব হয় নি। ওলন্দাজরা এসে পর্ত্তুগীজদের দমন করে এবং পরে এদের দু'দলকেই ইংরেজদের আগমনে ধীরে ধীরে সরে যেতে হয়।

যাই হোক—১৫১০ খৃষ্টাব্দে এরা গোয়াতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করলে, এবং পরের বছরই দখল করলে মালাক্কা। জাভা ও চীনে পৌঁছতেও এদের বেশী বিলম্ব হয়নি। কিন্তু স্পেনই এদের চেয়ে এগিয়ে গেল বেশী। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাগেলান বলে এক পর্ত্তুগীজ স্পেনের কাছে চাকরী নেয় এবং কয়েকটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করে নতুন দেশের উদ্দেশে। এই লোকটি বহুদিন ধরে জলে জলে ঘুরে বেড়াবার পর বর্ত্তমান ফিলিপাইন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছয়। ম্যাগেলান ওখানেই মারা যায় কিন্তু তারই সেই পাঁচটি জাহাজের মধ্যে দুটি সমুদ্রপথে এদিক দিয়ে দেশে ফিরে আসে। অর্থাৎ জলপথে সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রশান্ত মহাসাগর নামটি ম্যাগেলানেরই দেওয়া। তার চেয়েও যেটা দরকারী কথা সেটা হ'ল এই যে ঐ

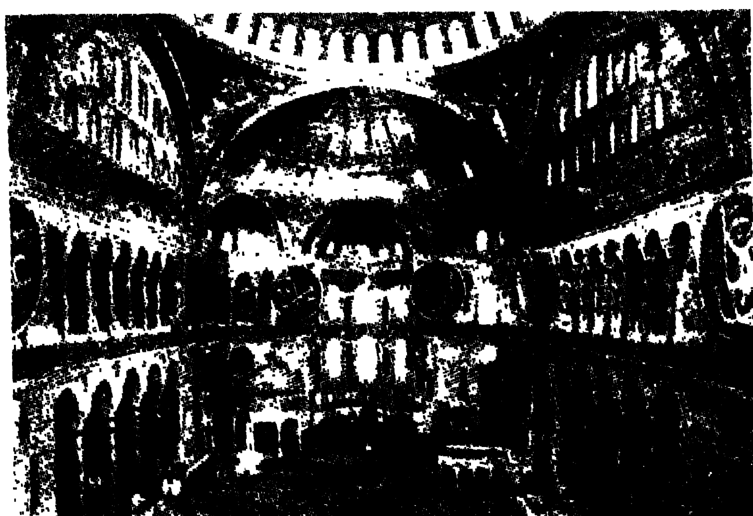
১৫১৯ অব্দেই স্পেনের আর-একজন লোক আমেরিকার আসল ভূখণ্ডে পৌঁছয় এবং বর্ত্তমান মেক্সিকো জয় করে। তার আগে আমেরিকার কথা কিছু বলা দরকার।

আমেরিকা বিজয়

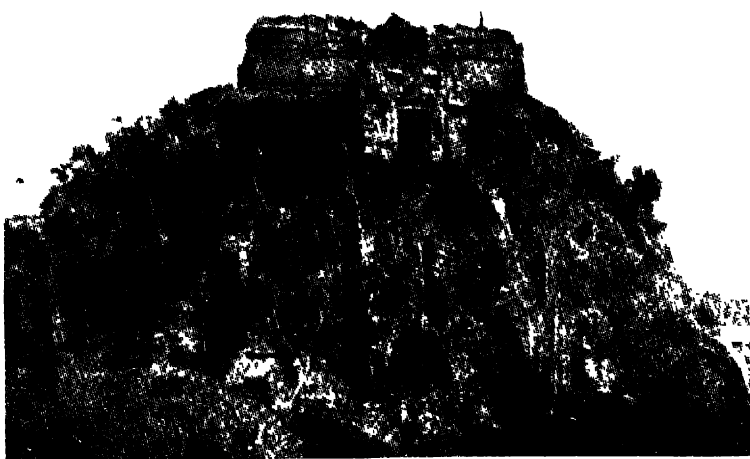
অনেকেই মনে করেন যে ইউরোপীয়ানরা যখন আমেরিকাতে যায় নি তখন ওখানে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর লোক (কতকটা আফ্রিকার বন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মত) মাত্র থাকত। কিন্তু সে ধারণা একেবারেই ভূল।

মায়া সভ্যতার কথা আমরা এর আগে একবার বলেছি। এই সভ্যতা যে কী ভাবে গড়ে উঠেছিল তাও বলেছি। সুতরাং তার পর থেকেই আরম্ভ করব। আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা বলতে যা বুঝি তা হচ্ছে প্রধানত তিনটি দেশকে নিয়ে। মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো ও পেরু। ঠিক কতদিন ধরে এই তিনটি দেশে ঐ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা আজ আর জানবার উপায় নেই বটে, তবে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই এখানে যে বহু শহর ও জনপদ গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাই। এই শহরগুলি আয়তনে ও গঠনকৌশলে এশিয়ার তদানীন্তন যে কোন শহরের সঙ্গেই তুলনীয় হ'তে পারত। এদের এই সভ্যতার মধ্যেও সমস্তই ছিল—স্থাপত্য, বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, চারুশিল্প, এমন কি লেখার পদ্ধতিও—যদিচ সে লেখা আমরা অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারিনি।

এই তিনটি দেশ কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিছুদিন পরে এদের মধ্যে তিনটি রাজ্য মিলে একটা সঙ্ঘের মত গঠন করে এবং সে সঙ্ঘ পরে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সে সঙ্ঘের আমরা নাম দিয়েছি মায়াপান সঙ্ঘ। সে অনেক দিন আগেকার কথা—আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর।



কনস্টান্টিনোপল-এর সান্টা সোফিয়ার গির্জা — অধুনা মসজিদ
(সম্রাট জাস্টিনিয়ান কর্তৃক ৫৩২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত)



মায়া সংস্কৃতির একটি স্মৃতি (মন্দিরের ভগ্নাবশেষ)

এই রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা ভালই ছিল, আর্থিক অবস্থাও ছিল সচ্ছল; কিন্তু বড় বেশী কুসংস্কার জড়ো করে জাতীয় জীবনকে এরা বিড়ম্বিত করে তুলেছিল। এদের সত্য সত্য শাসন করতো এদের পুরোহিতরা—আর যেখানে যেখানে এই ব্যবস্থা চলেছে সেইখানেই যে ফল শুভ হয়নি তা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখেছি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এদের সঙ্ঘ ভেঙে যায় কিন্তু তখনও পৃথক-ভাবে রাষ্ট্রগুলি চলতে থাকে। অবশেষে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মেক্সিকোর আজটেক্‌দের অভ্যুদয় হওয়াতে এইসব মায়া-রাজ্যগুলি নষ্ট হয়ে গেল এবং সমস্ত দেশটাই আজটেক্‌দের সাম্রাজ্য-ভুক্ত হ'ল।

আজটেক্‌রা ক্রমে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠল। টেনোক্‌লিৎলান বলে এক বিরাট রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করলে এবং বজ্রহস্তে প্রজাদের শাসন করতে লাগল। সেকালে এত বড় রাজধানীর কল্পনাই অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু এদের শাসন ছিল নিতান্তই অস্ত্রের শাসন, তাই তার সঙ্গে প্রজাদের অন্তরের যোগ একদম ছিল না। তা ছাড়া এদেরও কুসংস্কার ছিল নানা রকম এবং এদের জীবনযাত্রা প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করত এদের পুরোহিত ও জ্যোতিষীরাই, তার ফলে এদেরও জাতীয় জীবন হয়ে উঠেছিল ঝাঁঝ্‌রা। তাই ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে, যখন আজটেক্‌দের সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে, এবং ওরা যখন সবচেয়ে নিশ্চিন্ত—তখন কোর্টেস্ বলে একজন স্প্যানিশ্ ভাগ্যান্বেষী আর তার ছোট একদল ফৌজ এসে সামান্য চেষ্টাতেই ওদের সাম্রাজ্য দখল করে নিল। অবশ্য কোর্টেসের সহায় ছিল নব-আবিষ্কৃত কামান ও বন্দুক, আর ছিল অশ্বারোহী সৈন্য (এ জিনিসটি আজটেক্‌দের কাছে একেবারে অদ্ভুত ব্যাপার, কারণ ঘোড়া ওদের দেশে ছিল না) কিন্তু তবুও অত বড় সাম্রাজ্য জয় করা ওর পক্ষে সম্ভব হ'ত না, যদি শাসিতদের সঙ্গে শাসকের

প্রাণের যোগ থাকত। অস্ত্র ও ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও কোর্টেসকে প্রথমবার প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল, পরে প্রজাদের চেষ্টাতেই সে জয়লাভ করে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সামান্য মাত্র আঘাতেই এই সুপ্রাচীন সভ্যতা, এত দিনের এত কাণ্ডকারখানা, একেবারে যেন ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আসার সঙ্গে সঙ্গে আগের সংস্কৃতি হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন ; আগে যেখানে ছিল বড় বড় শহর, বড় বড় জনপদ, দেখতে দেখতে সে সব স্থান নিবিড় অরণ্যে ভরে গেল। এমন কি পেরুর সাম্রাজ্যও এইভাবে চলে গেল। পিজেরো বলে আর একজন স্প্যানিশ যেমন কৌশল করে হঠাৎ ওদের 'ইন্‌কা' বা সম্রাটকে বন্দী করলে (১৫৩০ খৃঃ) অমনি ওরা এত ভয় পেয়ে গেল যে আর কেউ ওদের বাধাও দিতে পারলে না। 'ইন্‌কা' ছিলেন ওদের সাক্ষাৎ দেবতা, দেবতাকে যারা ধরতে পারে তারা দেবতারও বড়—বোধ হয় তাদের এমনি একটা ধারণা হ'ল !

প্রথম আবিষ্কারকরা সন্ধান দিতেই এইবার আসতে শুরু হ'ল ভাগ্যান্বেষীর দল। দেশে যাদের অন্ন হয় না, কিংবা মুখ দেখানোর পথ নেই—এই রকম বহু লোক গিয়ে হাজির হতে লাগল। রাশি রাশি সোনা ও রূপো এবং নানা রকমের ঐশ্বর্য্য স্পেন ও পর্ত্তুগালে এসে স্তূপীকৃত হ'তে লাগল, আর তাই দেখে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতির চোখ এমন ধেঁধে গেল যে তারাও আর স্থির থাকতে পারল না। সেই হ'ল আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ-উপনিবেশের সূত্রপাত !

কিন্তু তখনকার দিনে যে সব শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকায় গিয়েছিল তারা দেশের ভদ্র প্রতিনিধি নয়, তাই তাদের সে-সময়কার ইতিহাস বড় কলঙ্কিত, বড় ঘৃণ্য। তার অধিকাংশই শুধু অত্যাচার ও পাপাচরণের কাহিনী।

মার্টিন লুথার নামে এক জার্ম্মান সন্ন্যাসী—পোপ ও তাঁর দলবলের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। মার্টিন লুথারের কথায় যারা কর্ণপাত করলে তারা পোপ ও ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রবল বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও এমন এক নূতন ধর্ম্মমত গড়ে তুললে যা শীগ্‌গিরই ক্যাথলিক মতবাদের সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। এরাও ক্রীশ্চান বটে, তবে এরা পোপের আদেশের বিরুদ্ধে 'প্রোটেস্ট' বা প্রতিবাদ করলে বলে ইংরেজীতে এদের নাম দেওয়া হ'ল 'প্রোটেস্টাণ্ট'। এদের দমন করার জন্য পোপের দল অনেক কুকীর্ত্তিই করেছিলেন; অনেক অকারণ রক্তপাত, অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেয়েছিলেন কিন্তু তবু কিছুতেই এদের দমাতে পারেননি, শেষে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রী (যার ওপর পোপের ভরসা ছিল খুব বেশী, খুশী হয়ে যাঁকে তিনি এক কালে 'সত্য-বিশ্বাসের রক্ষাকর্ত্তা' উপাধি দিয়েছিলেন এবং যে উপাধি, তাঁর প্রতি অদৃষ্টের পরিহাস স্বরূপ, ইংলণ্ডের রাজারা আজও সগৌরবে বহন করেন) পর্য্যন্ত যখন এদের প্রশ্রয় দিলেন, তখনই বোঝা গেল যে আর এদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।

এতে ক'রে অন্য সুফল ত হ'লই, সব চেয়ে জনসাধারণের যেটা লাভ হ'ল সেটা হচ্ছে এই যে, এদের মন থেকে 'জুজু'র ভয়টা গেল কেটে। পোপরা (এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজারাও) সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতীক, সুতরাং তাঁরা যা খুশী করলেও তার প্রতিবাদ করা যাবে না—এমনি যে একটা বিশ্বাস বহুদিন থেকে চলে আসছিল সেইটে এবার ভাঙল। তাই এই সময়টায় যদিচ আমরা ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে রাজারা শাসনতন্ত্রের

মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠেছেন, তবু ভেতরে ভেতরে সব দেশের প্রজারাই ঐ সময়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল! এদিক দিয়ে ইংলণ্ডের লোকেরাই বোধ হয় অগ্রণী; যদিও রাণী এলিজাবেথের কাছে তারা তাদের জাতীয় উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশী ঋণী, এবং সে সময়ে এক-নায়কত্বে তাদের সুবিধেই হয়েছিল, তবু এলিজাবেথের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই নির্ব্বুদ্ধিতা ও যথেচ্ছাচারিতার জন্য রাজা প্রথম চার্লসকে প্রাণদণ্ড (১৬৪৯ খৃঃ) দিতে তারা একটুও ইতস্তত করেনি। ইংলণ্ডে রাজাদের 'এক-নায়কত্বে'র সেই শেষ। চার্লসের মৃত্যুর পর যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার পরমায়ু আবার দশ-বারো বছরেই শেষ হয়ে যায় এবং তার পরেই আবার রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় সত্য, কিন্তু তা হ'লেও রাজাদের হাতে সমস্ত শক্তি আর কোন দিনই ফিরে যায় নি। কারণ আবার যখন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল তখন এলেন প্রথম চার্লসের দুটি অপদার্থ ছেলে, তাঁদের দ্বারা রাজাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা আর সম্ভব হ'ল না। তারপর জার্ম্মানী থেকে বর্ত্তমান রাজবংশ যখন এলেন তখন তাঁরা ভাল করে ইংরেজীতে কথাই কইতে পারতেন না, সুতরাং শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে মাথাই বা ঘামাবেন কি করে? ফলে ঐ সমস্ত সময়টা ধরেই একটু একটু করে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে গিয়ে গড়ল। অনেকদিন পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তৃতীয় জর্জ্জ আর-একবার সে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি।

কিন্তু এই সময়টা সারা ইউরোপে এক-নায়কত্বেরই যুগ এসেছিল। অবশ্য তখন তাতে ফল যে খারাপ হয়েছিল তা নয়। এক একজন বড় রাজা যেমন এক এক দেশের শাসনতন্ত্রের সমস্ত বল্গাগুলি হাতে টেনে নিয়েছেন, তেমনি রাজ্যের সে রথকে বিজয়-গর্ব্বে

সৌভাগ্যের পথেই চালিত করেছেন। রাশিয়ার কথাই ধরা যাক্। বড় দেশ, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল; না ছিল ওদের বড় শহর, না ছিল কোন বন্দর, আর না ছিল কোন রকম লেখাপড়ার চর্চ্চা। ইউরোপের বাকী লোকেরা ওদের অর্দ্ধ-বর্ব্বর এক প্রকার জীব বলেই ভাবত। কিন্তু অকস্মাৎ যেমন পিটার দি গ্রেট রাজা হয়ে কঠিন হস্তে দেশ-শাসনে প্রবৃত্ত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটার চেহারা গেল বদ্‌লে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে এবং বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রের ধারে থাকার প্রয়োজন বুঝে, তিনি বর্ত্তমান লেলিনগ্রাডে (ভূতপূর্ব্ব সেণ্ট পিটার্সবার্গ) রাজধানী গড়ে তুললেন, তাছাড়া নিজে বিদেশে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিদের কাছ থেকে রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, জাহাজনির্ম্মাণ-কৌশল প্রভৃতি শিখে এসে এত দ্রুত দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিলেন যে অজ্ঞাত বর্ব্বর দেশ থেকে সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাশিয়া প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হ'ল (১৬৮২-১৭২৫ খৃঃ)।

জার্ম্মানীও—অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য ও জমিদারীতে ভাগ হয়ে অনবরত অন্তর্ব্বিরোধের ফলে খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট রাজা হয়ে (১৭৪০-৮৬) সমস্ত ওলট্ পালট্ ঘটিয়ে দিলেন। তিনি প্রুশিয়াকে ত শক্তিমান করে তুললেনই—বর্ত্তমান অখণ্ড জার্ম্মানশক্তির বীজও বপন করে গেলেন। আর ফ্রান্সের ত কথাই নেই। বুর্ব্বোঁ রাজবংশের দুই বিখ্যাত মন্ত্রী, কার্ডিনাল রিশ্‌ল্যু ও ম্যাজারিনের চেষ্টা এবং সবচেয়ে চতুর্দ্দশ লুইয়ের প্রতিভা (যিনি ইউরোপের ইতিহাসে 'গ্র্যাণ্ড মনার্ক' বলে বিখ্যাত—১৬৩৪-১৭১৫) এ'কে এক সময়ে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি করে তুলেছিল। এদের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যে (গ্রাণ্ড মনার্ক ঐশ্বর্য্য দেখাতে একটু বেশী ভালবাসতেন। তাঁর তৈরী বড়

বড় প্রাসাদগুলি আজও লোকের বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, তাঁর জীবনযাত্রার বিবরণ ভারতের মুঘল-দরবারের বিলাসের খ্যাতিকেও ম্লান করে দেয়।) ইউরোপের লোকের চোখ এমনই ঝল্‌সে গিয়েছিল যে সে সময়ে ওখানকার অন্য সমস্ত দেশগুলিই প্রাণপণে ফরাসীদের নকল করবার চেষ্টা করত, এমন কি ওদের ভাষা পর্য্যন্ত নবজাগ্রত রাশিয়া ও প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রভাষা-রূপে প্রচলিত হয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত আড়ম্বরের রসদ জোগাতে প্রজারা যে কী ভীষণ ভাবে নিপীড়িত হ'ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। চতুর্দ্দশ লুই তবু দেশকে গৌরব-শ্রী দিতে পেরেছিলেন কিন্তু তার পরে আর তা-ও রইল না, রইল শুধু পীড়ন, অর্থ-শোষণ, এবং অপব্যয়! বিচার নেই, শাসন নেই, প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কল্পনাতে পর্য্যন্ত নেই, শুধু ঘৃণিত জীবন যাপন এবং অর্থের অপব্যয়, এই হয়ে উঠল ফ্রান্সের রাজা ও রাজ-দরবারের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে উৎপীড়ন সহ্য করে করে প্রজারা একদা বিদ্রোহী হয়ে উঠে রাজা এবং রাজতন্ত্রের ওপর এম্‌নিই প্রতিশোধ নিলে যে এইসব অপদার্থ লোকগুলির সমস্ত অন্যায়ের ঋণ তাদের বংশধরদের কড়া-ক্রান্তিতে শোধ করতে হ'ল।

রাশিয়াতেও বহুদিন ধরে কতকগুলি অপদার্থ লোক প্রজাদের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল, কিন্তু সেখানে তার প্রতিফলটা এসেছিল বহু বিলম্বে। যাই হোক্—ঐ সময়ে ইউরোপের প্রজাদের যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল সেটা আর কোনদিনই বিলুপ্ত হয়নি বরং বেড়ে গিয়েছিল। আর তারই ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ থেকেই রাজারা নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন, নয়ত ক্ষমতা-হীন হয়ে রাজত্ব করছিলেন। একেবারে খুব সম্প্রতি, ইউরোপের কোন কোন দেশে আবার একনায়কত্ব দেখা দিয়েছিল—কিন্তু সে কথা আরও পরে।

কিন্তু এই গোলমালের মধ্যেও ইউরোপের রাজ্যবিস্তার বন্ধ থাকেনি। আমেরিকার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ত বিবাদ চলছিলই, এশিয়া ও আফ্রিকাতেও সেটা ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম প্রথম ইউরোপের প্রায় সব দেশগুলিই ঐ রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্নে মেতে উঠেছিল, কিন্তু পরে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপের ঝগড়ায় এমন করে জড়িয়ে পড়ল যে, ওধারে আর বেশীদিন মন দিতে পারল না। ফলে শেষ-পর্য্যন্ত এশিয়াতে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আর আমেরিকাতে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও স্পেন— এদের মধ্যেই ঝগড়াটা বেশ পেকে উঠল। অবশ্য সুবিধা হ'ল ইংরেজদেরই বেশী। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যখন ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ বেধেছিল সেই সময় কতকগুলি ইংরেজ পালিয়ে গিয়ে আমেরিকাতে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের সন্তান-সন্ততি ক্রমে এত বেড়ে গেল যে তারাই হয়ে উঠল দলে ভারী। তা ছাড়া ওখানে ওদের যে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, ফরাসীরা, তারাও ইউরোপের ঝগড়ায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল যে বাইরের দিকে বিশেষ নজর দিতে পারলে না।

ভারতবর্ষেও ফরাসী ও ওলন্দাজরা ইংরেজদের প্রতাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। মুঘল সম্রাটেরা যখন গৌরবের শীর্ষ-স্থানে, তখনই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ সামান্য একটু সুবিধা ভিক্ষা করে নিয়ে এখানে বাণিজ্য করতে আসে। তারপর সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর মুঘলদের যখন পতন শুরু হ'ল তখন ভারতবর্ষের চারিদিকেই নানা দল মাথা তুলতে চেষ্টা করলে, আর তাদেরই স্বার্থ-সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে সেই ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ অনায়াসে বাণিজ্যের বদলে রাজ্য বিস্তার করে যেতে লাগল।

আর একটি ইউরোপীয়ান জাতি ধীরে ধীরে এশিয়াতে রাজ্য-

বিস্তার করতে শুরু করেছিল, কিন্তু সে সমুদ্রপথে নয়, স্থলপথেই। মোঙ্গলদের ঐ সময় খুবই অধঃপতন হয়েছিল। চীনে মিং বংশের পতনের পর (১৬৪৪) যদিও আর একদল মোঙ্গলই (মাঞ্চু বংশ) চীনের সাম্রাজ্য দখল করে, এবং এই সেদিন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সাধারণ-তন্ত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তারাই শাসন করতে থাকে, তবু আর কোথাও ওদের কোন উন্নতির সাড়া পাওয়া যায়নি। আর সেই দুর্ব্বলতার সুবিধা নিয়েই রাশিয়ানরা ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে এগিয়ে একসময় সমস্ত সাইবেরিয়াটা দখল করে নেয়।

জাপানের অভ্যুদয়

বর্ত্তমানে যে একমাত্র প্রাচ্য-শক্তি পাশ্চাত্ত্যের প্রচণ্ড শক্তিগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে সে হচ্ছে জাপান। সুতরাং এই বিচিত্র জাতিটার দিকে এইবার একটু তাকানো দরকার। ইউরোপ যখন ফিউডাল প্রথায় ক্লান্ত হ'তে শুরু করেছে তখন এই প্রথাটিই একটু একটু করে এইখানে গড়ে উঠছিল। হয়ত ঠিক ঐরকমই নয়— কতকটা আমাদের দেশের জমিদারীর মত। খানিকটা জমি কয়েকজনকে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে দেওয়া হ'ত, সে সেই সীমানার ভেতরের সমস্ত প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রাজসরকারে জমা দিত। এই কাজের জন্যেই সৈন্যও রাখত কিছু কিছু। ইউরোপেও ক্রমশ যেমন ব্যারনরা ক্ষমতা সঞ্চয় করে নিয়ে রাজাকে পর্য্যন্ত টেক্কা দিতে শুরু করেছিল তেম্নি জাপানেও ক্রমে এই সমস্ত 'ডাইমিও'রা প্রবল হয়ে উঠল। এদেরই মধ্যে মিনামোতো বংশের য়োরিতামা এমন শক্তি সঞ্চয় করলেন যে প্রকৃতপক্ষে ইনিই হয়ে উঠলেন জাপানের শাসক। সম্রাট বেগতিক দেখে এঁকে 'শোগান্' বা মহা-সেনানায়ক উপাধি দিলেন এবং

জাপানের শাসনভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন (১১৭১ খৃষ্টাব্দ)।

এর পর থেকে এই সেদিন পর্য্যন্ত, ঐ শোগান্‌রাই দেশ শাসন করেছেন। ঠিক এমনি একটা উদাহরণ আমাদের নেপালেও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত নেপালের রাজারা নামেই রাজা ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী বা 'মহারাজা'ই সেখানে দেশ শাসন করতেন। জাপানে অবশ্য সেই একই বংশের লোকেরা যে বরাবর শোগান্ হয়েছেন তা নয়, এক-একটি বংশের লোকেরা দেড়শ', দু'শ বছর ধরে শাসন করার পর নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়লে অন্য কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাদের হাত থেকে ঐ পদবী এবং ক্ষমতা দুই-ই কেড়ে নিয়েছেন। আবার তাঁদের হাত থেকে আর এক বংশ—এই ভাবেই চলেছে।

শোগান্‌রা মোটের ওপর শাসন করেছিলেন ভালই। দিগ্বিজয়ী মোঙ্গলদের পর্য্যন্ত একসময়ে তাঁরা জাপানের দোর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ অধঃপতনও হয়েছিল খুব। অনবরত গৃহ-বিবাদে দেশের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সপ্তদশ শতকের প্রথমে দু'তিনজন লোকের প্রাণপণ চেষ্টায় জাপান আবার মিলিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। এদেরই একজন, তোকুগাওয়া, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে শোগান্ হন এবং বর্ত্তমান রাজধানী টোকিওর প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময় বা এর একটু আগে থেকেই ইউরোপীয়ানরা এখানে আসতে শুরু করে। ওদের যেমন কৌশল—প্রথম এল বণিকরা, তার সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হ'ল মিশনারী পাদ্রীরা। প্রথমটা এরা কিছু বলেনি কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলে যে এদের ধর্ম্মপ্রচার করতে আসাটা রাজ্য-জয়েরই উপক্রমণিকা, তখন পত্রপাঠ পাদ্রীদের বিতাড়নের এক আইন করে দিলে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ)।

একেবারে কড়া হুকুম দেওয়া হ'ল যে কুড়ি দিনের মধ্যে সমস্ত পাদ্রীদের দেশ্ ছাড়তে হবে, নইলে—মৃত্যু !

জাপানীদের এই ক্রীশ্চান-বিদ্বেষ সম্বন্ধে চমৎকার একটি গল্প আছে। কোন একজন জাপানীকে নাকি একবার এক স্প্যানিশ নাবিক একখানা মানচিত্র দেখিয়ে তারা যে কত দেশ জয় করেছে, তারই গল্প বলছিল। জাপানী লোকটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, এত দেশ তোমরা কি করে জয় করলে ? সে জবাব দিলে, কেন এ ত খুবই সোজা। কোন দেশ জয় করার আগে আমরা পাদ্রীদের সেখানে পাঠাই ; তারা গিয়ে কতকগুলো লোককে ক্রীশ্চান করে দেয়, তখন আমরা কোন ছুতোয় কিছু সৈন্য এনে ফেলি। ঐসব ক্রীশ্চান আর এই সৈন্যেরা মিলে দেশটা জয় করে ফেলে—আর কি। দেশ জয়ের এই সহজ পদ্ধতির কথাটা কি ক'রে লোক-পরম্পরায় নাকি তখনকার জাপানেব রাষ্ট্রনায়ক হিদিয়োশীর কানে পৌঁছয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্রীশ্চান বিতাড়নের ব্যবস্থা শুরু করেন।

তখনও কিন্তু বাণিজ্যটা চলছিল। বিশেষ করে তোকুগাওয়া ইউরোপীয়ানদের প্রীতির চোখে দেখতেন বলে অতটা কড়াকড়ি করেন নি। তিনি মরবার পর আবার ক্রীশ্চান বিতাড়ন শুরু হ'ল এবং ১৬৩৬-৪১ সালের মধ্যে সমস্ত ক্রীশ্চান ও বিদেশীকে জাপান থেকে বার করে দেওয়া হ'ল। এমন কি জাপানের লোকেরও বাইরে যাওয়া বন্ধ হ'ল, আর বাইরে যারা আছে তাদের ত দেশে ফেরা নিষিদ্ধই হয়ে গেল ! অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে জাপানের সমস্ত সম্পর্ক লোপ পেল।

এর পর থেকে প্রায় দু'শ বছর এইভাবেই এরা ছিল। তারপর সহসা যখন আবার এরা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলে তখন সকলের চোখ একেবারে ঝলসে গেল। তারা পাশ্চাত্ত্য জাতির সঙ্গে শুধু

যে মিশল তাই নয়, তাদেরই নীতি আয়ত্ত করে নিয়ে সব দিক দিয়ে তাদেরই ছাড়িয়ে চলে গেল। আজ কি বাণিজ্যে, কি রাজ্য-বিস্তারে, জাপান ইউরোপের সব চেয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমেরিকার সঙ্ঘবন্ধন

প্রথম ইংরেজরা কী অবস্থায় আমেরিকায় গিয়েছিল তা আমরা দেখেছি; তার পর থেকেও নানা অবস্থায় নানান্ দল ওখানে যেতেই থাকে এবং ক্রমশ সেইসব আগন্তুকের দল পুত্র-পৌত্রাদিতে এমনিই সংখ্যায় বেড়ে ওঠে যে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে যে সব ঔপনিবেশিকের দল এসেছিল তাদের থেকে সংখ্যায় ওরা অনেক গুণ বেশী দাঁড়িয়ে গেল। ফলে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতিরা এদিকে সামান্য যা ধরে রাখতে পারল তাই রাখলে, বাকী সমস্তটাই ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হ'ল।

এইসব প্রবাসী ইংরেজরা প্রথমটা মোটেই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে চায় নি, বরং তারা রাজা এবং পার্লামেণ্টকে সব দিক দিয়ে মেনে চলাটাই তাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করত। কিন্তু ইংরেজরা ফ্রান্সের সঙ্গে 'সাত বছরের যুদ্ধে' (আমেরিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাধান্য নিয়েই প্রধানত এই যুদ্ধ বাধে) এমনভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ল যে টাকা পাবার আর কোন উপায় না দেখে বেচারী-এদের উপরই নতুন নতুন কর চাপাতে শুরু করলে। শুধু তাই নয়, ওদের দেশে যা প্রচুর জন্মায় সেইসব জিনিসই, নিজেদের বাণিজ্য-বৃদ্ধির জন্য, বাইরে থেকে এনে ওদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যারা ওদের কোন রকম সাহায্য না নিয়েই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটু একটু করে নিজেদের চাষ-আবাদ ব্যবসা-

বাণিজ্য গড়ে তুলছিল, তারা এ অন্যায় আবদার সইবে কেন ? তারা প্রতিবাদ করলে।

কিন্তু তবুও তারা প্রতিবাদ করেছিল প্রথমটা খুবই বিনীতভাবে। রাজাকে অমান্য করা বা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করবার ইচ্ছা তাদের মোটেই ছিল না। কিন্তু রাজা বা মন্ত্রিসভা সে সব আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে যখন, যে চা তাদের দেশেও প্রচুর জন্মায় সেই চা-ই ভারতবর্ষ থেকে দু-তিন জাহাজ বোঝাই করে এনে তাদের দেশে চালাবার চেষ্টা করা হ'ল, তখন তারা প্রথম প্রকাশ্য-বিদ্রোহ করলে ; রেড ইণ্ডিয়ান্ বা আমেরিকার আদিম অধিবাসী সেজে এসে জাহাজে উঠে তারা জোর করে সেই সব চায়ের বাক্সগুলো জলে ফেলে দিলে (১৭৭৩)।

এর পর বাধল লড়াই। কিন্তু রক্তপাত আরম্ভ হওয়ার পরও আমেরিকানরা চেষ্টা করেছিল মিনতি করে ইংরেজদের ঠাণ্ডা করতে। কিন্তু ওদের সে ধৃষ্টতা ইংলণ্ড সহ্য করলে না। রীতিমত যুদ্ধই শুরু হ'ল। আমেরিকার সৈন্যবাহিনী ছিল না, অন্য যুদ্ধোপকরণও কম, কিন্তু মানুষ যখন অন্তরে সত্যকার স্বাধীনতার ইচ্ছা নিয়ে যুদ্ধ করতে নামে তখন তার কিছুতেই আটকায় না ; আমেরিকারও আটকাল না। শীগ্‌গিরই তারা সৈন্যদল গড়ে তুললে এবং ভার্জিনিয়া প্রদেশের এক তালুকদার, জর্জ্জ ওয়াশিংটন, হলেন তাদের সেনাপতি। প্রথমটা যুদ্ধ হয়েছিল অন্যায় কর ধার্য্য করা বন্ধ করতে ও নিজেদের শাসন ব্যাপারে নিজেদের কিছু অধিকার স্বীকার করাতে ; কিন্তু কিছুদিন পরে বিভিন্ন প্রদেশের দলপতিরা মিলে সোজাসুজি স্বাধীনতাই নিজেদের কাম্য বলে ঘোষণা করলেন !

এই সময় সুযোগ বুঝে ফ্রান্স এবং স্পেনও ইংরেজদের জব্দ করবার জন্য ওদের বিরুদ্ধে এদের দলে যোগ দিলে। ফলে

ইংরেজরা এদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পারীর সন্ধিতে আমেরিকার তেরটি প্রদেশকে 'সম্মিলিত আমেরিকান সাধারণতন্ত্র' বলে মেনে নিলে। এই সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হ'লেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন স্বয়ং।

স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পরও এইসব প্রদেশ বা স্টেটগুলি নিজেদের মধ্যেই নানারূপ গোলমাল বাধিয়েছিল কিন্তু অনেক ঝগড়াঝাঁটির পর ধীরে ধীরে এরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল এবং তার মধ্য থেকে বর্ত্তমান আমেরিকা রূপ নিতে লাগল। আরও অনেকগুলি স্টেট পরে এই সাধারণতন্ত্রে যোগ দিয়েছে, যদিও কানাডা আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে নি।

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরে আমেরিকায় একটা প্রচণ্ড গৃহবিবাদ বেধেছিল। এবং বেধেছিল অত্যন্ত কুৎসিত একটা কারণে। প্রথম যখন ইউরোপীয়ানরা আমেরিকায় বসবাস করতে যায় তখন তারা, বলতে গেলে মুষ্টিমেয় লোক, গিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক মহাদেশে। সেখানে প্রচুর জমি—উর্ব্বর, স্বর্ণপ্রসূ জমি—শুধু তাদের ইচ্ছার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। কেউ নিষেধ করবার নেই, কেউ দাম চাইবে না—শুধু যতটা জমি যে আবাদ করতে পারে ততটাই তার। এ রকম ক্ষেত্রে কী দুর্জ্জয় লোভ তাদের হ'ল তা সহজেই বোঝা যায়। অথচ নিজে কতটা জমিই বা চাষ করতে পারে। এই দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তারা এক অত্যন্ত নোংরা কাজ শুরু করলে, আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ওখানকার অধিবাসী, শ্বেতাঙ্গরা যাদের 'নিগ্রো' বলে, ভুলিয়ে ভালিয়ে বা চুরি করে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস-রূপে জোর করে নিজেদের জমিতে খাটাতে শুরু করলে। তখন সভ্য-জগৎ থেকে ক্রীতদাস প্রথা উঠেই গিয়েছিল, এই অর্থলোলুপ লোকগুলি সেই বর্ব্বর প্রথারই পুনরাবৃত্তি শুরু করলে।

শীগ্‌গিরই একদল লোক এই ব্যাপারটাকে তাদের জীবিকা ক'রে তুললে। অর্থাৎ তারা দল বেঁধে আফ্রিকায় নামতো এবং যেমন করে পশু ধরে, তেমনি করে ঐ অসহায় মানুষগুলিকে ধরে শেকলে বেঁধে নিয়ে গিয়ে আমেরিকাতে বিক্রী করত। আর সেখানে যে জীবন তাদের যাপন করতে হ'ত তার কথা উল্লেখ না করাই ভাল। গৃহপালিত পশুরাও তাদের থেকে ঢের সুখে, ঢের আরামে, ঢের সম্মানে থাকত। এই কু-প্রথা কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণ দেশগুলিতেই অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর দিকের লোকেরা ছিল অধিকাংশই ধর্ম্মভীরু—তারা যতটা পারত নিজেরাই চাষ-আবাদ করত।

সুতরাং স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরে এই হু'দলেই এক ভয়ঙ্কর বিবাদ বেধে উঠল। উত্তরের লোকেরা চাইলে দাস-প্রথা উঠিয়ে দিতে আর দক্ষিণের লোকেদের পড়ল তাতে স্বার্থে ঘা! বহুদিন ধরে লড়াই চলার পর, বহু প্রাণনাশের পরে, তবে এই বিবাদের মীমাংসা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত দাস-প্রথা উঠেই যায়।

সেই সময়কার নিগ্রো দাসগুলির সন্তান-সন্ততি আজও বাধ্য হয়েই আমেরিকাতে বাস করছে, যদিও শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে, তাদের প্রমোদ-ভবনে এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, এবং সামান্য মাত্র অপরাধে, কিংবা অপরাধের সন্দেহেও, তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে শ্বেতাঙ্গরা দ্বিধা করে না। আর আজও এই নিয়ে সেখানে অশান্তির শেষ নেই।

ফরাসী-বিপ্লব

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে যখন ফ্রান্সের বুর্ব্বোঁ-রাজারা যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি যে একদা তাঁদের

প্রজারাও তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই অসম্ভবও সম্ভব হ'ল।

বুর্বোঁ রাজাদের যে কু-শাসন ও অমিতব্যয়িতার কথা এর আগেও উল্লেখ করেছি, সেই দু'টি ব্যাপারই এদের কাল হ'ল। যতই টাকায় কম পড়ে, ততই কর্ত্তারা নতুন কোন কর বসান, আর সে কর যোগাতে হয়—অপদার্থ জমিদারদের নয়, অকাল-কুষ্মাণ্ড পাদ্রীদের নয়—দেশের নিরন্ন প্রজাদেরই। বহু দিন, বহু বৎসর ধরে এই ব্যাপার চল্‌তে চল্‌তে শেষে এমন অবস্থায় প্রজারা এসে পৌঁছল যে নিজেরা অনাহারে থেকেও সে কর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু তবুও রাজা-রাণী-মন্ত্রী কারুর চৈতন্য হ'ল না! শেষকালে একদিন যখন রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ল, তখন রাজা স্টেট্‌স্ জেনারেল (পার্লামেন্টের মত ব্যাপার, যদিও তা নিয়মিত কখনই ডাকা হ'ত না) আহ্বান করলেন। রাজা যখন প্রথম ওদের ডাকেন তখন বোধ হয় ভেবেছিলেন যে তারা এসে শুধু ওঁর জন্যে কিছু টাকার ব্যবস্থা করেই চলে যাবে। কিন্তু প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধিরা শাসন-ব্যাপারে তাদের অধিকারের দাবী করে বসল এবং বললে, এ দাবী স্বীকৃত না হ'লে তারা কিছুই করবে না। রাজা চটে গিয়ে তাদের প্রাসাদ থেকে বার করে দিলেন। তারা কিন্তু গেল না, পাশের এক টেনিস-খেলার মাঠে জড়ো হয়ে শপথ করলে যে এর একটা বিহিত না করে তারা নড়বে না। নির্ব্বোধ রাজা ষোড়শ লুই প্রজাদের তাড়াবার জন্য সৈন্য ডাকলেন কিন্তু তারাও নির্দ্দোষ দেশবাসীদের উপর গুলি চালাতে রাজী হ'ল না। অগত্যা রাজা ভয় পেয়ে একটা আপোষ করলেন এবং অভয় দিলেন যে এবার থেকে তিনি খুব 'লক্ষ্মী' হয়ে চলবেন।

প্রতিশ্রুতি দিলেন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করতে লাগলেন বিদেশী সৈন্য এনে এদের জব্দ করবার জন্যে। তিনি

যতটা নয়—তার চেয়ে ঢের বেশী উৎসাহী হলেন রাণী মারী আঁতয়নেৎ। তিনি তখনও বুঝি আগেকার রাণীদের যথেচ্ছাচারিতার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এদের যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে সেই সহজ সত্যটাই বুঝতে পারেন নি। তা-ছাড়া ইতিমধ্যে দু'একবার ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে তারা দল বেঁধে রুটি চাইতে এসেছিল ওঁদের দোরে—ওঁরা সুইস্ গার্ডের সাহায্যে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; পরামর্শ দিয়েছিলেন, মাঠে নতুন ঘাস বেরিয়েছে তাই খেতে! এই সমস্ত ব্যাপারে পারীর লোকেরা ভীষণ ক্ষেপে উঠল এবং যা কোনদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, বাস্তিলের ভয়ঙ্কর দুর্গ (১৪ই জুলাই, ১৭৮৯) দখল করে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিলে।

এই বাস্তিলের কারা-দুর্গ জয় করার মধ্যে সাধারণ বিদ্রোহ ছাড়াও অন্য একটা ইঙ্গিত ছিল। বাস্তিল ছিল ফ্রান্সের লোকের কাছে রাজশক্তিরই প্রতীক। দুর্ভেদ্য দুর্গ—সেখানে রাজা বা শাসনতন্ত্রের শত্রুদের, বিচার করে কিংবা বিনা বিচারে, দীর্ঘকাল আটকে রাখা হ'ত; সেখানে যারা প্রবেশ করত তারা প্রায়ই আর জীবিত অবস্থায় ফিরত না। শত্রুদের জব্দ করার এইটিই ছিল সবচেয়ে বড় অস্ত্র রাজাদের হাতে। এই দুর্গের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাই একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জড়িয়ে ছিল সবার মনে—বহুদিন ধ'রে।

এ-হেন দুর্গ যেদিন কতকগুলি ক্ষিপ্ত উপবাসী লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করল, সেদিন সারা দেশের লোক চম্‌কে উঠল। তারা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু রাজা বা তাঁর দলবলের তখনও চৈতন্য হ'ল না। তাঁরা গোপনে গোপনে তখনও এদের জব্দ করার বাসনা পোষণ করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন পারীর প্রায় পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক মিলে কতকগুলো অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করে ভার্সাই প্রাসাদে গিয়ে হাজির হ'ল এবং

সমস্ত বাধা ভেঙে (এই প্রাসাদটি চতুর্দশ লুই বহু অর্থ ব্যয় করে পৃথিবীর বিস্ময় রূপে তৈরি করিয়েছিলেন) ভেতরে গিয়ে রাজা রাণীকে অপমান করতে শুরু করলে। তাদের প্রধান দাবী হ'ল রুটি, তারা শুধু রুটি খেতে চায় !

সেদিন দেশেরই অধিবাসীদের দ্বারা নবগঠিত ন্যাশনাল গার্ড রাজারাণীকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলে, কিন্তু স্থির হ'ল যে পারী থেকে এত দূরে না থেকে রাজার পক্ষে রাজধানীতে গিয়ে প্রজাদের মধ্যে থাকাই যুক্তিযুক্ত হবে। অতএব সমস্ত রাজপরিবার সেইদিন পারীতে টুলেরিসের প্রাসাদে চলে এলেন।

এর পরও ব্যাপারটা মনে হয়েছিল সহজ হয়ে যাবে। দেশের লোক, এমন কি বড় লোকেরাও, হঠাৎ একটা বদান্যতার আবেগে অনেকখানিই ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হয়েছিলেন। সদ্যগঠিত শাসন-পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি ভাল ভাবেই কাজ করছিল, রাজা বা রাজতন্ত্র দূর করার কথা সেদিনও ছিল তাদের স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু মানুষ নাকি যখন সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে যেতে থাকে তখন তাদের বুদ্ধি-বিবেচনাও লোপ পায়—রাণী মারী ও রাজা যোড়শ লুইয়েরও হ'ল তাই। শাসন-ব্যবস্থায় প্রজাদের অধিকার মেনে নিয়ে নিজেদের যথেচ্ছাচারিতাকে সংযত করে বেঁচে থাকা তাঁদের অসহ্য মনে হ'ল ! তাঁরা গোপনে প্রবাসী ও বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে টুলেরিস থেকে গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে পালিয়ে গেলেন। ইচ্ছে ছিল যে কোনমতে দেশের বাইরে গিয়ে বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে এদের জব্দ করবেন। মতলব তাঁদের প্রায় সিদ্ধও হয়েছিল, কিন্তু একেবারে সীমান্তে পৌঁছে তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন এবং প্রায় বন্দী অবস্থায় আবার রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এর পর সমস্ত ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে উঠল, ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটতে লাগল যে তার হিসেব দেওয়া ত কঠিন বটেই,

নিতে গেলেও মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে। জাতীয় বিচার-সভার বিচারে রাজার প্রাণদণ্ড হ'ল, কিছুদিন পরে রাণীরও। নির্য্যাতিত প্রজারা বহুদিনের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে, রাজার আত্মীয়, কর্ম্মচারী, জমিদার সবাইকে ধরে গিলোটিনে (বলিদানের যন্ত্র) তুলে দিতে লাগল; হয়ত তার মধ্যে অনেক নিরপরাধ লোকও ছিল, কিন্তু তখন কে সে কথা ভাবে! নতুন ক্ষমতার মোহে সবাই তখন ক্ষেপে গেছে, নতুন রক্তের নেশা লেগেছে তাদের চোখে!

এই সময় কয়েকজন বড় বড় নেতাও ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরাও খুব নিরাপদ ছিলেন না। আজ যে নেতার ইচ্ছা জনসাধারণের কাছে দৈবাদেশের মত অমোঘ, কাল দেখা গেল তাঁকেই গিলোটিনের মুখে সঁপে দিতে তাদের একটুও আটকাচ্ছে না। নিজেদের মধ্যেও মতভেদ, ষড়যন্ত্র প্রচুর ছিল। তা ছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ ত আছেই! ইউরোপের প্রায় সব রাজশক্তিই ফ্রান্সের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে ভীত, রুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে উঠলেন, এবং চেষ্টা করতে লাগলেন এইসব 'ভিখারী'গুলোর স্পর্দ্ধার প্রতিফল দিতে। কিন্তু ফরাসীরা তখন বহুদিনের পর মুক্তির আস্বাদ পেয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে, এইসব গোলমালের মধ্যেও তারা বিদেশীদের সব আক্রমণই প্রতিরোধ করলে।

বিদেশীদের আক্রমণে আত্মরক্ষা করলে বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভেতর থেকে এমন আঘাত এল যে ফরাসীদের এই সাধারণ-তন্ত্র সে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে পারলে না, আবার রাজতন্ত্রের কাছেই আত্মসমর্পণ করলে। এই আঘাত যিনি দিলেন তিনি ওদেরই জাতীয়বাহিনীর এক নগণ্য সেনা-নায়ক, ইউরোপ-ত্রাস নাপেলেয়ঁ বা নেপোলিয়ন!

নেপোলিয়ন

ফ্রান্সের দক্ষিণে আধা-ফরাসী আধা-ইটালীয়ান কর্সিকা দ্বীপে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অদ্ভুত মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্তই সাধারণ ঘরে জন্মেছিলেন, ঐশ্বর্য্য ছিল না, রাজবংশের রক্তও ছিল না দেহে; কিন্তু অসাধারণত্বের যা সবচেয়ে বড় সনদ, প্রতিভা, তাঁর সকল অভাব ঢেকে দিয়েছিল।

লড়াইয়ের বিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে তিনি জাতীয় সৈন্যদলে যোগ দেন এবং মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তুলোর যুদ্ধে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়ে ওঠেন। এই সময়ে বিপ্লবী নেতা রোবস্‌পিয়েরের পতনের পর ফ্রান্সে পাঁচজন ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। সেই ডিরেক্টারদের অধীনেই সেনাপতি-রূপে তিনি ইটালীতে যুদ্ধ-যাত্রা করলেন। তখন ফ্রান্সের সৈন্যদের দারুণ দুরবস্থা; কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা, বাক্য-কৌশল এবং পরিশ্রমের দ্বারা তাদের মধ্যে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন; ঐ উপবাসক্লিষ্ট সৈন্যরাই ইটালী জয় করে অস্ট্রিয়ার বিপুল বাহিনীকে হারিয়ে দিলে। ওখানে নিজের ইচ্ছামত সন্ধি করে তিনি সহসা হানা দিলেন মিশরে, এবং সেখানকার অটোমান শাসকদের হারিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত নিজের ক্ষমতা বিস্তার করলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন স্থল-যুদ্ধে অপরাজেয় হ'লেও জল-যুদ্ধের কিছু বুঝতেন না, আর ঐটাতেই ইংরেজরা ছিল সে সময় দুর্দ্ধর্ষ। তাদের সেনাপতি নেলসন মিশরের বন্দরে তেড়ে এসে নেপোলিয়নের সমস্ত জাহাজগুলো নষ্ট করে দিলেন। নেপোলিয়ন কোনমতে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন বটে কিন্তু তাঁর মিশর-বিজয়ের সঙ্গীদের অধিকাংশকেই ত্যাগ করে আসতে হ'ল।

দেশে ফিরে এসে নেপোলিয়ন কতকটা গায়ের জোরেই ডিরেক্টারদের তাড়ালেন, সে জায়গায় তিনজন কন্‌সালে মিলে রাজ্যশাসন করবে এই ব্যবস্থা করলেন। আর বলাই বাহুল্য যে তিনি নিজেই হলেন সেই তিনজনের মধ্যে প্রধান। এর পর প্রধান কন্‌সালের আসন থেকে সিংহাসনে পৌঁছতে তাঁর বেশী বিলম্ব হ'ল না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দেশের লোকই তাঁকে রাজরূপে চাইছে এই অজুহাতে বিরাট এক রাজ্যাভিষেক উৎসবের আয়োজন করলেন। স্থির হ'ল যে অভিষেকে পৌরোহিত্য করবেন স্বয়ং পোপ। পোপ কতকটা বাধ্য হয়েই এ কাজে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু মুকুট পরাবার সময় অসহিষ্ণু নেপোলিয়ান পোপের হাত থেকে সম্রাটের মুকুট কেড়ে নিয়ে নিজের মাথায় প'রে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

তার পর থেকে যে দশ বৎসর তিনি রাজত্ব করেছিলেন সেই দশ বৎসরেই ইউরোপের সমস্ত শক্তি কেঁপে উঠেছিল। শুধু ইউরোপের নয়, সুদূর প্রাচ্যে পর্য্যন্ত বহু লোক বহু দিন অবধি অশান্তিতে কাটিয়েছে। কত যে যুদ্ধ তিনি জিতেছিলেন, তার বিবরণ এই বইতে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই লোকে তাঁর কাছে মাথা নুইয়েছে। একমাত্র তিনি বাধা পেয়েছিলেন রাশিয়াতে গিয়ে, কিন্তু তাও মানুষের কাছে ততটা নয়, যতটা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির কাছে। শুধু বরফ আর বরফ, সে সাংঘাতিক শীতের চেহারা ফরাসীদের দেখা ছিল না। তার ওপর ওরা যত এগিয়েছে, রুশরা ততই পিছিয়েছে—নষ্ট করে দিয়ে গেছে সেই সঙ্গে যত খাদ্য-শস্য। ঐ শীতে এবং অনাহারে নেপোলিয়নের ছয় লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই সে দেশে বরফের নীচে মহাবিশ্রাম লাভ করল। তবু জয়ও তিনি কম করেন নি ত! ইটালী, স্পেন, অস্‌ট্রিয়া, জার্ম্মানী সমস্তই একে একে তাঁর পদানত

হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চারিদিক থেকে সকলে মিলে তাঁকে যখন একসঙ্গে আক্রমণ করলে তখন বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষেও আর সম্ভব হ'ল না; ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হ'ল। কথা হ'ল যে তাঁকে এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসন দেওয়া হবে, সেখানেই তিনি যতটা পারেন রাজত্ব করবেন।

নেপোলিয়নকে এল্‌বাতে পাঠিয়ে সকলে তখনকার মত নিশ্চিন্ত হ'ল বটে কিন্তু বৎসর-খানেকের মধ্যেই সকলের চোখে ধূলো দিয়ে তিনি আবার এসে ফ্রান্সের মাটীতে নামলেন। পৌঁছলেন তিনি প্রায় একাই, নিঃসঙ্গ অবস্থাতে, কিন্তু দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে প্রজারা ছুটে এসে তাঁর চারিদিকে সমবেত হ'ল। বুর্ব্বোরাজ অষ্টাদশ লুই (নেপোলিয়নকে তাড়িয়ে শক্তি-সঙ্ঘ এঁকেই সিংহাসনে বসিয়েছিল) যে সব সৈন্য পাঠালেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, তারাই, তাদের প্রিয়তম সেনাপতিকে দেখে, "সম্রাটের জয়" বলে চীৎকার করে উঠল এবং তাঁরই পক্ষে যোগ দিলে। এই সংবাদে অষ্টাদশ লুই বিষম ভয় পেয়ে রাজধানী ছেড়ে পালালেন, নেপোলিয়ন আবার বিজয়গর্ব্বে পারীতে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু এ গৌরব তাঁর স্থায়ী হয়েছিল মাত্র একশ-টি দিন। তাঁকে আবার ফিরতে দেখে ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে নিজেদের সমস্ত ঝগড়া ভুলে আবার একযোগে তাঁকে আক্রমণ করলে। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ইংরেজ ও প্রুশিয়ার মিলিত শক্তির কাছে নেপোলিয়ন হেরে গেলেন এবং ইংরেজদের হাতেই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। এবার ইংরেজরা যথেষ্ট সতর্ক হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গিয়ে একান্ত অস্বাস্থ্যকর সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে কড়া পাহারার মধ্যে বন্দী করে রেখে দেওয়া হ'ল; আর সেইখানেই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই সময়ে বাইরের কোন লোক, কোন সংবাদ যাতে তাঁর কাছে না পৌঁছয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তার স্ত্রী, পুত্র বা বৃদ্ধা-মায়েরও কোন খবর তাঁকে দেওয়া হ'ত না।

নেপোলিয়নের পতনের পর পুনশ্চ বুর্ব্বোঁ রাজাদেরই এনে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। কিন্তু সে শাসন তখন আর কেউ মেনে নিতে চাইলে না। বছর-কতক পরেই আবার ফ্রান্সের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং বুর্ব্বোঁদের তাড়িয়ে আবার একটা সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলে। কিন্তু তা-ও স্থায়ী হ'ল না। নেপোলিয়নের ভাইপো, তৃতীয় নেপোলিয়ন, তার সভাপতি হলেন, এবং তারপর কাকারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্রাট পদবী গ্রহণ করলেন। তবে তৃতীয় নেপোলিনের অদৃষ্টও প্রথমের চেয়ে বিশেষ ভাল ছিল না, তাঁকেও খুব বেশীদিন রাজত্ব করতে হয়নি। তখন ইউরোপের শক্তি-প্রতিযোগিতায় প্রুশিয়াই এগিয়ে চলেছিল সবার চেয়ে বেশী, প্রুশিয়ার হাতে তৃতীয় নেপোলিয়নেরও পতন হ'ল। প্রুশিয়া এগিয়ে এসে পারী পর্য্যন্ত দখল করলে এবং অত্যন্ত অপমানকর শর্ত্তে ফ্রান্সকে সন্ধি করতে হ'ল। এই সময় থেকেই পুনরায় যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছে।

প্রুশিয়ার মন্ত্রী বিশ্ববিখ্যাত বিস্‌মার্ক এই সময় প্রুশিয়ার শক্তিকে এমন অজেয় করে তুললেন যে জার্ম্মানীর অসংখ্য খণ্ড-খণ্ড রাজ্য তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হ'ল এবং ঐ সমস্ত রাজ্যগুলি মিলিত হয়ে জার্ম্মান্ সাম্রাজ্যে পরিণত হ'ল। বলা বাহুল্য, প্রুশিয়ার রাজাই জার্ম্মানীর সম্রাট হলেন।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে

যখন এইসব রাজনৈতিক ব্যাপারে ইউরোপ একান্ত ব্যস্ত বলে বোধ হচ্ছিল তখন এ সমস্তর আড়ালে আরও বহু পরিবর্ত্তনই শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রাচ্য দেশের অপেক্ষা বহু বিলম্বে এখানে পৌঁছলেও এরা সেটাকে খুব দ্রুত কাজে লাগাতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে যন্ত্রবিজ্ঞান। এই সময় থেকেই এখানে রেলগাড়ী চলতে আরম্ভ করেছিল। রেলগাড়ী, আর বাষ্পযন্ত্র-চালিত জাহাজ—এই দুটি ব্যাপার মিলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে দিলে সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লে। যা ছিল সুদূর, যা ছিল আয়ত্তের বাইরে, তা সহসা যেন নিকট হয়ে গেল। রোমসাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোম শহর এত দূর হয়ে গেল যে সেখানকার বহুদিনের সাধারণতন্ত্র বাধ্য হয়ে বিদায় নিলে। এ যুগে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাও হয়ত একদিন স্বপ্নে পরিণত হ'ত যদি না এই রেলগাড়ী বহুদূরবিস্তৃত রাজ্যের বিভিন্ন 'স্টেট'গুলির ব্যবধান কমিয়ে মিলনের সমস্ত বাধাই দূর করে দিত। সেই ব্যবধান কমেছে বলেই আজ তা অখণ্ড শক্তিতে পরিণত হতে পেরেছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিতে সুবিধেও যেমন হ'ল, অসুবিধেও হ'ল ঢের। কল-কারখানা স্থাপিত হয়ে ব্যবসার প্রসার হ'ল বটে কিন্তু এইগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, এবং এমন এক প্রকার 'ভূমিহীন' জাতির উদ্ভব হ'ল, যাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য আজকের শাসন-কর্ত্তাদের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। আরও নানারকমের সমস্যা চারিদিক থেকে দেখা দিতে শুরু হ'ল; কল-কারখানা হয়ে যেমন বাণিজ্যের বৃদ্ধি হ'তে লাগল তেমনি সেই সব কারখানার মালিকদের হাতেই দেশের সমস্ত অর্থ (সেই সঙ্গে

শক্তিও) গিয়ে জড়ো হ'তে লাগল। ফলে কতকগুলি লোক যেমন অন্যায়রকম ভাবে বড়লোক হ'তে লাগল, কতকগুলি লোক, তেম্নি (শ্রমিক শ্রেণীর লোক) একেবারে দারিদ্র্যের শেষ স্তরে নামতে লাগল। কিছুদিন এই ভাবে চলার পর যখন দেখা গেল যে এ-সব সমস্যার সমাধান না হ'লে চলবে না, তখন একশ্রেণীর লোক লেগে গেলেন তার সমাধানের জন্য। সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজতন্ত্র নামক যে শব্দটি আজকাল সকলের মুখে মুখে বহু-পরিচিত হয়ে উঠেছে, সে বস্তুটিও ঐভাবে, মানুষের একান্ত তাগিদেই, জন্মেছে। তারপর কার্ল মার্কস্ দেখা দিলেন। ইনি জাতে ছিলেন জার্ম্মান, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। তাঁর আগেও পৃথিবীর ধনসম্পদের অযৌক্তিক বন্টন এবং 'শ্রেণী সংঘর্ষ' (ধনী ও শ্রমিকদের) নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছিলেন বটে কিন্তু মার্কস্ই এ ব্যাপারে বেশী বিখ্যাত, এবং বর্ত্তমান কালের কম্যুনিজ্‌ম্ নীতিও তাঁর মতবাদ থেকেই গড়ে উঠেছে। তিনি বললেন, ধন এবং ধনোৎপত্তির সমস্ত উপাদান সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবেই পরিগণিত হওয়া উচিত, আর সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি-সভার হাতেই সেইসব ধন-উৎপাদনের, যন্ত্র-পরিচালনার এবং (সকলের সমান কল্যাণের জন্য) সেইসব ঐশ্বর্য্য-বন্টনের ভারও থাকা উচিত। তা ছাড়া, তিনি আরও বললেন, প্রত্যেককেই নিজের জীবিকার জন্য শ্রম করতে হবে, উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্থ বা ভূ-সম্পত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, শাসন-পরিষদ থেকেই প্রত্যেকের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমস্ত রকম আনন্দ উপভোগের উপকরণে প্রত্যেকের সমান অধিকার স্বীকার করতে হবে। এই হ'ল মার্কস্‌বাদের মূল কথা।

ইতিমধ্যে ইউরোপীয়ানরা, কতকটা তাদের নবলব্ধ উন্নত

যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্যেই, পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করতে এসে কেমন করে কৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘর্ষের সুযোগে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, তা আগেই বলেছি। কিন্তু কোম্পানীর যে সব কর্ম্মচারীরা এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তাদের গ্রহণের বিদ্যাটা যতটা জানা ছিল, রক্ষা করার বিদ্যাটা তত ছিল না। তারা নানা রকমে দেশের লোককে বিরক্ত করে তুলল। শেষ পর্য্যন্ত ডালহাউসী নামক একজন অতিলোভী গবর্ণর-জেনারেলের নির্ব্বুদ্ধিতায় দেশের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং যে-সিপাহীরা ইংরেজদের রাজ্যস্থাপনের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিল তারাই বিদ্রোহ করে এখানে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে প্রায় ব্যর্থ করে তুলল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লর্ড ক্যানিং বলে আর একজন গবর্ণর-জেনারেলের বুদ্ধিকৌশলে কোনমতে বিদ্রোহ মিটে যায়। তিনি কতকটা ভয় দেখিয়ে, কতকটা মিষ্টি কথায় সবাইকে ঠাণ্ডা করলেন। তবে কোম্পানীর রাজত্ব আর রইল না। কোম্পানীর অত্যাচারের কাহিনী কিছু কিছু বিলেতে পৌঁচেছিল। পাছে এদের বোকামীতে এতবড় দেশটা হাতছাড়া হয় এই ভয়ে ইংলণ্ডের তদানীন্তন মন্ত্রিসভা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতের সম্রাজ্ঞী'-রূপে ঘোষণা করা হ'ল।

ভারতবর্ষের দিকে প্রথম থেকেই এদের যতটা নজর ছিল, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার দিকে ততটা ছিল না, বরং কেউ কেউ এমন কথাও বলতেন যে সেখানে সাম্রাজ্য বিস্তারে নিতান্তই ইংলণ্ডের শক্তির অপব্যয় হচ্ছে। কিন্তু রেলগাড়ী বা জাহাজের চলন হওয়াতে দেশের পণ্য চালান দেওয়া যখন সহজ হয়ে পড়ল

তখনই দেখা গেল যে সেই দেশগুলিই সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও শক্তি-বৃদ্ধির মূল উৎস হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার ধাতুদ্রব্য, পশম, কানাডার শস্য ও অন্যান্য জিনিস যখন চারিদিকে চালান হ'তে লাগল—সকলের চক্ষু হয়ে উঠল প্রলুব্ধ। অস্ট্রেলিয়া দেশটি ইতিমধ্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরাই ধীরে ধীরে দখল করে নিয়েছিল।

এ ছাড়াও, ইংরেজরা প্রাচ্যে বহু দেশের মালিক বা অর্দ্ধ-মালিক হয়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ড ও পর্ত্তুগালও তাদের প্রাচ্যের রাজ্যখণ্ডগুলি থেকে প্রচুর সুবিধা পাচ্ছিল। এইসব দেখে ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির চোখ খুলল। জার্ম্মান, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি সকলেই লোলুপ হয়ে উঠল সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য, কিন্তু তখন আর তারা কি নেবে? আমেরিকা মন্‌রো নীতি ঘোষণা করে ওখানকার অরক্ষিত দেশগুলির প্রতি বাইরের লোকের নজর দেওয়া বন্ধ করে দিলে। তখন হাতের কাছে পড়ে ছিল আফ্রিকা, জঙ্গল বলে এতদিন এই মহাদেশটিকে সবাই উপেক্ষাই করত কিন্তু এখন, অগত্যা, তাই-ই ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেল। আফ্রিকার সমস্ত দেশগুলিই একে একে এই ক্ষুধার্ত্ত জাতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে। কোনমতে টিকে ছিল আবিসিনিয়া (প্রাচীন ইথিওপিয়া) কিছুদিন আগে তা-ও ইটালীর করতলগত হয়। সম্প্রতি ইটালীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইথিওপিয়ান্‌রা আবার খানিকটা স্বাধীনতা পেয়েছে।

ভারতবর্ষ ছাড়া প্রাচ্যের আর একটি বহুবিখ্যাত দেশ যা ইউরোপীয়ান্‌রা প্রায় গ্রাস করলে, তা হচ্ছে চীন। এই সুপ্রাচীন দেশগুলির সংস্কৃতির তখন বৃদ্ধ অবস্থা, সুতরাং এগিয়ে চলবার উৎসাহ তখন আর এ জাতিগুলির ছিল না। বহুকালের পুরানো বাড়ীতে যেমন অসংখ্য আগাছা আর জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়, এদের

জাতীয় জীবনেও তেমনি বহু আবর্জ্জনা জড়ো হয়ে উঠেছিল। আর এদিকে ইউরোপের সভ্যতার তখন সবে কৈশোর, কাজেই তারা যে অনায়াসে এই এত দিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ দেশগুলিকে জয় করবে তাতে আর বিস্মিত হবার কি আছে? তা নইলে যে চীন ছাপাখানা, কাগজ, বারুদ, কয়লা প্রভৃতি—ইউরোপীয় সভ্যতার যা যা প্রধান অঙ্গ সবগুলিই—একদা ইউরোপকে দান করেছিল, সেই চীনকেই আধুনিক রণসজ্জার ভয় দেখিয়ে তার অর্দ্ধেক দেশ দখল করা কি সম্ভব হয়?

এখানেও ইউরোপ গিয়েছিল প্রথম বাণিজ্য করতে। তারপর ক্রমশ নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে। ইউরোপের আমদানী করা আফিং খেয়ে খেয়ে সমস্ত দেশবাসী ক্রমশ অ-মানুষ হয়ে যাচ্ছে দেখে যখন কেউ কেউ তার প্রতিবাদ করলে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এল যুদ্ধজাহাজ, ফলে যে যুদ্ধ হ'ল তাতে চীন গেল হেরে (১৮৪০ খৃঃ)। অতঃপর সুবোধ বালকের মত আফিং খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চীনকে সন্ধি করতে হ'ল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও রাশিয়া চীনের খানিকটা করে দখল করে নিল এবং চীনের লোকেরা যখন প্রতিবাদ করতে গেল তখন শাস্তিস্বরূপ আরও খানিকটা করে তারা কেড়ে নিল! আরও হয়ত নিত, সমস্ত চীনটাকেই আজ ভারতবর্ষের মত হয়ত ইউরোপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হ'ত, যদি না ইতিমধ্যে জাপান তার দু-শ' বছরের মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠত। তার এই জাগরণের প্রথম কাজই হ'ল রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই বাধানো এবং তাকে হারিয়ে দেওয়া। রাশিয়ার অত বড় শক্তি ক্ষুদ্র জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সকলেই আশা করেছিল যে জাপানের মৃত্যু অনিবার্য্য; কিন্তু জাপান অনায়াসে রাশিয়াকে হারিয়ে দিলে এবং কোরিয়া ও সাখালিয়েন—এই দুটি জায়গা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিলে। সেই সন্ধির শর্ত্তানুসারেই, মাঞ্চুরিয়ার

যতটা রাশিয়া দখল করেছিল, সবটাই তাকে ছেড়ে চলে যেতে হ'ল।

এই সময় থেকেই এশিয়াতে সাম্রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন ইউরোপকে প্রায় ত্যাগ করতে হ'ল। খুব সম্ভব ওরা আগে ভেবেছিল যে যন্ত্র-বিজ্ঞানটা ওদেরই একচেটে সম্পত্তি; বিজ্ঞানে প্রাচ্যের কোন অধিকার নেই, বা তারা কোনদিন তা দাবীও করবে না। কিংবা ভেবেছিল হয়ত, বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর মত মস্তিষ্ক এদের নেই। কিন্তু জাপান ওদের সে ভুল আজ রূঢ় আঘাতে ভেঙে দিয়েছে।

চীনের এই পতনে হয়ত অনেকেই বিস্ময় বোধ করবেন, কিন্তু তার কারণটা খুবই স্পষ্ট। মাঞ্চুরাজরা চীনের সিংহাসনে বসার পর থেকেই ধীরে ধীরে ওদের এই পতন শুরু হয়েছিল। এই বিদেশী লোকগুলির কু-শাসনে ওদের পূর্ব্বের সমস্ত জ্ঞান-গৌরব ত চলে গিয়েছিলই, বিদেশীদের গতিরোধ করবার ক্ষমতা শুদ্ধ লোপ পেয়েছিল। এক কথায় সমস্ত দেশটা এক রকমের জড়ভরত বা অমানুষের দেশে পরিণত হয়েছিল। তবে এ সম্বন্ধে চীনের লোকেরাও ক্রমে সজাগ হয়ে উঠল এবং নানা গোলমালের পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৯১২) ওরা মাঞ্চুদের তাড়িয়েও দিলে। কিন্তু তবুও তারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। জাপান পাশ্চাত্য জাতিদের কাছ থেকে অন্য বিদ্যার সঙ্গে তাদের সাম্রাজ্যবাদও ভাল করেই আয়ত্ত করেছিল, তাদেরই লোলুপ দৃষ্টিতে চীনের স্বাধীনতা প্রায় নষ্ট হ'তে বসল। জাপান চীনের অনেকখানিই গ্রাস করেছিল, মার্শাল চিয়াং-কাইসেক আমেরিকা ও বৃটেনের সহযোগিতায় একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন সেটুকু বাঁচাবার জন্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ঠেকাতে পারতেন না যদি না ইতিমধ্যেই জাপান এঁদের হাতে পরাজিত হ'ত।

মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)

জার্ম্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ার পরই ইউরোপের বহু পুরাতন শক্তি-প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। জার্ম্মানীও নেপোলিয়ানের সারা ইউরোপ-ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলে, এবং বলা বাহুল্য যে, ইউরোপের অন্যান্য শক্তিরা সেটাকে—আর যাই হোক—প্রীতির চোখে দেখলে না। ফল হ'ল এই যে সমস্ত দেশগুলিই প্রস্তুত হ'তে লাগল বিরাট একটা শক্তিপরীক্ষার জন্য। বছরের পর বছর ধরে ইউরোপের সমস্ত রাজ্যে শুধু মানুষ মারবার নানাবিধ অস্ত্র তৈরি হ'তে লাগল। মানুষ মারবারই নিত্য নতুন উপায় কে কত রকম উদ্ভাবন করতে পারে এরই জন্য যেন রীতিমত পাল্লা চলতে লাগল।

এই আয়োজন যেদিন সম্পূর্ণ হয়ে উপ্‌ছে উঠল, সেদিনই বাধল লড়াই,—সামান্য এক ছুতোতে। একটি মাত্র হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রথম অস্‌ট্রিয়া সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, জার্ম্মানী অস্‌ট্রিয়ার দিকে যোগ দিলে এবং রাশিয়া ও ফ্রান্স নাম্‌ল সার্ভিয়াকে রক্ষা করতে। জার্ম্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করবার জন্য বেলজিয়ামের মধ্যে দিয়ে যেমন হানা দিতে এল অমনি বেলজিয়ামকে রক্ষা করবার জন্য ইংলণ্ডও যুদ্ধে নামল, আর সঙ্গে সঙ্গে জাপান দিল ইংলণ্ডের দিকে যোগ। ইতিমধ্যে তুর্কী ও বুলগেরিয়া গেল জার্ম্মানীর দিকে, আর ইটালী যেন তার পাল্‌টা জবাব স্বরূপই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে চলে এল। আরও কিছু দিন পরে আবার আমেরিকা ও চীন মিত্রশক্তির (মানে ইংলণ্ডের দল) হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

এই বিরাট যুদ্ধ, এতগুলি শক্তির এই আত্মহত্যা, চলেছিল দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর ধরে। ওদের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ার

ফলে যুদ্ধের চেহারা গিয়েছিল একেবারেই বদলে, আর সেইজন্যই এত দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলা সম্ভব হয়েছিল। কতরকম যন্ত্র যে এই যুদ্ধে প্রথম দেখা গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। আগে শুধু ডাঙায় যুদ্ধ হ'ত, তারপর আরম্ভ হ'ল জলে; এই মহাযুদ্ধের সময় থেকে আকাশেও লড়াই হ'তে আরম্ভ হ'ল। সাবমেরিন, মাইন, এরোপ্লেন —আরও কত কি! মানুষ তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা দিতে লাগল শুধু মানুষ মারবার নিত্য-নূতন অস্ত্র উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়েই। লড়াই যত চলতে লাগল, তত আরও নতুন নতুন যন্ত্র, নতুন নতুন কৌশল দেখা দিতে লাগল!

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রভাব সারা পৃথিবীর উপরই পড়েছিল সে সময়। কতকগুলি লোকের পাপের ফল ভোগ করলে অল্পবিস্তর সারা পৃথিবীর লোকই। আর ইউরোপের ত কথাই নেই। যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল তখন সক্ষম পুরুষ বোধ হয় একটিও আর ছিল না ওখানে। চতুর্দ্দিকে দারুণ অন্নাভাব দেখা দিলে। চাষ করবে কে? করবে কোথায়? দুর্ভিক্ষের পেছনে পেছনে মহামারীও এসে পড়ল। এক ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই যে কত লোক মারা গেল তার সংখ্যা নেই। অবশেষে ১৯১৮ সালের শেষভাগে ক্লান্ত ও পরাজিত জার্ম্মানী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল। ভার্সাই প্রাসাদে বসে ইংরেজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের নির্দ্দেশক্রমে অত্যন্ত অপমানকর শর্ত্তে জার্ম্মানী সন্ধি-প্রস্তাবে স্বাক্ষর করলে।

ইউরোপব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরাশা বিসর্জ্জন দিয়ে সম্রাট উইলহেল্‌ম্ হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। জার্ম্মানীতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার ফলাফল

পৃথিবীতে বড় বড় যুদ্ধ ইতিপূর্ব্বে ঢের হয়েছে কিন্তু তবু মহাযুদ্ধ বলতে আজও আমরা ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের এই যুদ্ধটিকেই বুঝি। তার একটা কারণ এই যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় শক্তিই অল্প-বিস্তর এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং সারা পৃথিবীতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয় ও সব চেয়ে বড় কারণ হ'ল এই যে বর্ত্তমান পৃথিবীতে চারিদিকেই যে সব রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে, জাতীয় জীবনে যে সব নতুন নতুন সমস্যা প্রত্যহ উৎকট হয়ে উঠছে তার জন্য প্রধানত দায়ী এই যুদ্ধটিই।

ধরা যাক্ রাশিয়ার কথাই! এই দেশটির নবজন্ম লাভই আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় এবং বোধ হয় ভয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দেশটির মালিকদের কু-শাসনের কথা আগেই বলেছি। এদের দেশের সাধারণ প্রজারা ছিল গরু-ঘোড়ার মতই জমিদারদের সম্পত্তি, আমরা যেমন জমি বিক্রী করি, ওরা তেমনি প্রজা বিক্রী করত। এইসব জমিদাররা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নতুন নতুন আমোদের সন্ধান করা ছাড়া, তাদের আর কোন কর্ত্তব্য আছে বলে স্বীকারই করত না! ফলে যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ বাধে তখন শাসকদের এই বহুদিনের অকর্ম্মণ্যতার ফলে দেশ ভেতরে ভেতরে একেবারে ফোঁপরা হয়ে উঠেছে। অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল অবশ্য বহুদিন আগে থেকেই—দেশের একদল লোক অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করছিলেন জারের শক্তিকে উচ্ছেদ করতে। তবু তাঁরা তখনও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। সুযোগ এল এই মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই। দেশের কতকগুলি লোক অপদার্থ, বিলাসী, আর বাকীগুলি পশুর মতই নিরক্ষর এবং দরিদ্র। তার ওপর রাজা ও রাজ-পরিবারকে চালিত করছেন রাস্‌পুটিন

নামে এক উন্মাদ সন্ন্যাসী; এই যখন দেশের অবস্থা তখন সহসা একদিন যুদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়া হ'ল, এবং বিপুল একদল সৈন্য সীমান্তে পাঠানো হ'ল অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তাদের সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্র নেই, অন্য কোন রণসম্ভার নেই, এমন কি পর্য্যাপ্ত খাদ্যও নেই। মিত্রশক্তির তাতেই যথেষ্ট সুবিধে হ'ল, কারণ জার্ম্মানী সম্পূর্ণভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দিতে পারলে না, আর খুব সম্ভব তাইতেই সে-যাত্রা ফ্রান্স রক্ষা পেয়ে গেল— কিন্তু এ বেচারীরা দলে দলে পতঙ্গের মত অসহায় ভাবে শুধু মরতেই লাগল।

কথায় আছে যে, অকারণে খোঁচালে গর্ত্তের নিরীহ ব্যাঙও এক সময়ে প্রতিবাদ করে; এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল, এই গড্ডলিকা-প্রবাহের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিলে এবং ক্রমশ সে অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করলে। সীমান্তের যুদ্ধ ত এক রকম বন্ধ হয়ে এলই, ১৯১৬ সালের শেষে রাস্পুটিনের হত্যায় প্রকাশ্য বিদ্রোহেরও একটা সূচনা প্রকাশ পেলে। এই সময়ে জন-কয়েকে মিলে শাসন-ব্যবস্থায় একটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা চলতে লাগল কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হ'ল না। অবশেষে ঘটনার চাপে পড়ে সতের সালের মার্চ্চ মাসে প্রবল-প্রতাপ জারকেও সিংহাসন ত্যাগ করতে হ'ল। এই সময় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার পড়ল জন-নেতা কেরেন্‌স্কীর হাতে। ইনি সমস্ত ব্যাপারটার সু-মীমাংসা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। এঁদের মিত্রপক্ষ ইংরেজ ও ফরাসীরা এঁদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার কিছুই বুঝতেন না, কেরেন্‌স্কীর সন্ধি-প্রস্তাবে ত তাঁরা কর্ণপাত করলেনই না বরং অনবরত এঁদের ওপর চাপ দিতে লাগলেন যুদ্ধ চালানোর জন্য। অথচ দেশবাসীও তখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁচেছে—তারা কিছুতেই আর অকারণে মরতে রাজী হ'ল না।

এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে একদল নতুন অভিনেতা দেখা দিলে,—এদের নাম হ'ল বোলশেভিক এবং এদের নেতা হলেন বিরাট পুরুষ লেনিন। এদেরই চেষ্টায় ১৯১৮ সনের মার্চ্চ মাসে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে এক স্বতন্ত্র সন্ধি হল।

এই নবাগত আগন্তুকরা অতঃপর মার্কস্-নীতির ওপর ভিত্তি করে দেশের অভ্যন্তরীণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হ'ল। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে শোচনীয় দুরবস্থার হাত থেকে আশু রক্ষা করা, কিন্তু বাইরের পৃথিবী এই অভূতপূর্ব্ব শাসন-ব্যবস্থার গুজব শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল। তখন সবে মহাযুদ্ধ থেমেছে, কিন্তু তাতে কি? সবাই মিলে একযোগে রাশিয়াকে আক্রমণ করলে। প্রথম এল ইংরেজ, তারপর জাপান, রুমানিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, এস্তোনিয়া, পোলাণ্ড—তা ছাড়া গৃহ-শত্রুর দল ত আছেই! একে বেচারীরা পাঁচবৎসর যুদ্ধের ফলে নিঃস্ব ও একান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার ওপর এই 'সপ্তরথী আক্রমণ'! কিন্তু লেনিন ও তাঁর দল এই ভীষণ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলেন—১৯২১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এইসব শত্রুরাই একে একে নতুন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল।

এরপর লেনিন ভেতরের দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রথমটা তাঁর নীতি কার্য্যকরী হয় নি, কিছু কিছু পুরোনো প্রথাতেই কাজ চালাতে হয়েছিল; কিন্তু ১৯২৮ সালে পাঁচ বৎসরের মত একটা কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত করে নিয়ে বোলশেভিকরা কঠিন হস্তে নিজেদের আদর্শে দেশকে গড়তে আরম্ভ করলেন। গোড়ার দিকে এ তালিকা বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু বহু দুঃখের আঘাত সহ্য করেও শেষ পর্য্যন্ত এই আদর্শ দেশবাসী গ্রহণ করলে, এবং ক্রমশ রাশিয়া আবার অজেয় শক্তিরূপে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল। উন্নতি হয়ত আরও দ্রুত হ'ত যদি লেনিন জীবিত থাকতেন। কারণ লেনিনের অকাল-মৃত্যুর

পর তাঁর দু'জন অনুচর ট্রট্‌স্কি ও স্ট্যালিনের মধ্যে অধিনায়কত্ব নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তাতে অনেকটা অভ্যন্তরীণ বলক্ষয় হয়েছিল। যাই হোক্—শেষ অবধি ট্রট্‌স্কি হঠে গেলেন, স্ট্যালিনই সেখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে উঠলেন। স্ট্যালিনের একনায়কত্বে রাশিয়া আবার পৃথিবীর ভীতি-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে সব দেশ তার হস্তচ্যুত হয়েছিল, বলতে গেলে বিনা বাধায় ও বিনা যুদ্ধে, তার অধিকাংশই একে একে পুনরায় রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হ'ল। তারপর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে—রাশিয়া এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তাকে আজ পৃথিবীর ভীতিস্বরূপ বললেও খুব অত্যুক্তি হয় না। স্ট্যালিন মারা গেলে—সেখানে ক্ষমতা নিয়ে আবারও কিছু কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল বটে—তবে তাতে রাশিয়ার শক্তি বা আধিপত্য কিছু কমেনি।

জার্ম্মানীও চুপ করে ছিল না। যুদ্ধের পর প্রতিহিংসা-পরায়ণ মিত্রশক্তি যে সন্ধি-শর্ত্ত দিয়েছিলেন, তাতে সকলেই মনে করেছিল যে বহু শতাব্দীর মধ্যে জার্ম্মানী আর মাথা তুলতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সহসা সেখানেও এক শক্তিমান পুরুষ দেখা দিলেন; ইনি হলেন য়্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার, জাতিতে জার্ম্মান, জন্মস্থান অস্‌ট্রিয়া, অতি সাধারণ ঘরে জন্ম, এবং সামান্য সৈনিকরূপেই মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভার্সাইতে যে সন্ধি হয় তার শর্ত্ত বহু জার্ম্মানের মনেই অসন্তোষ জাগিয়েছিল। তাদের, সন্ধি-শর্ত্তানুসারে সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে ফেলাতে যে সব অসংখ্য সেনা ও সেনানায়ক বেকার হয়ে পড়েছিল, তাদের নিয়ে হিটলার দল পাকালেন এবং নিজেদের দলের নাম দিলেন (*National sozialist*) ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি বা সংক্ষেপে নাৎসী (Nazi)। ক্রমে ক্রমে, এই দল শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। এরা কমিউনিস্ট (মার্কস্‌-বাদী)-দেরও বিরুদ্ধে যেমন দাঁড়াল, ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষী ইহুদী

ব্যবসায়ীদের (দেশের বড় বড় ব্যবসাগুলো নাকি এরাই একচেটে করেছিল এবং সর্ব্বপ্রকারে জার্ম্মানীর জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করছিল) উপরও তেমনি খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মান সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি হিণ্ডেনবার্গ হিটলারের শক্তি স্বীকার করে নিলেন এবং ওঁকে ডেকে চ্যান্সেলার বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদ দিলেন।

কিন্তু হিটলারের জয়লিপ্সা এখানেই থামল না। ১৯৩৩ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে দেশের সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতা এই নাৎসীদের হাতেই চলে গেল আর হিটলার হ'লেন তাদের 'ডিক্টেটার'। সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হাতে পাবার পরেই তাঁর প্রথম কাজ হ'ল ইহুদীদের তাড়ানো এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অরাজকতা কঠিন হস্তে দমন করে সমস্ত জার্ম্মান ভাষা-ভাষী জাতিগুলিকে একই শাসনতন্ত্রের মধ্যে নিয়ে আসা। সেই উদ্দেশ্যে গত ১৯৩৮ সালে সহসা তিনি অস্ট্রিয়ায় হানা দিলেন এবং বিনা বাধায় অস্ট্রিয়া জার্ম্মান-সাম্রাজ্যভুক্ত ক'রে নিলেন। তার পর তিনি মন দিলেন সাম্রাজ্য-বিস্তারে। চেকোশ্লোভাকিয়া (এইসব ছোট ছোট রাজ্যগুলি মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর সাম্রাজ্য ভেঙে তৈরী হয়েছিল) গেল, পোলাণ্ডও গেল। পোলাণ্ডের যখন অর্দ্ধেক হিটলারের করতলগত হয়েছে তখন বিপদ বুঝে স্ট্যালিনও এগিয়ে এসে বাকী অর্দ্ধেকটা দখল করে নিলেন। হিটলার যদিও মার্কস্‌বাদীদের ঘোরতর বিরোধী তবু জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে এই দু'টি শক্তির সন্ধি করতে একটুও আটকাল না, দুজনে তখনকার মত একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

মিত্রশক্তিরা প্রথমটা আবার বিপুল যুদ্ধের আশঙ্কায় চুপ করে ছিলেন, আর বোধ হয় যুদ্ধের জন্য ঠিক তখন প্রস্তুতও ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশ হিটলারের সাম্রাজ্য-লিপ্সা যখন বেশ স্পষ্ট রূপ ধারণ

করলে তখন এঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না, পোলাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন—যদিও পোলাণ্ডকে কোন সাহায্য করা এঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। যুদ্ধ ঘোষণা করার পরও কিছুদিন পর্য্যন্ত বস্তুত কোন যুদ্ধই বাধেনি। একেবারে ১৯৪০ সালে জার্ম্মানীর নরওয়ে আক্রমণ নিয়ে রীতিমত লড়াই শুরু হ'ল। মিত্রপক্ষ প্রথমটা খুবই মার খেলেন এদের হাতে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, হলাণ্ড ও বেলজিয়াম জার্ম্মানীর অধিকারভুক্ত হবার পর ইটালী জার্ম্মানীর দিকে যোগ দিলে এবং এদের মিলিত শক্তির কাছে ফ্রান্সকেও আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। এইভাবে প্রায় সমস্ত ইউরোপ দখল করার পর হিটলার অকস্মাৎ কিছুদিনের বন্ধু রাশিয়াকেও আক্রমণ করলেন এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে রাশিয়া আর তার মিত্রপক্ষের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন।

এইবার ইটালী। ইটালীও প্রথম মহাযুদ্ধের পর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আবার এ'কে যিনি প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করেছিলেন, তিনি হলেন আর একজন ডিক্টেটার—তাঁর নাম বেনিটো মুসোলিনী। ইনিও সামান্য অবস্থা থেকে ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হন, কিন্তু ইনি ইটালীর রাজাকে তাড়ান নি, বহুদিন পর্য্যন্ত নামে তিনিই রাজা ছিলেন। এঁর দলের নাম হ'ল ফ্যাসিস্ট দল, এঁদেরও নীতি মার্কস্-বিরোধী। ইনি বলতেন 'আমাদের আর কোন নীতি নেই, আর কোন আদর্শ নেই,—আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ইটালীকে শক্তিশালী, সুখী এবং নিশ্চিন্ত করে তোলা।' মুসোলিনীর আমলেই ইথিওপিয়া ইটালীর কুক্ষিগত হয়। ইনিও জার্ম্মানীর পক্ষে যোগ দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষে মিলিত শক্তির চাপে পরাজিত ও অপদস্থ হয়ে শেষে

প্রাণটি পর্য্যন্ত হারিয়েছেন। জার্ম্মানী ও ইটালীর এই পরাজয় সম্ভব হয় প্রধানত রাশিয়া ও আমেরিকার যুদ্ধে অবতরণের জন্যই। ফলে বর্ত্তমানে সমগ্র ইউরোপই কতকটা রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের পদানত কিংবা মুখাপেক্ষী।

আর একটি জাতি, যার আকস্মিক উন্নতির কথা বলা এখানে প্রয়োজন, সে হচ্ছে তুর্কজাতি। এদের সাম্রাজ্য বহুদিন ধরেই ঝাঁঝরা হয়ে উঠেছিল এবং মহাযুদ্ধের পর সকলেই আশঙ্কা করেছিল, একেবারেই বুঝি লোপ পাবে। আর বাস্তবিক সেই অবস্থাই হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয়ানরা এদিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ খলিফা বা সুলতান এদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ একটি লোকের আগমনে সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল; তিনি হলেন গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা বা কেমাল আতাতুর্ক। কেমালও ছিলেন একজন সাধারণ সেনানায়ক, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি তুর্কী সেনাদলেই ছিলেন। ইনি দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশের শাসন-রশ্মি নিজের হাতে তুলে নিলেন। আর প্রায় অমানুষিক চেষ্টায় বিদেশীদের হাত থেকে তুর্কীকে রক্ষা ত করলেনই, কঠোর-হস্তে সমস্ত অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল থামিয়ে তুর্কীকে প্রগতিশীল এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করলেন। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা প্রথমে চোখ রাঙিয়ে এসেছিলেন এঁকে দমাতে কিন্তু বেগতিক দেখে সবাই একে একে সন্ধি করলেন। কেমাল বাইরের শত্রুদের দমন করে ভেতরের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করলেন। তিনি ধর্ম্মের কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকেই বিদায় দিয়ে দিলেন, অবরোধ-প্রথা উঠিয়ে স্ত্রীলোকদের সর্ব্ব বিষয়ে সমান অধিকার দিলেন, ইউরোপীয় পোশাকের প্রবর্ত্তন করলেন এবং আরবী অক্ষরের পরিবর্ত্তে রোমান

অক্ষরের চলন করে সর্ব্ব বিষয়ে দেশকে পাশ্চাত্ত্য শক্তির সমকক্ষ করে তুললেন।

সম্প্রতি কেমাল মারা গেছেন বটে, এবং সে জায়গায় ওখানকার ভাগ্যবিধাতা যিনি হয়েছিলেন, কেমালেরই এক সহকর্মী (ইসমেত ইনেনু) তিনিও আর নেই—তাঁর জায়গায় নূতন শক্তিমানরা কাজের ভার নিয়েছেন। কিন্তু কেমাল এমন ভাবেই নব্য-তুর্কীকে গঠিত করে গেছেন যে আজ বড় বড় ইউরোপীয় শক্তিদেরও একে সমীহ করে চলতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তুর্কী এবং স্পেনের নতুন ডিক্টেটার জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিরপেক্ষ ছিলেন, যদিচ আরও কিছুদিন যুদ্ধ চললে কি হ'ত বলা যায় না। ফ্রাঙ্কোও গণতান্ত্রিক স্পেনে ডিক্টেটারী শাসন প্রবর্ত্তন করে কর্ত্তা হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিস্টদের পরাজয়ের ফলে তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি রাশিয়ার ভয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আবার এঁকে দলে টানবার চেষ্টা করাতে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন।

আর একটি প্রাচীন এবং সুসভ্য জাতির পরিণতিও উল্লেখযোগ্য। সে হচ্ছে চীন। চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চিয়াং কাইশেক প্রায় তার সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসেছিলেন—তা আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে জাপান চীন আক্রমণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকখানি গ্রাস করে বসে। জাপানের পতনের পর সুবিধা হওয়ারই কথা কিন্তু দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার ফলে এবং হয়ত অনেকটা কুশাসনের জন্যও—চীনের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল এবং বিপুল একটা গৃহযুদ্ধ বাধল। কম্যুনিস্টরা রাশিয়ার সাহায্য লাভ করলে, চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করতে লাগলেন মার্কিন শক্তি। তাতেও চিয়াং কাইশেক টিকতে পারলেন না; চীনের প্রধান ভূখণ্ড ত্যাগ ক'রে তাঁকে ফরমোজায় গিয়ে

আশ্রয় নিতে হ'ল। এখন সমগ্র চীনই কম্যুনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং-এর করায়ত্ত। কিছুদিন আগে কম্যুনিস্ট চীন তিব্বত পর্য্যন্ত অধিকার করেছে আর সেখানেও থামে নি। খুব সম্প্রতি ভারত-সীমান্তেরও কিছু কিছু আকস্মিক আক্রমণে দখল করে নিয়েছে। তাছাড়া সমগ্র ভারত-চীন সীমান্ত জুড়ে যে ভাবে সৈন্য সমাবেশ করছে তাতে মনে হয় আরও অনেকখানিই ওরা দখল করতে চায়।

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ও গণ্ডগোলের মধ্যে আমাদের কোন স্থান ছিল না, ভারতবর্ষ শুধু অসহায় ভাবে তাকিয়েই ছিল! তার কারণ, তার ভাগ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গেই জড়িত, এই যুদ্ধে ইচ্ছামত কিছু করার অধিকার তার ছিল না—তাকে ইংরেজ ও আমেরিকার ইচ্ছামত চলতে হয়েছে।

তার এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা চলেছে অনেক দিন ধরেই। প্রথমে আবেদন-নিবেদনের উপরেই নির্ভর করা হয়েছিল কিন্তু আবেদন-নিবেদন শুনবে কে? রাজা থাকেন 'সাতসমুদ্দুরের পারে', তিনি বা তাঁর শাসনপরিষদের কাছে আমরা ছিলুম একেবারেই অপরিচিত, যাঁরা শাসন করতেন এখানে এসে, তাঁরা কর্ম্মচারী মাত্র, আমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা শুনে তার আশু প্রতিকারের কোন হাতই ছিল না তাঁদের। ক্রমে ক্রমে কয়েকজন মনীষী বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তার ফলে সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপের লোকেরাও আমাদের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠল। যাঁরা এইভাবে ভারতবর্ষের মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁদের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এবং রাজনীতিক মহাত্মা গান্ধীর নামই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ব্যারিস্টার, দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায় করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ভারতবাসীদের

উপর শ্বেতাঙ্গদের অবিচারের প্রতিবাদ করে প্রথম ইনি সকলের পরিচিত হন। তারপর ভারতবর্ষে এসে এখানকার জাতীয় মহাসভায় যোগ দেন এবং এমন একটি নতুন ধরণের সংগ্রাম শুরু করেন যে সহসা সমস্ত পৃথিবীর লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে। ইনি বললেন, 'রাজশক্তি যদি তোমাদের কথা না শোনে তাহলে তোমরা তার সঙ্গে অসহযোগ কর, কিন্তু ক'রো সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে। তোমরা মার খেও, কিন্তু মেরো না। তাহলে একদিন তাকেই শ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে পড়তে হবে।'

সে এক বিচিত্র ব্যাপার, অদ্ভুত সংগ্রাম! দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ এই সংগ্রামে যোগ দিতে লাগল। ভারতবর্ষের জেলখানাগুলি ভরে যেতে লাগল, কিন্তু সংগ্রাম থামল না। ১৯২১ সাল থেকে এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে, মধ্যে মধ্যে হয়ত সাময়িকভাবে সংগ্রামটা থেমেছে কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন কখনই থামেনি। আর সেই ১৯২১ সাল থেকে শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীই আমাদের জাতির এই জীবনমরণ সংগ্রামের সৈনাপত্য করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জাপান ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত শক্তিকে আক্রমণ করে,—তখন সে মালয়, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অধিকার ক'রে একেবারে ভারতবর্ষের দ্বারে এসে পড়েছিল। এই কঠিন সংকট-মুহূর্তে গান্ধী বলেছিলেন যে ভারতবর্ষকে তার স্বদেশ-রক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার দাও! কিন্তু বৃটিশ সরকার তাতে রাজী হননি, বরং আবার স্বাধীনতা-সংগ্রামের আশঙ্কায় গান্ধী-প্রমুখ নেতাদের কারারুদ্ধ করেছিলেন।

অবশ্য তার ফল শুভ হয়নি। নেতাদের অকারণে বন্দী করায় দেশব্যাপী যে অসন্তোষ ও বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তাতে ইংরেজরা ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন। এই বিপ্লবের শুরু হয় ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে—সেইজন্য একে বলা হয় আগস্ট বিপ্লব। ইংরেজদের

ভয় পাবার আরও এক কারণ ঘটল। আমাদের আর একজন নেতা—সুভাষ বসু—ভারতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও মহাত্মাজীর সহচর—এই সময়ে গোপনে ভারত ত্যাগ করেন ও ফাসিস্ত্ শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের (I. N. A. —ভারতীয় জাতীয় বাহিনী) সহায়তায় ব্রহ্ম জয় ক'রে ভারতের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত এসে পড়েন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেল তাই—নইলে কী হ'ত বলা কঠিন। যাই হোক—সুভাষচন্দ্র যদিও জয়ী হ'তে পারেননি শেষ পর্য্যন্ত, বরং হয়ত বিমান দুর্ঘটনায় নিহতই হয়েছিলেন জাপানে পালাতে গিয়ে—তবু তাঁব এই কীর্ত্তির বহুদূর-প্রসারী ফল হ'ল। ইংরেজরা ঘরে-বাইরে অহিংস ও সশস্ত্র বিপ্লবের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলেন যে ভারত আর তাঁরা রাখতে পারবেন না।

এই সময়ে ভারতের আর একটি জননেতার কথা বলা প্রয়োজন, তিনি হলেন জিন্না। জিন্না আগে ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসেরই অন্যতম নেতা ছিলেন; কিন্তু মহাত্মাজীর অভ্যুদয়ে ওখানে কর্ত্তৃত্ব করবার আর সম্ভাবনা নেই দেখে সরে এলেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটি দল গঠন ক'রে (মুসলীম লীগ) ইংরেজদের সহায়তায় তাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুললেন। ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেসের বহুবারই একটা বোঝাপড়ার কথা উঠেছিল কিন্তু প্রত্যেকবারই মুসলীম লীগ নূতন নূতন দাবী করায় কোন রকম মীমাংসা সম্ভব হয়নি। শেষ কালে তাঁরা দাবী করলেন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র। এই নিয়ে অশান্তির শেষ রইল না। শেষ পর্য্যন্ত ভারতের জননেতারা বৃহত্তর স্বার্থের মুখ চেয়ে তাতে রাজী হলেন ও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন রূপে গণ্য হ'ল। ভারত অবশ্য তারপর ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী নিজেকে স্বাধীন ও

সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেছে কিন্তু পাকিস্তান আরও দীর্ঘকাল ডোমিনিয়ন বা ইংরেজের ঔপনিবেশিক রাজ্য হিসাবে ছিল।

এইভাবে ভারত ভাগ হওয়ার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাঙলায় বিষম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ঘরদোর ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হ'ল। এই সময় ভারতের জাতীয় সরকারকে বিপুল এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাতে এঁরা যতই যোগ্যতার পরিচয় দিন—যাদের যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে তাদের অসন্তোষ কমবে কেন? সেই অসন্তোষকে অবলম্বন করে এখানের কোন কোন লোকও নিজেদের দল ভারী করবার চেষ্টা করতে লাগল। অল্পবিস্তর এমনি এক চক্রান্তের ফলে মহাত্মা গান্ধী একদিন এক প্রার্থনাসভায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন (১৯৪৮)।

যাই হোক—তবু ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধার জওয়াহরলাল নেহেরু—গান্ধীজীর মানস-সন্তান—যে কর্ম্মদক্ষতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন পৃথিবীতে কোথাও তার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। তাঁর নেতৃত্বে ভারত উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আর একটি কথা বলে পৃথিবীর কথা মোটামুটি শেষ করব। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে যুদ্ধ বাধাটা যে কারুর পক্ষেই খুব বাঞ্ছনীয় নয় সেটা বুঝে প্রধানত ইউরোপীয় জাতিরা উদ্যোগী হয়ে লীগ অব্ নেশন্স্ নামে একটি সভার স্থাপনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যে যদি কোন দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে বিবাদ বাধে ত আপোষে মিটিয়ে দেওয়া, বিবাদ যাতে না বাধে সেই চেষ্টা করা এবং কোন জাতি কোন জাতির উপর অত্যাচার করছে দেখলে তার প্রতিবিধান করা। কিন্তু লীগ অব্ নেশন্স্ -এর এমন কোন শক্তি ছিল না যাতে কেউ কথা না শুনলে জোর করে তাকে কথা শোনাতে পারেন!

তার ফলে সে প্রতিষ্ঠান একদিন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ল। ইটালী ও জার্মানী 'জোর যার মুলক তার' এই নীতিরই জয় ঘোষণা করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বৃটিশ মন্ত্রী চার্চ্চিল ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিলে আর একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন, তার নাম হয় জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (U. N. O.)। এর প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানবের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা স্বীকার ও প্রতিষ্ঠিত করা। এই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আজ প্রায় সব জাতিই যোগ দিয়েছেন। নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি নানা দিকে নানা কল্যাণের চেষ্টাও করছেন। এবারে আর পূর্ব্বের ভুল করা হয়নি, জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের তাঁবে একটি সৈন্যবাহিনীও যাতে থাকে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ ক'রেও নিজের কথা শোনাতে পারবেন তারা। আর কোরিয়ার উত্তরাংশের কম্যুনিস্ট সরকার যখন দক্ষিণাংশ আক্রমণ করলেন (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল কোরিয়া) তখন সেই ব্যবস্থাই তাঁরা করেছেন। বহু জাতির সৈন্যই সেখানে গিয়ে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

কিন্তু তবু তার মহান্ প্রচেষ্টা সফল হবে কি? আজ সারা পৃথিবী যেন দু দলে ভাগ হয়ে গেছে। রাশিয়ার আওতায় সমস্ত কম্যুনিস্ট দেশগুলি একদিকে (তার মধ্যে চীন প্রবল ও প্রধান) এবং আমেরিকার আওতায় বাকী অধিকাংশ দেশ। একমাত্র ভারতই এই চক্রান্তের বাইরে নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করছে। এই দুদল পরস্পরকে ভয় ও বিদ্বেষের চোখে দেখে আর তার ফলেই শান্তি স্থাপনের আশা যেন সুদূর-পরাহত হয়ে পড়ছে।

অভাব থেকে অসন্তোষ—অসন্তোষ থেকে বিপ্লব, এটা খুব

মোটা কথা। রাশিয়া পৃথিবীর শ্রমিকদের চোখে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের অঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছে, তারা সবাই আশা করে যে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে অভাব অভিযোগ কিছু থাকবে না। আমেরিকাও ঐ মোটা কথাটা জানে, তাছাড়া তার অর্থ বেশী, সে চেষ্টা করছে যে-সব দেশে আজও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেইসব দেশকে অর্থসাহায্য দিয়ে তার অভাব দূর করতে।

এর ফল কি হবে কে জানে, কিন্তু আজ সারা পৃথিবী এক আতঙ্কের মধ্যে প্রহর গুনছে আবার কবে এক প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে ওঠে সেই আশঙ্কায়।

— শেষ —

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

খ

গ

ঘ

চ